ইলিয়াস ও প্রশ্নের শক্তি

আনু মুহাম্মদ

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

ইলিয়াস ও প্রশ্নের শক্তি

আনু মুহাম্মদ

প্র কা শ ন

ইলিয়াস ও প্রশ্নের শক্তি

আনু মুহাম্মদ

গ্রন্থস্বত্ব © শিল্পী বড়ুয়া

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রথম গ্রন্থিক সংস্করণ : অমর একুশে বইমেলা ২০২২; ফালগুন ১৪২৮
প্রকাশক : গ্রন্থিক প্রকাশন
১১০ আলিজা টাওয়ার (৪র্থ তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৫৮১ ১০০ ০০১, ০১৬৭৬ ৩১৩ ৯৫৭
প্রচ্ছদ : রাজীব দত্ত
মূল্য : ৪২০.০০ ৳

অনলাইনে পেতে
www.gronthik.com
ISBN : 978-984-95407-2-4
Elias o Prosner Shokti

By : Anu Muhammad
First Published : February 2009
First Gronthik Edition : Book Fair 2022; Chaitra 1428
Publisher
Gronthik Prokashon
110 Aliza Tower (3rd floor), Fokirapool, Dhaka-1000, Bangladesh
+8801581 100 001, 01676 313 957
Price : 420.00 ৳ or 16.00 $

E-mail : pandulipi@gronthik.com; Fb : www.facebook.com/p.gronthik.

No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced
in any from without the written consent of the copyright holder and publisher.
Printed & Bound in the People's Republic of Bangladesh.

উ ৎ স র্গ

হাসান আজিজুল হক
শওকত আলী
প্রিয় লেখক প্রিয় মানুষ

‘আদম করে কৃষিকাজ আর
হাওয়া বোনে তাঁত
তাইলে এবার বলো কেবা
ভদ্রলোকের জাত?’

—চতুর্দশ শতকে ইংল্যান্ডে কৃ
ষক বিদ্রোহের গান

সূচিপত্র

গ্রন্থিক সংস্করণের ভূমিকা ০৯
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১১
উনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই ১৩
খোয়াবনামা: খোয়াবে-চেতনায় মানুষ ও সময় ৩৭
ইলিয়াসের উদ্বেগ, ইলিয়াসের মানুষ ৬১
ইলিয়াসের লেখার জমিন ৭৯
ইলিয়াসের প্রাঙ্গণ ৯১
আক্রান্ত লেখক ও জরুরি কিছু প্রশ্ন ১০১
কারণ আমরা এই বাংলাদেশ চাই না ১১৫
অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি এবং তসলিমা নাসরিন ১২৩
অসাধারণ তরুণ, আজীবন বিপ্লবী ১৩৩
শামসুর রাহমান ১৩৯
সেলিম আল দীনের সৃষ্টিকথা ১৪৩
প্রশ্নের শক্তি: আরজ আলি মাতুব্বর ১৪৯
গ্রন্থিক সংস্করণের সংযোজন
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৮১
মওলানা ভাসানীর ‘খামোশ’ ১৮৭
কমরেড আবদুশ শহীদ ১৯২
আখলাকুর রহমান: পণ্ডিত শিক্ষক ১৯৯
উমরের সফল জীবন ২০৫
দীপংকর চক্রবর্তী এবং অনীক ২১৫
সত্য মৈত্র: জীবনের যোদ্ধা ২১৯
প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: নতুন জগতের অসামান্য কারিগর ২২৫
শওকত আলী ও তাঁর সৃষ্টিকথা ২৪৫

গ্রন্থিক সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, যার অকাল মৃত্যুতে আমাদের তো বটেই দেশ, সাহিত্য ও সর্বজনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর দুটো উপন্যাস প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই নিজের তাগিদেই এর ওপর লিখেছিলাম। মৃত্যুর পর আরও কয়েকটি লেখা লিখেছি একদিকে যন্ত্রণা অন্যদিকে ইলিয়াসকে নিয়ে কথা বলার দায়িত্ববোধ থেকে। এখানে তাই তাঁকে নিয়েই বেশ কয়েকটি লেখা আছে। একই সাথে তাঁর সময়ের, তাঁর অগ্রজ ও অনুজ, এমন আরও কয়েকজন মানুষের কাজ নিয়ে লিখেছি সমাজে যাদের কাজের পর্যালোচনা আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৯ সালে। বর্তমান গ্রন্থিক সংস্করণে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিয়ে আমার লেখা সংযোজন করলাম। আমি মনে করি আমরা যে শ্রেণি-জাতি-ধর্ম বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি তার অচলায়তন নিয়ে যারাই প্রশ্ন তোলেন, যারাই তার গায়ে আঘাত করেন তারাই মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইএ কিছু না কিছু অবদান রাখেন। শিল্প সাহিত্য থেকে রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র নানাক্ষেত্রে এঁদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে কাজ করেছেন, কেউ লিখেছেন, কেউ সংগঠন করেছেন, কেউ প্রকাশনা করেছেন, কেউ গবেষণা করেছেন, কেউ শিল্পসৃষ্টি করেছেন। এসব কাজের কথা আমাদের মনোযোগে রাখতে হবে। যাঁদের কথা লিখেছি তাঁদের সবার সাথে একইরকম যোগাযোগ বা কাজের সম্পর্ক আমার ছিল না। কাউকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, একসাথে কাজ করেছি, কাউকে দূর থেকে দেখেছি। সবার সব মতের সাথে যে আমার মিলছে তাও নয়, সমালোচনাও আছে

আমার লেখায়। তবে সমাজে এই সবার কাজেরই কমবেশি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আছে। কেননা সমাজে প্রশ্নহীন আনুগত্য যতোই ক্ষমতা দেখাক, প্রশ্নের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

অনেকদিন বইটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এই দ্বিতীয় ও বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য গ্রন্থিক প্রকাশন-কে ধন্যবাদ জানাই।

আনু মুহাম্মদ
১ ফাল্গুন ১৪২৮, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ইমেইলঃ anu@juniv.edu; ওয়েবঃ www.anumuhammad.net

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো এই দেশের কাছাকাছি সময়ের কয়েকজন সৃজনশীল মানুষকে কেন্দ্র করে, যারা বিদ্যমান আধিপতবাদী ব্যবস্থা, চিন্তা, দর্শন, সমাজ সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী তাতে নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছেন। এর মধ্যে তসলিমা নাসরিন গত আঠারো বছর ধরে নির্বাসিত, তাঁর চিন্তা ও লেখার কারণেই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুটো উপন্যাস এবং তাঁর চিন্তা, কাজ ও লড়াই নিয়ে লেখাগুলোই এই গ্রন্থের প্রধান অংশ। এখানে নেই কিন্তু গ্রন্থের বিষয় ও সময় বিবেচনা যাদের নিয়ে লেখা অবশ্যই থাকতে পারতো, কিংবা থাকা উচিত ছিল—এঁরা হলেন আহমদ ছফা ও আহমদ শরীফ। তাঁদের দুজনকেও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি কোনোকিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। তার মধ্যে নানা পরিবর্তন চলতেই থাকে। কিন্তু এই চলায় নানা মাত্রা থাকে, চলা ঠেকানোর বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রবণতা যেমন থাকে আবার চলার মধ্যেও নানামুখ থাকে। এই ভিন্নভিন্ন মাত্রা ও প্রবণতা তৈরি হয় সমাজের ভেতরকার নানা স্বার্থ ও স্রোতের কারণে। শ্রেণি-লিঙ্গ-জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠীর মধ্যেকার নিপীড়ন ও বৈষম্যভিত্তিক যে সমাজ তাতে ক্ষমতাবানদের দ্বারাই পরিবর্তনের কিংবা পরিবর্তন ঠেকানোর গতিমুখ নির্ধারিত হয় কিংবা সে চেষ্টাই জোরদার থাকে। কাজেই সংঘাতও থাকে চলমান।

ক্ষমতাবানদের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে যারা ক্ষমতার ভাগিদার হন, রাজনীতি অর্থনীতির জগতে তো বটেই শিল্পসাহিত্য আর চিন্তার জগতেও তাদের দাপট আমরা জানি, প্রতিনিয়ত তা টের পাই। একই কারণে বৃহৎ জনগোষ্ঠী পিষ্ট

হবার জগতেই আটকে থাকেন আর ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অমানবিকতার অশ্লীলতার উৎসব করতে থাকে। এই অবস্থা চিরস্থায়িত্ব পায় না কারণ এই প্রবাহ সকলকে হজম করতে পারে না। কেউ কেউ এই পরিবর্তনকে বহুজনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার কাজে, যুক্ত করবার উপযোগী করে এগিয়ে নেবার ব্রত নিয়ে সক্রিয় হন। স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিলে, স্রোতের গতি পরিবর্তন করতে চাইলে দায়িত্ব নিয়ে যুক্ত থাকতে হয়, নিয়ম ভাঙতে হয়, নিয়ম বিধি, দর্শন ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হয়। এর সবই যে সঠিক হয় বা কার্যকর হয় বা জনমনে ছাপ ফেলতে পারে তা নয়, কিন্তু তারপরও তা এক একটি বিদ্রোহকে চিহ্নিত করে যেগুলো কালে বৃহৎ চিন্তা ও কর্মকে শক্তি যোগায়।

আমাদের সমাজ শুধু নয়, সব সমাজের অধিপতিশ্রেণি সবচাইতে সন্ত্রস্ত থাকে ভিন্নমতে, প্রশ্ন উত্থাপনে। তাদের প্রয়োজন চিন্তাহীন, প্রশ্নহীন, সৃষ্টিহীন, পরিবর্তনে অসার, বিশ্লেষণের ক্ষমতাহীন অনুগত জনগোষ্ঠী। আর মানুষের সমাজ দেখতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন অন্ধভক্তি, প্রশ্নহীন আনুগত্য আর ঘৃণ্য আত্মসমর্পণের সংস্কৃতিকে পরাজিত করা; পরিবর্তনে সৃজনশীলতা আর মানুষকে জয়ী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। এটিই এই গ্রন্থের মূল বিষয়।

আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ই-মেইলঃ anu@juniv.edu
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই

> ‘সমুদ্রে যখন ঝড় উঠে/ মহাদেশ যখন তলিয়ে যায়/ প্রলয় যখন সর্বনাশের বান ডাকে/ তখনও ঊনসত্তর বেঁচে থাকে।’

কথা কটি লিখেছিলেন ’৭১-এর ঘাতকদের হাতে নিহত শহিদ শহীদুল্লাহ কায়সার।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মানুষের জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। ভাষা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, হাজং বিদ্রোহ কিংবা এর আগে অজস্র কৃষক বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের আছে। কিন্তু দেশজুড়ে জনগণের বিপুল উদ্দীপ্ত উত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। এই অভ্যুত্থানের মাত্রা ছিল একাধিক। অভ্যুত্থান চলাকালে এর গতি নির্ণয় ছিল অসাধ্য। জনগণের মিছিল, বিদ্রোহ, সশস্ত্র সংঘাত, পুলিশ-সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ, দিকে দিকে আইন অনুশাসন ও প্রভুত্বকে অস্বীকার করবার সদর্প অভিযান সবকিছুই সবার হিসাবকে বার বার অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে। জনগণের বিভিন্ন অংশ তাদের স্ব-স্ব পরাজিত অবস্থানকে পাল্টে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে, অস্পষ্ট পথে হলেও জোরে জোরে পা ফেলেছেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তখন বিভিন্ন প্রবাহ, একক নেতৃত্ব নেই কারও হাতে। সকলে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যে কাজ করলেও কোনো না কোনোভাবে এই উন্মাতাল সময়ে ভূমিকা রাখছেই।

এ এক বিশাল ক্যানভাস। চরিত্র একটি দুটি কিংবা পাঁচ দশ নয়, সহস্র, লক্ষ। শহর শুধু নয়, শহর-গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর সর্বত্র এই ঢেউ। অস্থির চারদিক, কিন্তু এই অস্থিরতা আত্মবিনাশী নয়, লক্ষ্যহীন নয়; এই অস্থিরতা নতুন স্বপ্নের, দুর্বল শরীরে নতুন জীবনের সম্ভাবনার। স্বপ্ন দেখার এই সুযোগ, স্বপ্ন দেখার এই ক্ষমতা এত বিপুলভাবে এর আগে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ একযোগে অনুভব করেনি। সে জন্যই মৃত্যু সেখানে অবহেলার হয়নি, ত্বরিত ভুলে যাবার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়নি। একজনের মৃত্যু সেখানে অজস্রকে নতুন জীবন দিয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বর্তমানের স্থবির আত্মঘাতী অস্থির হতাশ সময়ের জন্য এক উজ্জ্বল অতীত, ফিরে তাকালে যেন অবসাদ ঝেড়ে নতুনভাবে দাঁড়াতে ইচ্ছা হয়। অনেক কেন এসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে থাকে। জরাগ্রস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়, মস্তিষ্ক বিস্ময়করভাবে সচল হয়ে ওঠে, ছানিপড়া চোখ স্বচ্ছ সুদূরগামী দৃষ্টি নিয়ে সামনে তাকায়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তাই একটা ঘটনা নয়, অনেকদিনে ধীরে ধীরে জমে উঠা আমাদের ঘাম, শ্রম, রক্তের আকস্মিক প্রবাহ। তার সীমা পরিমাপ করা যায় না। তার গতি সময়ের বেড়াজালে আটকানো যায় না। জীবন এবং সময়ের এ বিশাল অধ্যায়কে শব্দ দিয়ে কি ধরে রাখা সম্ভব? ধরে রাখা কি সম্ভব এই বিশাল ক্যানভাসের মধ্যে ক্রমে বেড়ে উঠা কুৎসিত ফাটল, দুর্বল জমিন?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) আমাদের দেশের তেমন একজন শিল্পী, যিনি কলম শুধু নয়—প্রখর ক্ষমতা, গভীর মমতা এবং দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টির আঁচড় দিয়ে এ সময়কে আবারও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন্ত দেখি সেই সময়কে, যে সময় আমাদের মরা গাঙে জোয়ার সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। *চিলেকোঠার সেপাই* নামের উপন্যাস ইলিয়াস তৈরি করেন জীবনকে এবং উপন্যাসকে তার যথার্থ স্থান দেখিয়ে দেবার জন্য।

দুই

উপন্যাসের শুরু ওসমান দিয়ে, শেষও ওসমান দিয়েই। কিন্তু দুই ওসমানের মধ্যে তফাৎ এত বেশি যে, শেষ বাক্যে ইলিয়াস ঘোষণা করেন, 'এখন খাকি বলো কালো বলো, সবুজ বলো সাদা বলো—কারো সাধ্যি নাই যে তাকে সেই ওসমান গনি বলে শনাক্ত করে'। ওসমানের এই পরিবর্তন ঔপন্যাসিকের সদিচ্ছা দ্বারা আরোপিত নয়, এই পরিবর্তন গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপক আলোড়নের চাপ থেকে খুব স্বাভাবিক গতিতেই সৃষ্টি হয়েছে। ওসমান পাগল হয়ে গেছে একথাটি মনে হওয়া স্বাভাবিক, যদি আমরা আগের ওসমানকে স্বাভাবিকতার মাপকাঠি হিসেবে ধরি। নিজের কাপুরুষ, আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রেমিক, পলায়নবাদী মধ্যবিত্তের খাঁচাকে ভেঙে চুরমার করে ওসমান বেরিয়ে এসেছে, খিজিরের অশরীরী কিন্তু অবিরাম এবং অপ্রতিরোধ্য ডাকে।

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা জানতে পারি—পুলিশের গুলিতে একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের উপার্জনক্ষম তরুণ বেতনভুক্ত কর্মচারী আবু তালেবের মৃত্যু খবর। এই মৃত্যুর ঘটনা আমাদের উদ্বেলিত করবার জন্য নয়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন শ্রেণি ও অংশের মানুষের মধ্যে এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া থেকে বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থান বুঝে নিতে এটি আমাদের সাহায্য করে।

ওসমান নির্বিকার, কিঞ্চিৎ দুঃখিত হয়েও নিজের মধ্যেই যে ডুবে থাকে, পাড়ার সর্দার রহমতউল্লা, নতুন রিকশা মালিক আওয়ামী লীগের আলাউদ্দিন আর হাড্ডি খিজির এ সময়েই আমাদের কাছে পরিচিত হয়। লাশ নিয়ে মিছিল হবে নাকি দ্রুত তাকে কবর দেয়া হবে এই বিতর্ক এবং চেষ্টা, পাল্টা চেষ্টার মধ্যে এদের স্ব-স্ব অবস্থান আমরা দেখে নেই। পুলিশের গুলিতে নিহত হবার পর দিনটিতে হরতাল। সে সময় একের পর এক হরতাল। পিকেটিং-এর জন্য সংগঠনের দরকার হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত পিকেটিং হচ্ছে। হরতালের প্রস্তুতি, হরতালের সাফল্যে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়াও আমরা জেনে নেই।

অফিসের মাঝারি নিম্নমাঝারি কর্মচারীরা হরতালে খুশি। আইয়ুব খানের পতন তাদেরও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষারও চরিত্র আছে। ইলিয়াস সেদিকেও দৃষ্টি দেন। অফিসের কর্মচারীদের আলোচনায় খুব স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, 'খালি পিওনদের বলছেন কেন? রিকশাওয়ালা, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, কুলি এদের তেজটা দেখছেন? আরে আইয়ুব খান গেলে তোদের লাভটা কী? তোরা মিনিস্টার হবি? নাকি অফিসে এসে চেয়ারে বসবি?' অফিসের কেরানিকুল হরতালে বড় বসের ভোগান্তিতে মহাখুশি কিন্তু অধঃস্তন কর্মচারীদের অতিমাত্রায় উল্লাস এবং সক্রিয়তায় বিরক্ত। অফিসে বড় বস থেকে ছোট বসের মধ্যে যে চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা সেটাও এসে যায় নানা সংলাপ ও চরিত্রে।

অন্যদিকে রাস্তায় বস্তির বালকদের উত্তেজিত নাবালক নড়াচড়ার ধরন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় এর মধ্যেই। এদের ব্যাপারে ওসমানের বন্ধু ছাত্র কামাল বলে, 'স্পেশালি স্লাম এরিয়া। ব্যাটাদের কাজ কাম—নেই তো, রোজ প্রসেশন বার করে। পুলিশের গাড়ি দেখলেই ঢিল ছোড়ে। ঢিল দিয়ে অটোমেটিক উইপন্স ঠেকাবে? স্টুপিড!'

অন্যদিকে এ সময়েই স্লাম এরিয়ার 'বেওয়ারিশ পিচ্চিরা' হরতাল সফল করবার জন্য মহাউৎসাহে ছুটাছুটি করতে থাকে। তাদের ছুটাছুটির বিস্তারিত ইলিয়াস তুলে আনেন—

> 'আশেপাশে কেউ দোকান খুললে এদের একেকটি ছোট ছোট দল দৌড়ে এসে খবর দিচ্ছে, "লম্বু সালামের জিলাপির দুকান আছে না, অর বগলে সাইকেল পার্টসের দুকান আছে না, আছে না, ঐ বল্টু হালায় দুকান খুলছে...।" আরেকজন বলে "দুকান খুলছে" "আমরা দুকান বন্ধ করবার কইছি তো, বন্ধ করবার কইছি তো, বন্ধ করবার।" উত্তেজনায় বাড়ি-বাড়ি কাজ করা মাতারির পোলা বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না, আরেক পিচ্চি তাকে উদ্ধার করে, "ঐ বল্টু হালায় কয়, কিয়ের ইস্টাইক? ইস্টাইকের মায়েরে...।" শুনে বয়সে ও বাপেদের পরিচয়ে বড়ো ছেলেরা ব্যাট হাতে ছুটে যাচ্ছে দোকান বন্ধ করতে।'

এই পিচ্চিরাই, যে হোটেলে ছাত্র-কর্মীরা প্রবল রাজনৈতিক বিতর্কে ব্যস্ত সেখানে এসে আইয়ুব খানের ছবি লক্ষ্য করে ঢিল মারে, ছবি নামিয়ে ফেলার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। 'কনুই দিয়ে তার নাকের গোড়া থেকে ঝুলন্ত সিকনি মুছতে মুছতে সে এগিয়ে আসে। আইয়ুব খানকে প্রথমবার ইট লাগাতে পারেনি বলে তার যে গ্লানি হয়েছিল পরবর্তী সাফল্যে তা একেবারে মুছে গেছে। এই সাফল্য তার চেহারা ও গলায় পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষের ভার অর্পণ করে, 'দিছি—খানকির বাচ্চারে এক্কেরে নামাইয়া দিছি!'... রাস্তার ধুলামাটি ও কফ থুতু মাখা পায়ে চিৎপটাং রাষ্ট্রপতির কপালে ও মাথায় সে কয়েকটা লাথি মারে। ভাঙা কাচে তার পা কেটে যায়, ভাঙা কাচের নিচে ধুলামাটি, রক্ত, কফ, থুতু লেগে রাষ্ট্রপতির চেহারা ঘোলাটে হয়...'।

আইয়ুব খানকে নাস্তানাবুদ করে বস্তির বালকদের সুখ কেন? কেন তাদের ফুর্তি মিছিলে আগে আগে থেকে? পুলিশের লাঠি, গুলি অস্বীকার করেও কেন তারা হরতাল সফল করায় সবার আগে থাকে? আইয়ুব খানের পতন হলে তাদের কী লাভ? এর উত্তর পেতে গেলে সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণি বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। উপন্যাস বিশ্লেষণের স্থান নয়। তবুও আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়। আমরা দেখি, উপন্যাসেও তা সম্ভব—উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যেই উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ গতির মধ্য দিয়েই এর উত্তর পাঠককে জানিয়ে দেয়া সম্ভব। সম্ভব তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানানো।

বস্তির রিকশাচালক হাড্ডি খিজিরের মুখ থেকে আমরা তাদের ভেতরের আসল স্বপ্নের কথা জানতে পারি। আইয়ুব খানের পতনই তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা নয়, খিজির ভাবে, আইয়ুবের পতন হলে রিকশার মহাজন রহমতউল্লাদেরও পতন হবে, যে রহমতউল্লাহ তার জন্মকে আজ পাপে পরিণত করেছে, তার জীবনকে অহরহ স্বপ্নহীন করে তুলেছে। উত্তেজিত হয়ে তাই সে তার স্ত্রীকে যা বলে, তা তত্ত্ব কথা নয় বা আরোপিত নয়,

> 'মানুষ কতেছে তর মহাজনের বাপের বাপ, দাদার দাদা-আইয়ুব খানের দিন বলে খতম হইয়া আইতাছে, তার হোগার মইদ্যে

আড়াই ইঞ্চি মোটা পাইপ ঢোকে, তার ফাল পাড়া দ্যাখে ক্যাঠায়?
আর তর মহাজনের পাছা খাউজায়, না?'

নিজের সন্তানের উপর অধিকার নেই খিজিরের। মহাজনের উৎখাত না হলে সন্তান পাবে না সে। সে মহাজনের পতন আর আইয়ুবের পতন তাই এক করে দেখে, 'আইয়ুব খান মোনেম খানে খতম হইলে আমাগো মহাজন হালার রোয়াবি থাকবো?'

কিন্তু চিত্র এখন স্থির নয়। আন্দোলনের অংশীদার বিভিন্ন মানুষ আলাদা হয়েই থাকে। মিছিল শেষে ছাত্র-কর্মীরা ক্লান্তি নিয়ে রেস্তোরায় বসে, চা-নাস্তা খায়। কিন্তু সবার আগে থাকা পিচ্চিরা গ্লাসের পানিতে মুখ দিতেই ম্যানেজার খেকিয়ে ওঠে, 'এই শালা ফকুনির পুত, গ্লাস ধরছস কারে কইয়া?' পিচ্চির দল আবার মিছিলে যায়। ওসমানের বন্ধুরাও যায়। কিন্তু এক বন্ধু বলে, সামনে চলো। সামনে মালঝাল।' 'আরে নাহ!' শওকত হতাশ ভঙ্গিতে বলে, 'মেয়ে পাবেন কোথায়? ছাত্রই তো কম। সব লেবার আর স্ট্রিট আর্চিনস!'

তিন

রাজনৈতিক ধারাগুলো পরস্পর বিরোধিতা নিয়ে গণঅভ্যুত্থানে যার যার মতো সক্রিয়। উপন্যাসে তার তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ নেই। কিন্তু ঘটনা প্রবাহে স্বাভাবিক বিতর্ক সংলাপের মধ্য দিয়ে সে বিষয়টিও যখন উপস্থিত হয় তখন পাঠক সময়ের দ্বান্দ্বিক বিকাশকেই যেন সামনে দেখেন। আলতাফ জবাব দেয়,

> 'আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। ছয় দফায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন করার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে একটি অঞ্চল আরেকটি অঞ্চলকে শোষণ করতে না পারে। আমাদের যা আয় তা খরচ করবো আমরাই। ওয়েস্ট পাকিস্তানি আর্মির পেছনে বাঙালির রক্ত পানি করা টাকার অপচয় ঘটবে না। আমরা আলাদা আর্মির কথাও বলেছি।' আনোয়ার বলে, 'হ্যাঁ, বাঙালি আর্মির পেছনে পিপলের টাকা খরচ হবে, তাতে মানুষের লাভ কী? 'বাঙালি আর্মি, আমাদের লোক', আমাদের মানুষের সেনাবাহিনী। আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের নির্যাতন করবে কেন।'... 'বাঙালি আর্মি তখন চেপে বসবে বাঙালির ওপরেই, বাঙালি ছাড়া আর কার ওপর দাপট দ্যাখাবার ক্ষমতা হবে তার? বাঙালি কর্নেল সায়েব বাংলা ভাষায় শুয়রের বাচ্চা বললে কি তার পা জড়িয়ে ধরে বলবো আ-মরি বাংলা ভাষা!... তোমাদের অটোনমিতে বাঙালি সিএসপি প্রমোশন পাবে, বাঙালি ক্যাপ্টেন সায়েব মেজর জেনারেল হবে, বাঙালি আদমজী ইস্পাহানী হবে। তাতে বাঙালি চাষার লাভ কী?'

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী এবং জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের দুটো ধারা তখন পাশাপাশি সক্রিয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এ দুটো ধারা তখন একসঙ্গে কাজ করছে ১১ দফা নিয়ে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে অটোনমির দাবি তুলছে। বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ যেমন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার দাবি তুলছে (উপন্যাসে অবশ্য এ কথা জানা যায় না), দাবি তুলছে শোষণ ও শৃঙ্খলমুক্ত সমাজের। তাদের এই ভূমিকার সঙ্গে খিজিরদের আকাঙ্ক্ষার মিল আছে। কিন্তু খিজিরদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ঘুচে যায়নি। এসব সংগঠনের দুর্বলতার জন্যই খিজির ঠিকই বাঁধা পড়ে থাকে আওয়ামী লীগের আলাউদ্দিনের শৃঙ্খলে।

আলাউদ্দিন আওয়ামী লীগের সমাবেশ সফল করবার জন্য রিকশাচালকদের ব্যবহার করে। খিজির মহাউৎসাহে মিছিল সভা সংগঠিত করে। পাড়ার বড় মহাজন মুসলিম লীগের রহমতকে টার্গেট করে সে বারবার মিছিলে স্লোগান তুলতে চেষ্টা করে। মাঝে মধ্যে তোলেও, 'আইয়ুবের দালাল মহাজন ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক', 'মহাজনের জুলুম, মহাজনের জুলুম চলবে না, চলবে না'। তখন আলাউদ্দিন শৃঙ্খলিত খিজিরকে থামিয়ে দেয়, বলে 'খ্যাচরামো করনের জায়গা পাইলি না, না? এইগুলি কী কস হারামজাদা, এইগুলি কী! খামোস মাইরা থাক।' আওয়ামী লীগের

আলাউদ্দিন মুসলিম লীগের রহমতউল্লাহর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে অনেক বেশি। তাকে হিসেবের বাইরে চটাতে চায় না। সে অন্যদের নিরস্ত করে বলে, 'মহল্লার মইদ্যে কার কি রহম ইজ্জত আমরা জানি না?'

শ্লোগানের বৈপরীত্য আমরা সে সময় বিভিন্ন মিছিলে দেখি। উপন্যাসেও তার প্রকাশ আছে। একই জমায়েতে একদিকে স্লোগান হচ্ছে—

> 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা',
> 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' কিংবা '৬ দফা, ৬ দফা মানতে হবে মানতে হবে।'

অন্যদিকে স্লোগান হচ্ছে— 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না'।

> 'মিল মালিকের গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে।'

খিজির বারবার তার জীবনের শত্রু মহাজনকে টার্গেট করতে চেষ্টা করে, কিন্তু আলাউদ্দিনের শৃঙ্খল থেকে সে মুক্তি পায় না। কেননা সে একা, অনেককে নিয়ে সংগঠিত হবার সুযোগ তার কম। তার জীবিকার ধরনই তাকে একা বানিয়ে রাখে। তার শ্রেণির লোকজনদের সঙ্গেই তার চিন্তার ঐক্য হয় না।

চার

ইলিয়াস গ্রামে প্রবেশ করেন একটি চিঠির সূত্র ধরে। চিঠিতে গ্রামের কয়েকটি খবর দেয়া—

> 'এতদঞ্চলে গরু চোরের উপদ্রব ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কোনো প্রতিকার হইতেছে না। পক্ষকাল পূর্বে হাওড়াখালির নাদু পরামাণিক গরু অপহরণের অভিযোগ লইয়া থানায় যায়, কিন্তু দারোগা এজাহার লয় নাই। ...নাদু পরামাণিক বংশ পরম্পরায় তোমাদের বাড়িতে বছর কামলা হিসাবে কাজ করিতেছে। দরিদ্র ও নীচু বংশীয় হইলেও লোকটি অত্যন্ত অনুগত ও সৎ। কিন্তু উহার

> পুত্রটি বড় বেয়াদব, উহার উদ্ধত স্বভাব উহার পরিবারটির জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।... আমাদের এলাকার মানুষের ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, সম্ভ্রমবোধ এক রূপ নাই বলিলেই চলে। ভদ্রলোকের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।...'

চিঠিটি আনোয়ারকে লেখা। এই আনোয়ার কলেজ শিক্ষক, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, বাম রাজনৈতিক কর্মী, যে আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধিতা করে গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে। কিন্তু উপন্যাসে তার কোনো সাংগঠনিক অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। সে গ্রামে যায় কিন্তু কীভাবে কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী যায় তা জানা যায় না। মনে হয় সে একা বিচ্ছিন্নভাবে এ কাজে ব্রতী হয়েছে। আনোয়ার চরিত্র এ কারণেই ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারে না। তার অবস্থানও পরিষ্কার হয় না।

তবে আনোয়ার চরিত্রের দুর্বলতাগুলো বাস্তব। সে গ্রামে যায় গ্রামে জনগণের মিলিট্যান্ট স্রোতকে সংগঠিত করতে কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে গ্রামে দীর্ঘদিনের দাবিয়ে রাখা মানুষদের সংগঠিত করে এগিয়ে নিতে কিন্তু বারবার গ্রামের মানুষের শত্রু, তার আত্মীয়-পরিজন তাকে পিছুটান দেয়। কোথায় এক বাধা, সে নিজের কাছেই পরাজিত হয়। সে সংস্কারমুক্ত হয়েও যেমন ভূতের ভয়ে একটু কেঁপে উঠে, তেমনি বিপ্লবী হয়েও শ্রেণিগত পিছুটানে পরাজিত হয়। তার এই পরাজয়ের পেছনে তৎকালীন বিপ্লবী সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কি কোনো রকম ভূমিকা আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তো নয়ই, উপন্যাসে কোনে ভাবে এ প্রশ্নটিও উঠে না, কিন্তু উঠা দরকার ছিল এটা বারবার মনে হয়।

গ্রামে খুব অল্পদিনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়। সে সময়টা ঘিরে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে সে সময়টাই ঘটনাবহুল, গ্রামও তার থেকে আলাদা নয়। চেংটু নামের চরিত্রটি ভূমিহীন দিনমজুর, উদ্ধত বেয়াদব বলে যে গ্রামের প্রভাবশালীদের কাছে রীতিমতো ঘৃণা ও ভয়ের পাত্র,

সে এই আখ্যানভাগের সবচাইতে উজ্জ্বল চরিত্র। খয়বার গাজী এলাকার জোতদার, আনোয়ারের আত্মীয়। দৈনন্দিন নিয়মে শোষণ-নিপীড়নের বিভিন্ন উপায়গুলোর সঙ্গে সে সময় যোগ হয়েছে গরু চুরি। গরিব কৃষক বর্গাচাষীদের গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। চুরি হয়ে জমা হচ্ছে দূরের চরে গাজীর এক ট্যান্ডেলের তত্ত্বাবধানে। কেউ হঠাৎ খোঁজ পেয়ে গেলে জরিমানা দিয়ে গরু আনতে হচ্ছে, আবার এ তথ্য কাউকে বলে দিলে তার জীবন শেষ। গরু চুরির এ ঘটনা ক্রমে ভয়াবহ রূপ নেয়। এলাকার গরু যমুনার ঐ পারে বিক্রি হয়ে যায়। একে উপলক্ষ করেই সে সময় গ্রামের মানুষ ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চেংটু তাদেরই প্রতিনিধি, সরব সক্রিয়।

নাদু তার পিঠে বড় সাহেবের খড়মের চিরস্থায়ী দাগকে অনুভব করে গর্ববোধ করে কিংবা সেটাকে আশ্রয় করে বর্তমান গাজীর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। কিন্তু চেংটু অনেক এগিয়ে গেছে, সে বলে—

> 'পিঠ তো ভাঙছে একজন, এখন বাকি আছে বুকখান। তুমি গাজীগেরে ঘরত যাও, খয়বার মিয়ার পাও আছে দুইখান, বুকখানা প্যাতা দিও। খাম কর্‌যা দিবো ...নাথিগুড়ি যা খাবার চাও তাড়াতাড়ি খায়া আসো। কুনদিন যায়। শুনবা গাজীর ব্যাটার দুইটো ঠ্যাংই ভ্যাঙা দিছে, তখন নাথি দিবো কি দিয়া?'

আনোয়ার চেংটুকে রাজনীতি বোঝাবার চেষ্টা করে, চেংটু বেশিদূর বুঝতে পারে না। আনোয়ারের ভাষা সে পুরোপুরি বোঝে না। সে তার কাজ বুঝে নিয়েছে গ্রামেরই এক বিপ্লবী কর্মী আলীবক্সের কাছে থেকে, গণআদালত বসিয়ে গ্রামের অত্যাচারী জোতদার ও তার দালালদের বিচার করবার মতো শক্তি অর্জন করা। চেংটু আনোয়ারের কাছে দিল খুলে কথা বলে না। কেননা যাদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ তাদের অনেকেই আনোয়ারের আত্মীয়। আনোয়ার সেখানেই থাকে। সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই, এ সত্যটা চেংটুও অনুভব করে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। সে বলে, 'হামাগোরে আবার বিপদ কী? হামাগোরে জমি নাই, জিরাত নাই, ভিটা নাই, ধান নাই, মরিচ নাই—বিপদ হলে বিসম্বাদ হলে হামাগোরে লোকসান কী?' সে জন্য 'জীন উত্তর দিকে উড়াল দিয়ে' বিপদের জানান দিলেও চেংটু বিচলিত হয়নি। বিবাদ বিসম্বাদই সে কামনা করে।

গ্রামের মানুষ বিস্তারিতভাবে ধরা দেয় ইলিয়াসের কলমে। ভিন্ন ভিন্ন জীবন ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা, জমির জালিয়াতি, সুদের অত্যাচার, বর্গাচাষীর অসহায় আর্তনাদ, পরজীবী টাউট আর জোতদারদের জীবন যাপন, গরিবদের মধ্যে সংস্কারের নানা ধরন, ধর্মের যোগান সবই আসে।

পচার বাপ নিজের গরুর খোঁজ পায় সেই খোঁয়াড়ে। খয়বার গাজীর প্রতিনিধি হোসেন আলীর তত্ত্বাবধানে সেই খোঁয়াড়। খোঁজ পেয়ে পচার বাপ হোসেন আলী বা খয়বার গাজীর উপর রুষ্ট হয় না, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য প্রস্তুত হয়। আনোয়ারকে অনুরোধ করে পচার বাপ, 'আপনে গেলে গরিবের বড় উপকার হয় বাবা! হোসেন আলী ফকিরকে কয়া বল্যা হামার গুনাগারিটা মাপ করায়া দাও বাপ। আল্লা আপনার ভালো করবে বাবা... জরিমানা কও, দণ্ড কও, টাকসো কও, খাজনা কও-ইগল্যান কী? ভাইজান?'

ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। পচার বাপ জরিমানা দেয়, গরুও পায়। কিন্তু ফিরে আসতে পারে না ঘরে। তার লাশ পাওয়া যায় খালের উপরে। ভেঙে পড়ে অনেকে। চেংটুর মধ্যে দিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষ। আলীবক্সের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ সংগঠিত হয়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় হোসেন আলীর আস্তানা। তারপর একদিন ঠিকই গণআদালত বসে বৈরাগীর ভিটায় বটগাছের নিচে।

সংস্কারের ঢিপি বটগাছের চারপাশ ঘিরে রাখা জঙ্গল পরিষ্কার করতেই হলো—

> 'কেননা মানুষও এসেছে বাপু। ভিড় দেখে মনে হয় এদিককার গোর্টিয়া, তালপোতা, পদুমশহর, চথুলিয়া, উত্তরের চন্দনদহ, কর্ণিবাড়ি, পশ্চিমের কড়িতলা, কামালপুর, গলোলাবাড়ি কোনো গ্রামে পুরুষ মানুষ আজ ঘরে নাই। দূরের চর এলাকার লোকও এসেছে।'

গণআদালতে সহস্র মানুষ সেদিন মুক্ত। এতদিন মাথা নিচু করে ছিল যারা, তারা তুমুল গালিবর্ষণ করছে। আক্রমণে উদ্যত তারা। এতদিন গাজীর যত অপকর্ম, খুন, চুরি, জালিয়াতি সব যেন সবার মনে পড়ে যায়।

একে একে অভিযোগ পাঠ করা হয়, তার সব জমি বাজেয়াপ্ত করে সকল গরিব ও বর্গাদারদের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমরা ইতিহাস ঘাঁটলে দেখি, সে সময় বাংলাদেশের বহু গ্রামে এরকমভাবে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাম আন্দোলনের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং জনগণের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ সেদিন বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু এটা ধরে রাখা যায়নি। বাম আন্দোলনের সেই শক্তি ছিল না। অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ভেতর থেকে কাবু হয়ে গেছে। আর এই সুযোগে বাঙালি জাতির ঐক্যের নামে খয়বার গাজীরা ঠিকই নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়।

খয়বার গাজী বেঁচে গেল। জুম্মার নামাজের প্রার্থনা করে সময় মঞ্জুর করার নামে কালক্ষেপণ করতে করতে, 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা, জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো' স্লোগানধারীরা এসে গণসমাবেশের মূল স্পিরিটটাকে ভণ্ডুল করে দেয়। চেংটু-আলীবক্স চেষ্টা করেও তা ধরে রাখতে পারে না। আনোয়ারের পাহারায় খয়বার গাজীকে সময় দেয়া হয়, সে পালিয়ে যায়। দ্বিধাগ্রস্ত আনোয়ারকে বারবার রক্তের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয় জালাল মাস্টার। বলে, 'বাবা, যারা নিজেদের মানুষ তারা নিজেদেরই থাকে। বাপ-দাদার রক্ত তুমি শরীর থ্যাকা বার কর্যা দিবার পারো?' গাজীর আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগের ছাত্র-কর্মীরা দলে বলে এসে চড়াও হয়। বলে, 'বাঙালির জাতীয় নেতা আজ কারাগারের অন্তরালে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার জন্য ঢাকার হাজার হাজার মানুষ আজ বুক পেতে দিচ্ছে বুলেটের সামনে। সামান্য গ্রাম্য কোন্দল নিয়ে আপনারা বাঙালির ঐক্য নষ্ট করবেন না'। এক তরুণ নবেজউদ্দিনের হাত ধরে, 'আসেন ভাই'। হাত ছাড়িয়ে নিলে ছেলেটি ধরে বান্দু শেখের হাত এবং তার হাতে গুঁজে দেয় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি আঁকা পোস্টার। বান্দু শেখ ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে চেংটু চটে যায় 'আপনেরা কি আরম্ভ করছেন? হামাগোরে মানুষ নিয়া টানেন কিসক?' 'তোমাদের মানুষ আমাদের মানুষ কি ভাই? আমরা সবাই বাঙালি।' চেংটু তার ডানহাতে কুড়াল নেয়, 'সোহাগের কথা থোন। হামরা বলে জানে মরি, শালা

মাক্কুচোষা শয়তানগুলা আমাগোরে ছেঁচা পিষ্যা শ্যাষ করল।' সংঘাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকে পালায় খয়বার গাজী। সে গিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের আওয়ামী লীগের সভায়। বাঙালি জাতির ঐক্য হয়, খয়বার গাজী বেঁচে যায়। গ্রামে আবার শুরু হয় দমন-পীড়ন। খবর হয়, 'গাব গাছের পাশে ধানকাটা জমিতে নামবার ঢালে আজ ভোরবেলা চেংটুর লাশ পাওয়া গেছে।'

বৈরাগীর ভিটা যা চেংটুরাই পরিষ্কার করেছিল, সেখানে জনগণের সমবেত হবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, এরপর তা 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'র সমাবেশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এ অবস্থায় আনোয়ার কিছুই করতে পারে না। গাজীর প্রতি তার ঘৃণা আছে তবুও তার চলৎশক্তি থাকে না। আইয়ুবের পাড় দালাল খয়বার গাজী আশ্রয় নেয় আওয়ামী লীগের জেল খেটে বের হওয়া আনোয়ারের মেজ মামার কাছে। আনোয়ারকে তার ভাই বলে, 'আপনে ওদের সঙ্গে থাইকা ভালোই করছেন। ফুপা কয়, আপনের হেলপ না পাইলে খয়বার চাচা নাকি বাঁচতোই না।' বড় চাচা বলে, 'উটকা মানুষের সাথে একজোট হয়া আত্মীয়-স্বজনের বেইজ্জতি করা এসব কি ভালো কাজ?' আনোয়ারের এরপর যেন করার কিছুই থাকে না। পথ পায় না সে। ওসমানের অসুস্থতার উপলক্ষ পেয়ে সে শহরে পালায়। আনোয়ারের এই অথর্ব ভূমিকা সত্ত্বেও চেংটুর স্বজনরা তাকে ঘৃণা করে না। রওনা হবার আগে চেংটুর বাবা তাকে একটা পুটলি এনে দেয় অপরাধীর ভঙ্গিতে। বলে—

> 'চেংটু এই পিঠা খুব পছন্দ করতো। হারামজাদা মাথা গরম আছিলো তো। দ্যাখো নাই? কোটে কোটে ঘুরছে। একদিন বাড়িতে যায়া কয় "ও মা আলোচাল কোটো তো! ভাপা পিঠা করো, আনোয়ার ভায়েক পিঠা খাওয়ামু!" চেংটুর মা বুঝলা না!—মেয়্যামানুষ। মনমেজাজ ভালো থাকে না। অভাবের সংসার বাপু, ঘরত ভাতের চাউলেরও অনটন, পিঠা আর বানাবার পারে না। হারামজাদা অর মায়ের কাছে খালি তোমার গপ্পো করছে বাবা। তুমি আজ ঢাকাত যাবা শুন্যা ফজরের আগে আত থাকতে উঠছে, পিঠা বানায় আর কান্দে! মেয়্যামানুষ তো! খালি কান্দে!'

পাঁচ

সে সময় ঢাকা মিছিলের শহর। এই মিছিল শুধু অটোনমির নয়, জীবনমুক্তির স্বপ্নেরও মিছিল। মিছিলের বর্ণনায় অন্য অসম্পূর্ণতা যেন ঢেকে যায়। মিছিলে শত সহস্র বছরের জমানো ক্ষোভ আর প্রতিবাদের প্রবাহ...

> 'কিন্তু না, এত মানুষ ঢাকায় সে কোনোদিন দ্যাখেনি... শায়েস্তা খাঁর টাকায় আট মণ চালের আমলে না খেয়ে মরা মানুষ দেখে ওসমান আঁতকে ওঠে। ৪০০ বছর ধরে তাদের খাওয়া নাই—কালো চুলের তরঙ্গ উড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে। মোগলের হাতে মার খাওয়া, মগের হাতে মার খাওয়া, কোম্পানির বেনেদের হাতে মার খাওয়া—সব মানুষ না এলে এই মিছিল কি এত বড় হয়?... চার হাজার টাকা দামের জামদানী বানানো তাঁতীদের না খাওয়া হাড্ডিসার উদোম শরীর আজ সোজা হেঁটে চলেছে।... নারিন্দার পুলের তলা থেকে ধোলাই খালের রক্তাক্ত ঢেউ মাথায় নিয়ে চলে আসে সোমেন চন্দ।... নতুন পানির উজান স্রোতে ঢাকার অতীত বর্তমান সব উথলে উঠেছে আজ, ঢাকা আজ সকাল-দুপুর-বিকাল-রাত্রি বিস্মৃত, আজ তার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নাই, সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সকল ভেদচিহ্ন আজ লুপ্ত।... গোলক পাল লেনের মুখে কলের নিচে কাঁপতে থাকা কলসি যেমন পানিতে ভরে স্থির হয়, আমাদের ওসমান গনির বুকটাও দেখতে দেখতে পূর্ণ হলো। এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারার ক্ষুদ্রতম একটি কণা হয়েও তো সে এই হৃদপিণ্ডে তাপ বোধ করতে পারছে। তাইবা কম কী? ভরা বুকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সে হুংকার দেয়, বৃথা যেতে দেবো না।'

অসাধারণ শব্দাবলীতে এভাবেই ইলিয়াস শিল্পিত করে তোলেন সেই সময়, বস্তুনিষ্ঠতা আর দায়িত্ববোধ তাঁকে দিয়ে যে কাজ করায় তা অনন্য। আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে, মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়, আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে কীভাবে গণঅভ্যুত্থানের মোড় ঘুরে

যায়। আলীবক্স ঠিকই কাজ করে যায় কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতায় দাঁড়াতে পারে না। আনোয়ার তার শ্রেণিগত দুর্বলতা কাটাতে পারে না, শত আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও।

এদিকে ঢাকা শহরে আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ আরও বাড়তে থাকে। এই ঢেউয়ে শহুরে জনগোষ্ঠী এসে যোগ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আমরা এ খবরও পাই যে সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবও এসে মিছিলে যোগ দিয়েছে। এটাই ঘটে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পা দোলানো, ডিসিপ্লিন খোঁজা বড় সাহেবরা এখানে যোগ দেয়াই নিরাপদ ভাবে। যোগ দেয় আইয়ুব খানের পাড় দালাল পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী, মহাজনেরাও। আলাউদ্দিনরা তাদের গ্রহণও করে নেয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ইলিয়াস আরেকটি প্রবল শক্তির উপস্থিতির কথা কীভাবে যেন ভুলে যান। সে সময় শুধু ঢাকা নয় নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গি, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঈশ্বরদী সর্বত্র শিল্পশ্রমিকদের একটানা আন্দোলন, ধর্মঘট, ঘেরাও ১২/১৪/২০ হাজার ক্রমে আরও বেশি শ্রমিকের মিছিল গণআন্দোলনকে গভীর দৃঢ়তা দিয়েছিল। এদের এই ভূমিকাই বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের জন্য ছিল ভীষণভাবে ভীতিকর, যেভাবে ভীতিকর ছিল গ্রামের গরিব খেত-মজুর বর্গাদারেরা। শ্রমিকদের আন্দোলন ও ভূমিকা ছিল অনেক বেশি সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে বুর্জোয়া দলগুলোর সাংগঠনিক প্রভাব ছিল খুবই কম। কমিউনিস্ট দলগুলো গোপনে থেকেই এদের মধ্যে কাজ করেছে। আর এদের ভূমিকাই গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানের চরিত্র দিয়েছে। কিন্তু এই অংশটুকু বাদ গেল কীভাবে?

এদিকে গণআন্দোলন যত তীব্রতা লাভ করছে, ওসমান তত স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে। মধ্যবিত্তের প্রতীক এই ওসমান চরিত্র আন্দোলনের পক্ষে কথা বলে, মিছিলে যায়, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকেও স্ট্রেঞ্জার কিংবা আউটসাইডার হয়ে থাকে। নিজের এই অস্তিত্বের প্রতি তার ঘৃণা। নিজের অতীতকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। সে অসুস্থ হতে থাকে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি অপরিচিত মানুষ।

খিজির বারবার এসে দাঁড়ায় বইয়ের অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে। শিল্প শ্রমিক না বলে এ চরিত্র অতটা সংগঠিত নয়, অতটা সচেতন নয়। সে আকাঙ্ক্ষা করে নিজের স্বাধীন জীবনের, মহাজনকে শেষ করতে চায়। একবার বলে, 'আলাউদ্দিন মিয়ার কথায় কি মিছিলে যাই?' আবার ভাবে, 'আলাউদ্দিন মিয়া না ডাকলে কী করে যাই!' শৃঙ্খল সে ভাঙতে পারে না, কারণ সে একা। তার শ্রেণির লোকদের সঙ্গেই তার বিবাদ হয়। মহাজনের হয়ে তাকে মারধর করে বজলু। ভাসমান শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারে না, তার বন্ধন তাকে পিছু টানে। শ্রেণি সংহতি তার জন্য কঠিন! গভীর ঘৃণা আর ব্যক্তিক উদ্দীপনা নিয়েই খিজির এগিয়ে যায়।

কারফ্যু ভঙ্গ করার জন্য যেদিন ঢাকা শহরের এসব মানুষ অসামান্য হয়ে উঠেছিল, যেদিন বস্তির বালক যুবকেরা একের পর এক গুলি খেয়েও সেনাবাহিনীকে তাড়া করেছিল সেদিনই খিজিরের চূড়ান্ত শৃঙ্খলমুক্তি ঘটলো। সে সময়ের বর্ণনা অতুলনীয়।

> '...কালচে হলুদ আলোর নিচে মানুষের সারি ক্রমে দীর্ঘ হয়, খিজিরের গা একেকবার ছমছম করে ওঠে ...দ্যাখো রহমতউল্লাহর চায়ের দোকানের মেসিয়াররা পর্যন্ত এসেছে, ঐ যে তার গ্যারেজের তোতা মিয়া।... আরে এ যে বজলু! ...ঈশ্বর দাস লেনের মানুষ আসে বাণী ভবনের কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে। ...হাত উঁচু করে জুম্মান স্লোগান দিচ্ছে, তার পাশে আরও কয়েকটা পিচ্চি।... গলি উপগলি শাখাগলি থেকে এই যে ছলকে ছলকে মানুষ আসছে এর ফলে সামনে পেছনে মিছিল কেবল বেড়েই চলে।... সামনে যাওয়া দরকার। ...কারফ্যু ভেঙে শালার টুকরা টুকরা করে ফেলো কালো আকাশ। ...হাজার হাজার মানুষ কারফ্যু ভেঙে ছুটে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে।ক্যান্টনমেন্টের চারদিকের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হবে আজ রাতে, বিশাল সমাবেশের সমবেত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে মিলিটারির গুদাম গুদাম হাতিয়ার। কিংবা হাতিয়ার সব চলে আসবে মানুষের হাতে। ...চুতমারানি মিলিটারিকে আজ ভাসিয়ে দেবে পেচ্ছাবের ফেনার মতো। ...কালচে হলদে আলোয় মিলিটারিদের মুখ দ্যাখা যায় না, ঘন জলপাই রংয়ের হেলমেট

> তাদের মাথার ওপরকার অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছে। মিছিল তখন শতগুণ জোরে ভরা গলায় প্রতিবাদ জানায়, মানি না! মানি না! এই আওয়াজ অন্ধকার ছিঁড়ে টুকরা করতে না করতে ট্রাক থেকে ছুটে আসে টর টর টর টর টঙা টং টং টং।... গুলিবর্ষণ, মিছিলের শেষ প্রান্তের মানি না! মানি না! স্লোগান ও এইসব আর্তনাদের সমবেত কোরাসে পিচের রাস্তা কংক্রিটের ফুটপাত এবং এই দুইয়ের মাঝখানে নালা এক সঙ্গে কাঁপতে শুরু করে। পায়ের নিচে সব কাঁপে। খিজির জানে, এই সময় স্পিড কমাতে নাই।... কিন্তু আরও একঝাক টক টক টক টক ধ্বনির সঙ্গে চোখের সামনেকার কালচে হলুদ আলোর হলুদ ভাগ মিলিয়ে যায়, অন্ধকার গাঢ়তর হয়। কোন শালা খানকির বাচ্চা ট্রাক এসে ধাক্কা দিলো তার বুকে? বুকের বা'দিকে ও পেটের ঠিক ওপর ভাগে... আউজকা গাড়ি জমা দিমু ক্যালায়?—আউজকা ক্যান্টনমেন্ট যাইতে হইবো, জমা টমা! নাইক্কা!'

ছয়

আন্দোলনের গতি এরপর আরও বেড়ে যায়। মহাজন আওয়ামী লীগার আলাউদ্দিন মিয়ারা ঘাবড়ে যায়। আলাউদ্দিন মিয়া বলে, 'দ্যাখো না! শেখ সায়েবে বারাইয়া আহুক। শেখ সাহেব আইলে এইগুলির হাউকাউ থামে!' আলাউদ্দিন মিয়ার হিসাব ভুল নয়। শেখ মুজিবের মুক্তির পর আন্দোলনের মধ্যেকার আগুন কীভাবে যেন নিভে যায়। সে সময় রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বাণী বারবার প্রচার করা হচ্ছে। রেসকোর্সের লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে আজ এই শপথ নেওয়া হয়েছে যে শহিদের রক্তে রঞ্জিত আন্দোলন যেন উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। সব রকম প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশবাসী যেন আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করেন।

কেন এই শান্তির আহ্বান? উচ্ছৃঙ্খল জনতা যখন ঢাকা ক্লাবে আগুন দিতে উদ্যত হয় তখন তাঁর কর্মীর মুখে শোনা যায়, এই ক্লাব এইসব দালানকোঠা—সব এখন আমাদের সম্পত্তি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি

মানুষ এ সবের মালিক। এ সবের ক্ষতি সাধন করা মানে নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগানো। গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে। ঠিক একইভাবে বৈরাগীর ভিটার সভাতেও আহ্বান উচ্চারিত হয়, এই মুহূর্তে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি, বাঙালি হয়ে বাঙালির বাড়ি জ্বালাই, একে হত্যা করে ওর ফসল কেটে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি তার সুযোগ নেবে কারা?

শেখ মুজিব মুক্তি পেলেও শিল্প কল-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আন্দোলন শেষ হয়নি। বাঙালি জাতির ঐক্যের স্বার্থে এগুলোকেও আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। প্রগতিশীল বা কমিউনিস্ট দলগুলোর মধ্যে কিছু লেজ ধরেছিল আওয়ামী লীগের, তারা এতে খুশি। অন্যরাও কিছু করতে পারল না।

এতদিনের নিয়ন্ত্রণহীন টগবগে আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যায়, সব উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণভাবে নব্য মহাজন আলাউদ্দিনের দল। শ্রেণি সংগ্রামের উপাদানযুক্ত সব ধরনের আন্দোলনকে তারা শান্তি ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অস্বীকার করতে থাকে। সে কারণে শেখ মুজিবের মুক্তি পরবর্তী রেসকোর্সের লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে গিয়ে ওসমান হতাশ হয়-

> ‘রেসকোর্সে দারুণ ভিড়। কয়েক লক্ষ মানুষ মিটিং শেষ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।... কিন্তু না! আগুন কোথায়? এই রেসকোর্স পার হয়ে শাহবাগ এভেন্যুতে সেদিন ছিল বুড়িগঙ্গার স্ফীত প্রবাহ, তার ওপর জ্বলছিল আগুনের স্রোত। আজ কি আবার শুকনা ও নেভানো রাস্তা জেগে উঠল?... আগুনের খোঁজে গোটা মাঠ ঘুরে ওসমান এপাশে এসে রাস্তায় নামে।... এই কয়েকদিন কারফ্যু দিয়েও আগুন নেভানো যায়নি আজ এত মানুষ বেরিয়ে এলেও কি শালার আগুন একেবারে নিভে গেল?’

নিভে যায়, নয়তো বিচ্ছিন্নভাবে জ্বলতে থাকে চেংটু বা খিজিরের মতো মৃতদেহের উপরে। কিন্তু তার জোর থাকে না জীবন্তদের মধ্যে। নিশ্চিত হয় বাঙালি খয়বার গাজী, রহমতউল্লাহ, আলাউদ্দিন কিংবা অফিসের বড়

সাহেব, ঢাকা ক্লাবের বাঙালি মাতালেরা। কিন্তু বাঙালি চেংটু বা খিজিরেরা ক্রমেই ওসমানের মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করতে থাকে। সব যখন স্বাভাবিক হতে থাকে, ওসমান তখন ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়।

আর এই ওসমানের চিকিৎসা করবার উপলক্ষ নিয়ে আনোয়ার নিজেকে প্রবোধ দেয়। আনোয়ারের মতো হাজার বামকর্মী তখন আসলে অপ্রস্তুত। তাদের সামনে দিক-নির্দেশনা নেই, তারা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। করমালি খবর দেয়, গ্রামে গাজীরা চেংটুর লোকজনদের উপরে কেয়ামত শুরু করেছে। আনোয়ার তার ভূমিকা ঠিক করতে পারে না। সে আর যেতে চায় না গ্রামে। যে রোমান্টিক স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে গিয়েছিল তার বাস্তব চেহারা তাকে ছিড়েখুঁড়ে ফেলতে চায়। সে জন্য ওসমানের শুশ্রূষা করা থেকে খারিজ হলে ঢাকায় থাকার পক্ষে তার আর কি যুক্তি থাকে? করমালির সামনে সে যুক্তি উপস্থিত করে, ইচ্ছা হলো আর এই অসুস্থ লোকটাকে ফেলে রেখে চলে গেলাম, তা তো হয় না করমালি। হুট করে চলে গেলে কোন কাজ হয়? করমালিও খুব স্বাভাবিকভাবে নিজেদের থেকে বেশ দূরত্বে আনোয়ারকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে বলে—‘হুট কর্যা নিজের মানুষ ত্যাগ কর্যা আপনে যাবেন ক্যামন কর্যা? দ্যাখেন না, গাও ছাড়া এটি থাকতে হামার কেমন উটকা উটকা ঠেকে!’

করমালি নিজের গ্রামে চলে যায়, তার নামে মামলা ঝুলছে, ‘কেয়ামত হচ্ছে গ্রামে’ তবে সকলের সঙ্গে থাকলে বল পাওয়া যায় বলে সে বিনীতভাবে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের এলাকাতেই ফিরে যায়। আনোয়ারও নিজের প্রকৃত অবস্থান থেকে যেটুকু বেরিয়ে এসেছিল সেটুকু গুটিয়ে নিয়ে নিজের অবস্থানে ফিরে যায়। একটু অপরাধবোধে থাকে, এটুকুই। এ চরিত্রের আর বিকাশ হয় না উপন্যাসে। হওয়ার সুযোগও থাকে না।

তার সর্বশেষ অবস্থা আমরা জানতে পারি এভাবে, আত্মীয়–স্বজনের পুরুষানুক্রমিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া, আবার যাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েও কাজ অব্যাহত রাখা—এসব ভাবলেই

অবসাদে গা এলিয়ে পড়ে। এ অবসাদ আনোয়ারের একার নয়। মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকেরই সাময়িক বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার যৌক্তিক অবসানের পরবর্তী ধাপ।

এর মধ্যে পুনরায় সামরিক আইন জারি হয়ে যায়। অন্যরা ঢুকে যায় ঘরে, কিন্তু ওসমান ক্রমশ বেরিয়ে আসতে চায় রেশমের পোকার কঠিন আবরণ থেকে। এই বেরিয়ে আসা তার ভেতরকার সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তার অস্বাভাবিকতা বাড়তে থাকে। খিজির তাকে অবিরাম ডাকতে থাকে। এক পর্যায়ে মধ্যবিত্তের নির্বীর্য আত্মকেন্দ্রিক আত্মরতিসুখমগ্ন খাঁচা থেকে সে বেরিয়েও আসে।

ঘরের বন্দীত্ব, চিত্তের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে ওসমান কোনদিকে যায় এটা লেখক আমাদের বলে দেননি, অনেকগুলো সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সরাসরি না বললেও এ কথাগুলোতে ওসমানের নতুন যাত্রার কথা উঠে আসে। খিজির তাকে টানতে থাকে। যে লোহার রডের মতো আঙুলগুলো দিয়ে ইলেকট্রিক তার মুচড়ে বিদ্যুৎ নিংড়ে নিচ্ছে নিজের হাড্ডিসার শরীরে।

সাত

একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জনপদের সরল বক্র জীবনের গতি-প্রকৃতি, তার গোপন প্রকাশ্য অলিগলি, দ্বন্দ্ব-ঐক্য-সংঘাত-প্রেম-ঘৃণা সবকিছু নিয়ে *চিলেকোঠার সেপাই* একদিকে যেমন হয়ে ওঠে একটি অসাধারণ শিল্প তেমনি তা হয়ে ওঠে এক নির্মম বয়ান। পড়তে পড়তে তাড়া খেতে হয়, সময় উঠে আসে, সহস্র লক্ষ মানুষের পদশব্দ শোনা যায় কিন্তু এরপরও যেন কোথায় খচখচ থেকে যায়। কিছু প্রত্যাশা আহত হয়, কোথায় যেন ঘাটতি থাকে।

আনোয়ার একজন বাম রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র হিসেবেই আমাদের সামনে আসে। কিন্তু তার ভূমিকায় কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ছাপ নেই। সে কি এককভাবে ঠিক ঐ গ্রামেই যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? না কি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ছিল? চরিত্রের নড়াচড়ায় মনে হয় সে এককভাবেই গিয়েছিল। সে যদি এতটা সচেতন হয়ে থাকে তাহলে তার সংগঠনের

বাইরে থাকার যুক্তি কোথায়? যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু তা তার চিন্তায়, সংলাপে আসার কথা। আর যদি সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থেকে থাকে তাহলে এভাবে লাগামছাড়া ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। তার ব্যর্থতা, হতাশা বাস্তব। কিন্তু এটা তার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, এই ব্যর্থতা সে সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলনের। সেদিকটা কোনো না কোনোভাবে আসা খুব সঙ্গত ছিল। এতসব ঘটনা এলেও এদিকটির কোনো ছাপ চরিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে আসবে না, এটা মেনে নেয়া কঠিন। উপন্যাসে শিল্প শ্রমিকদের বিশাল ভূমিকার অনুপস্থিতিও যেন এক প্রবল সত্যকে আড়াল করে।

ওসমান বিচ্ছিন্নতায় ভোগে, আত্মযন্ত্রণা একাকিত্ব দুঃখবোধ তাকে তাড়া করে। কিন্তু তার কারণগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রবল তোড়ে তার পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে শুধু আনোয়ারের মতো কর্মীই ছিল না, কিংবা ওসমানের মতো আন্তরিক অথচ আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত দরদি-ই ছিল না, সব পিছুটান অগ্রাহ্য করবার মতো কর্মীও ছিল। তেমন কর্মীদের জন্যই গণআন্দোলন এতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। কিন্তু তেমন কোনো কর্মী শক্তভাবে এ উপন্যাসে দাঁড়ায়নি। আলীবক্সের মধ্যে দিয়ে তার আংশিক রূপায়ণ আমরা দেখি। কিন্তু এই চরিত্র পাশে থাকে, সামনে আসে না।

ঐ কর্মীদের অনেকে পরে হারিয়ে গেছে, অনেকে ফিরে গেছে, অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছে সে সময় কিংবা পরে, দীর্ঘকালীন নির্যাতনে অনেকে উন্মাদ হয়ে গেছে। তবুও তাদের প্রবল উপস্থিতিই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান দিক।

উপন্যাসে কী কী নেই এ প্রশ্ন তোলা কতটা যৌক্তিক এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্ন উঠবেই যেহেতু এ উপন্যাস আমাদের স্বপ্ন, গর্ব, হতাশা, রক্ত, শ্রম আর ভালোবাসার সময়ের অনবদ্য গাথা হিসেবেই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।

আট

এ উপন্যাসে ন্যাকামি নেই, আরোপন নেই। অত্যন্ত ঋজুভঙ্গি ইলিয়াসের। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতেই তিনি এগিয়েছেন। খিজির, ওসমান, জুম্মনের মা, রানুর পরিবার, চেংটু, খয়বার গাজী, আনোয়ার, নাদু পরামানিক, আলাউদ্দিন, রহমতউল্লাহ, এমনকি বজলু তাদের স্ব-স্ব সামাজিক অবস্থান, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবকিছু নিয়ে অসাধারণ স্বচ্ছতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

এরপরও ইলিয়াসের অসহায়ত্ব আমরা বুঝতে পারি। যেভাবে এই গণআন্দোলন ক্রমেই দানা বাঁধছিল, যেভাবে বুর্জোয়া রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে এর গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছিল, যেভাবে জনগণ সকল আড়ষ্টতা, নীরবতা, সহিষ্ণুতা, কুসংস্কারকে ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছিল তাতে আশা করবার অনেক ছিল। কিন্তু তা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কী কী কারণ ছিল তার আলোচনা এখানে দরকার নেই। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়াটা বাস্তব। এই থুবড়ে পড়া কি পরের ১৮ বছরে কেটেছে? চেংটু খিজির কিংবা আলীবক্স কি নতুনভাবে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে? '৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধে, যা ছিল আরও অনেক বিশাল ঘটনা, চেষ্টা হয়েছিল সেটাও সফল হয়নি। এখনো তো ঐ আলাউদ্দিন, খয়বার গাজী কিংবা রহমতউল্লারা সদর্পে আছে। অফিসের যে বস তখন ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ইনডিসিপ্লিনড কেওয়াসে বিরক্ত ছিল, সে এখন নির্ঘাত দিনরাত প্যারিস-টোকিও নিয়ে ব্যস্ত। যে রাজনৈতিক কর্মী বাঙালির ঐক্য আর শোষণমুক্তির কথা বলেছে, সে হয়তো এখন লুটপাটের ভাগ নিয়ে ব্যস্ত।

এতবছর পরে সে সময়ের চিত্রকল্প রচনা করতে গিয়ে ইলিয়াস তাই কীভাবে উজ্জ্বল স্পষ্ট সংগঠিত একটি চরিত্রের হাতে উপন্যাসের শেষ ভার অর্পণ করতে পারেন? করলে আরোপিত হতো।

হয়তো সে কারণেই ইলিয়াস ওসমানের পরিবর্তনকেই উপন্যাসে অভ্যুত্থানের সারা সময়ের ইতিবাচক পরিণতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ওসমানের এই পরিণতি, এই পরিবর্তন সুনির্দিষ্ট করেননি

তিনি। কালের হাতে ছেড়েছেন। কিন্তু সামনে রেখেছেন হাড্ডি খিজিরকে; অজস্র জ্বালা বুকে নিয়ে লম্বা পায়ে সে এখনো হাঁটছে, কারফ্যু ভাঙছে, শৃঙ্খল ভাঙার জন্য অস্থির চিৎকার করছে।

ওসমানকে তাই আমরা উন্মাদ ভাবতে পারি না। হাজার বছরের শহিদদের সঙ্গে যোগ হয়ে যাওয়া খিজির বা চেংটু আমাদের সামনেও রক্তাক্ত হয়ে উপস্থিত থাকে। ওসমান এখন আগের ওসমান নেই। আগের ওসমানকে সে সর্বাংশে ত্যাগ করেছে। আমরা জানি না, সে কি '৭১-এ যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছে কিনা। কিংবা এখনো চেংটু বা খিজিরের অস্পষ্ট স্বপ্ন স্পষ্ট করে প্রবল হতাশা আর আত্মঘাতী অস্থিরতার কালকে বদলে ফেলার জন্য জোর গতিতে এগিয়ে চলছে কি না। আমরা জানি না ঠিকই কিন্তু এমনও ভাবতে চাই না যে সে হারিয়ে গেছে কিংবা আনোয়ারের মতো আবার নিজের গর্তে ফিরে গেছে- কিংবা আলাউদ্দিন যে হয়তো এতদিনে চোরাচালানী করে কোটিপতি বা সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হয়েছে তার আশ্রয়ে বেঢপ আকৃতি নিয়েছে। ইলিয়াস আমাদের এরকম ভাবনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত দেন, কিন্তু স্পষ্ট বলেন না। আমরা ভাবতে থাকি পরের কাল নিয়ে। আগামীকাল নিয়ে।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

খোয়াবনামা: খোয়াবে-চেতনায় মানুষ ও সময়

‘জীবিত’ আর ‘মৃতের’ মধ্যে তফাৎ কী? কিংবা তফাৎ কী ‘চেতন’ আর ‘অবচেতনে’? কী তফাৎ অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতে? তফাৎ তো আছেই, এসব শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি তখন তা দিয়ে আমরা আলাদা আলাদা অবস্থান নির্দেশ করি, মানুষের-চারপাশের-সময়ের। কিন্তু এই শব্দগুলো একমাত্রিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, অবস্থা অনুযায়ী বহুমাত্রিক অর্থ ধারণ করে। একই শব্দ বিপরীতকে সঙ্গে নিয়েও অগ্রসর হতে পারে। একের মধ্যে অন্যে ঢুকে যেতে পারে।

‘জীবিত’ মানুষ বললে আমাদের এক ধরনের ধারণা হয়—‘প্রাণ’ ধারণকারী মানুষ; সে হিসেবে নড়াচড়ায় সক্ষম, যার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়—যিনি অন্যদের নড়াচড়াকে প্রভাবিত করেন, যিনি সময় ও স্থানের মধ্যে অবস্থান করেন—তাকে টানতে চেষ্টা করেন। আর ‘মৃত’ মানুষ বললে সাধারণভাবে আমরা বুঝি প্রাণহীন মানুষ; যিনি নেই, প্রাণ না থাকার কারণে তিনি নেই—নেই মানে আমরা যাকে ‘আছে’ বলি তার মধ্যে ‘নেই’। অর্থাৎ তার উপস্থিতি নেই—তিনি অনুপস্থিত। তিনি অন্যদের পরিচালনা করতে অক্ষম এমনকি অন্যদের নিজের উপস্থিতি টের পাওয়াতেও অক্ষম, অক্ষম তাদের প্রভাবিত করতে, সময় ও স্থানের মধ্যে ঠেলেঠুলে নিজের জায়গা করে নিতে অক্ষম। কিন্তু জীবিত বা ‘মৃত’ শব্দের মধ্যে ঢুকে থাকা এসব অনেক ধারণা উপধারণা, আমরা কি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সবার ক্ষেত্রে, সবক্ষেত্রে ঠিক ঠিকভাবে প্রযোজ্য হয়? যিনি জীবিত নামে পরিচিত তিনি মৃতের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন কিংবা যিনি মৃত হিসেবে গণ্য তিনি জীবিতের অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন এরকম কি দেখি না আমরা? দেখি, অনেক দেখি। দেখছি।

চেতন আর অবচেতনের দূরত্ব কি আরও কম নয়? এগুলো তো সব জড়াজড়ি করেই থাকে। মানুষ যখন ঘুমে থাকে, শরীরবিদ্যা অনুযায়ী, মানুষ তখন সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ বা শৃঙ্খল কিংবা সবগুলো থেকে প্রাপ্ত সতর্কতা-ঔচিত্যবোধের ভার থেকে মুক্ত থাকে। সে সময়, সে হিসেবে, মানুষ থাকে মুক্ত, তার বিচরণক্ষেত্র হয় অসীম; সময়-স্থান সব একাকার হয়ে যায়, জীবিত-মৃত ভেদ থাকে না। সে অতিক্রম করে নিজের মধ্যেকার সব বাধা। ভেতরের আকাঙ্ক্ষাগুলো শতগুণে বর্ধিত হয়, অবচেতন চেতনের স্থান দখল করে।

কিন্তু তারপরও কি মানুষ সবকিছু অতিক্রম করতে পারে? মানুষের অভিজ্ঞতা, শৃঙ্খল, প্রশিক্ষণ, ভেতরের বাধা, সামাজিক অনুশাসন, ঔচিত্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ কি সেখানেও উপস্থিত হয় না? সেখানেও কি মানুষ ছটফট করতে থাকে না? সময়-স্থান একাকার হয়েও, তুলনামূলকভাবে অনেক মুক্ত হয়েও কি মানুষের অসীম একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় না? নিজের থেকে নিজেকে কি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যায়?

মানুষ তাই যা স্বপ্ন দেখে, নিদ্রায় বা জাগরণে, যে খোয়াবের মধ্যে সে চলাফেরা করে সেখানেও তার বাস্তব জগত কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত থাকে। সরাসরি বাস্তব হিসেবে হয়তো নয় কিন্তু তার জীবনই সেখানে প্রতিফলিত হয়-তার মধ্যে ভাঙচুর হয়, আকার আকৃতি বদলায়। তার শক্তি, অক্ষমতা, বেদনা, অসহায়ত্ব, ক্ষমতা সবকিছু জড়াজড়ি করে তাকে টানতে থাকে। বিশুদ্ধ ফ্যান্টাসি বলেও তাই কিছু নেই—ফ্যান্টাসি পুরোপুরি বাস্তব নয় কিন্তু তারই সম্প্রসারণ কিংবা ভাঙচুর, তা কল্পনা-আকাঙ্ক্ষারই, নিয়ন্ত্রণহীন হলেও, বিস্তার।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপেক্ষিকভাবে সময়ের অবস্থান নির্দেশ করে। 'আপেক্ষিকভাবে' কথাটা মনে না রাখলে এর মধ্যেও গণ্ডগোল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সময়ের এই অবস্থানগুলোকে আপেক্ষিকভাবে নির্দেশ করা যায় কিন্তু তা চূড়ান্ত কোনো অবস্থান নয়। অতীত বর্তমান ছিল, বর্তমান অতীত হচ্ছে হবে, ভবিষ্যৎ বর্তমান হবে, অতীত হবে। এ এক অবিরাম প্রবাহ। একে ভাগ করা যায় না। একে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সময়কে যতটাও ভাগ করা যায়, সময়ের প্রভাব-রেশকে ততটা নয়। অতীত বর্তমানের ভেতর ঢুকে যায়। অতীত বর্তমানের শঙ্কর ভবিষ্যতকে নির্মাণ করতে থাকে। ভবিষ্যতের রাস্তা তৈরি হয়।

বর্তমানের মধ্যে কতভাবে অতীত উপস্থিত থাকে, কতদূর পর্যন্ত অতীত উপস্থিত থাকে, অতীতের মানুষের ভালোবাসার-সংগ্রামের-অতৃপ্তির কত অশরীরী উপস্থিতি বর্তমান মানুষকে তাড়া করতে থাকে তার পরিমাপ কঠিন। আবার বর্তমানের নানা ভাঙচুর, টানাপোড়ন, নড়াচড়া কীভাবে ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করছে তাকেই বা কীভাবে মাপা যায়? পরিমাপ তো দূরের কথা এগুলো উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসাই কি সহজ কাজ?

একমাত্র পথ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মানুষকে অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিয়ে দেখা; মানুষের চেতন-অবচেতন-অচেতন জগতের যোগাযোগের রাস্তাগুলো, তার লেনদেনের গলি-উপগলিগুলো শনাক্ত করা। মানুষের মধ্যেকার বহুরকম পরিচয় তার শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, পেশা, গোষ্ঠী, পরিবার ইত্যাদি এবং সেগুলোর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সেগুলোর গতিশীলতাকে, তার নিজের পরিবর্তন-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-ঐক্য, অন্যের সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল, তার অবিরাম চলমান অবস্থা ইত্যাদিকে গভীর উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসা; সমাজ রাষ্ট্র আইনকানুন রাজনীতি ইত্যাদির চেহারা, তার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষের দৃষ্টিপাত প্রতিক্রিয়া—এগুলোর ধরন ও মর্মবস্তুর পরিবর্তন, মৃতের ও জীবিতের ধারাবাহিকতা—একের সঙ্গে অন্যের যোগসূত্র ও যোগাযোগ...।

বিশাল ক্যানভাসে গভীর সৃজনশীল নির্মাণই এটি সম্ভব করতে পারে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর *খোয়াবনামায়* এই কাজটিই করেছেন।

স্ববিরোধী সময়ের যাত্রা

একদিকে তেভাগা আন্দোলন এবং অন্যদিকে ভারতবিভাগ অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের পৌরহিত্যে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়কাল কেন্দ্র করেই *খোয়াবনামার* উঠানামা। দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (অপ)রাজনীতির ভেতরে, সামনে পেছনে—ঐ সময়ের পূর্ব বাংলার কাৎলাহার বিলের ধারের মানুষদের জীবনের প্রবাহ, তার দৃশ্যমান

ও অদৃশ্য, চেনা ও অচেনা দ্বন্দ্ব সংঘাত, বদলে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিস্তার, শ্রেণিবোধের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রূপ, দূর থেকে তেভাগার উপস্থিতি, ভালোবাসার বিচিত্র গতি, মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা, প্রতারণা প্রবঞ্চনা, ঔপনিবেশিক শাসন ও শ্রেণি শাসনের আধিপত্য ও তার বিরোধী লড়াইয়ের সচেতন ও অবচেতন চেহারা ইত্যাদি নিয়েই *খোয়াবনামার* বিস্তার।

উপস্থিত-(অন)উপস্থিত চরিত্ররা

এই গ্রন্থের পুরোটায় যে ব্যক্তি প্রবলভাবে উপস্থিত, (এবং উপস্থিত নন) একটি জনপদের সংখ্যাগুরু মানুষের গল্পগাথা, কাহিনি বয়ানে আর স্বপ্ন দেখা ও সাহস সঞ্চয়ে যার ভূমিকা কেন্দ্রীয় তিনি মুনসী বয়তুল্লা শাহ। ফকির বিদ্রোহে তিনি ব্রিটিশদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তাঁর বাস পাকুড় গাছে—মানুষ তাই বিশ্বাস করে। তিনি মৃত কিন্তু জীবিত, অতীত কিন্তু বর্তমান, তিনি চেতন ও অবচেতন দুক্ষেত্রেই বিচরণ করেন। তাঁর বিচরণের পথ অনুসন্ধানের মধ্যেই আমরা পাই তমিজের বাপকে। তমিজের বাপ, বাঘাড় মাঝির নাতি, চেরাগ আলি ফকিরের নাতজামাই বলে উপন্যাসে যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে তার নাম আমরা জানি না, তার নাম কখনো বলা হয়নি। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংযোগস্থল এই (অ)ব্যক্তি—তার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই; কিন্তু তার খোয়াব ও খোয়াবনামার মধ্যে আমরা দেখি—বহু চরিত্র: বর্তমান অতীত; বহু আকাঙ্ক্ষা: মৃত ও জীবন্ত; বহু বেদনা: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট। তাঁর নিদ্রা ও জাগরণ, হাঁটা ও শুয়ে থাকা, ঘর ও বাহির, অতীত ও বর্তমান, চেতন ও অবচেতন, ক্রোধ ও নির্লিপ্ততা ইত্যাদির মধ্যে কোনো রেখা টানা কঠিন। এগুলো একাকার হয়ে তমিজের বাপ একাই অনেকের, এক সময়ে অবস্থান করেও বহু সময়ের, মাঝির নাতি-চাষার বাবা-গায়েনের নাতজামাই ইত্যাদি হিসেবে নিম্নবর্গ-উচ্ছেদ-কোণঠাসা হতে থাকা মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। শাসককুলের বদলে যাওয়া চেহারা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার সংঘাত চলতে থাকে। সংঘাতের রূপ বহুমাত্রিক-খোয়াব পর্যন্ত তার যাত্রা।

রাতে তমিজের বাপের, ঘোরের মধ্যে, বিলে হাঁটা-ঘুমে মুনসীর কথা—

'ভাঙা ভাঙা গলায় টেনে টেনে কে যেন কয়,
সিথানে পাকুড়গাছ মুনসির বসতি।
তলায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি।
গভীর নিশিতকালে মুনসির আদেশে।
বিলের গজার মাছ রূপ লয় মেষে।' (পৃ. ১৪)

উপন্যাসে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, চেরাগ আলী ফকির এবং কেরামত আলী। তারা কবি-গায়েন। চেরাগ আলী ফকিরের নেশা ও পেশা গান। গান বাঁধা ও গাওয়াই তার একমাত্র কাজ। এ নিয়ে তার অহংকার প্রচণ্ড। নিঃসম্বল অবস্থা তাকে কাবু করতে পারে না, এ নিয়ে তার কোন বিকারও নেই। তার সবসময়ের সঙ্গী নাতনী কুলসুম, যে পরে তমিজের বাপের স্ত্রী হয়। ফকিরের বয়ানে বার বার ঘুরে ঘুরে মুনসির কথাই আসে। মানুষ আর আল্লাহ তার গানে একাকার, সে নিজেই গান বাঁধে, সুর দেয় কিন্তু তার ধারণা—গান 'আসে,' এটা তার বিশ্বাস, অন্যদেরও তাই। অন্যদিকে কেরামত আলী পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী, অনেক 'বাস্তব' মানুষ। গান লেখে, বইও ছাপায়। তেভাগার প্রভাবে সে তেভাগার গান লেখে। কিন্তু পরে সে ক্রমে ভাড়াটিয়া হয়ে ওঠে, পাকিস্তানের গান লিখে পশার পাওয়ার সুযোগ তাকে বদলে দেয়, তার ক্ষমতা ও অঙ্গিকার দুটোই ধ্বসে যেতে থাকে তার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বৈকুণ্ঠ চেরাগ ফকিরের ভক্ত, গানের পাগল। গুনগুন করে উচ্চারণ করে ফকিরেরই গান। বৈকুণ্ঠও উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র, যে অভ্যাসবশত জাতরক্ষার কথা চিন্তা করলেও তার চলাফেরা ভালোবাসা জীবনকেন্দ্র যা কিছু ও যাদেরকে ঘিরে তাতে সে হয়ে উঠে নিম্নবর্গের, ধর্ম ও পেশা নির্বিশেষে, মানুষের উজ্জ্বল চরিত্র। জোতদার শরাফত মণ্ডল এবং তার পরিবারের দুই ছেলে শহুরে চাকুরে আজিজ ও শিক্ষিত মুসলিম লীগের গ্রাম-নেতা কাদের উপন্যাসে গ্রাম-শহরের নতুন গড়ে উঠতে থাকা মুসলিম ভূস্বামী-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করে। শরাফত হিন্দু জমিদারের আশ্রয়ে এবং তার বর্ণবাদী-সাম্প্রদায়িক উপেক্ষা তাচ্ছিল্য সবকিছু নিয়েই

বড় হয়েছে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার পুত্র এই ধারাকেই আরও এগিয়ে নেবার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করে। কালাম মাঝি একবার মুসলমান একবার মাঝি পরিচয় নিয়ে দাঁড়ানোর, জোট বাঁধার চেষ্টা করে। সাম্প্রদায়িকতা ব্যবহার করে ভাগ্য গঠনের চেষ্টা করে কিন্তু যখন সে দেখে তার ফল নিয়ে যাচ্ছে শরাফতেরা তখন আবার মাঝিদের দলে টানতে চায়। সেও নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সৌভাগ্যের ভাগীদার হয়। ইসমাইল মুসলিম লীগেরই নেতা, শহুরে। ধর্মচর্চা না করেও সে মুসলমানদের ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেতা, মুসলিম লীগের জোতদার-জমিদার সদস্যদের সঙ্গে তার অনেক সময় বিরোধ হয় কিন্তু, তার নিষ্পত্তিও হয়ে যায়।

উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র দুটি—একজন কুলসুম, অন্যজন ফুলজান। আরেকজন নারীর উপস্থিতি পাই আমরা উপন্যাসের শেষে—যে ভবিষ্যতের নারী—তমিজ এবং ফুলজান—জেলে এবং চাষার সন্তান, সখিনা। কুলসুম চেরাগ আলী ফকিরের নাতি, তমিজের বাপের দ্বিতীয় স্ত্রী। তার ভেতরে ফকির, জেলে, চাষা এবং নারী একই সঙ্গে বসবাস করে। কুলসুমের মাথাতেও ফকির একটানা সুর সৃষ্টি করে। তার কিছু সে বোঝে, বেশিরভাগই বোঝে না। অন্যদিকে ফুলজান চাষার ঘরের পরিত্যক্তা নারী, যে বাবার জমিতে খাটে দিনরাত, কিন্তু পরিত্যক্তা হবার অপরাধে এত পরিশ্রমেও তার কোন স্বীকৃত অবস্থান তৈরি হয় না। জেলে পরিবারের সন্তান কিন্তু নতুন চাষা তমিজের চাষা হবার প্রক্রিয়ায় তার প্রেমিকা হয়ে উঠে ফুলজান, যাদের প্রেম আলোড়ন তোলে সমাজে, জেলে-চাষা পৃথকীকরণের মধ্যে। এরকম আলোড়নের খবর আমরা পাই কলু পরিবারের ছেলে গফুরের সঙ্গে মাঝি পরিবারের মেয়ে আবিতনের প্রেম ও বিয়ের সুবাদেও।

নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ

মাঝিদের সঙ্গে চাষাদের বিরোধ উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। এর বহুমাত্রা আছে। গ্রামীণ সমাজে, শ্রেণিগত অবস্থানের কথা বিবেচনা করলেও দেখা যায়, দেখা যেত আরও বেশি, সেটি ছাপিয়ে ওঠে পেশাগত পরিচয়, এবং তা ক্রমে লাভ করে বর্ণগত চরিত্র। মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথা নেই।

তবে এটা গ্রামে, বিশেষত এ সময়কালে, জেলে-তাঁতী-কলু-নাপিত-চাষাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে মেনে নেয়া কঠিন। পরস্পরের বাড়িতে খাওয়া, বিবাহ, যাতায়াত এমনকি জেয়াফতে খাওয়ার মধ্যেও বিভেদের দেয়ালের সীমা দেখা যায়। জেয়াফতে মুসলমান জোতদার, মাঝি, চাষা সবার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা। খানকা ঘরে খাস মেহমান, তাদের জন্য আলাদা রান্না।

কিন্তু এই বৈরিতা টিকে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এর পেছনে নানা উপাদানও সক্রিয়, যা সবসময় চোখে দেখা যায় না। এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো খুব ভেতর থেকে দেখা হয়েছে উপন্যাসে।

বিল ও পাকুড়গাছ

কাৎলাহার বিলে মাছ ধরতে অভ্যস্ত এলাকার মাঝিরা, সে বিলে দখলদারিত্ব নিয়েছে শরাফত মণ্ডল। বাঘাড় মাঝির নাতি 'তমিজের বাপ' এই বিলে মাঝিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, বাস্তবে পারে না। এমনকি নিজের পিঠের আঘাতের চিহ্নকার কারণে হয়েছে সেটাও সে শনাক্ত করতে পারে না। খোয়াবে বিল জুড়ে হাঁটে, শক্তি পেতে চেষ্টা করে 'পাকুড়গাছে ঘাটি গাড়া' গুলিবিদ্ধ মুনসীর কাছ থেকে।

> 'মুনসির আওয়াজ যেন আতসের শ্বাস।
> দিল কাঁপে যাহাদের দুনিয়াতে বাস।।'

শরাফতের সঙ্গে মাঝিদের দ্বন্দ্বে শরাফতের একমাত্র রাস্তা হল চাষা বলে অন্যদের নিজের দলে রাখার চেষ্টা করা। তার এই চেষ্টা প্রবাহিত হয়ে ঘরভাঙা মাঝি আর চাষাকেও প্রভাবিত করে—তারা মহা উত্তেজনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়।

জোতদারের দখল থেকে উদ্ধারের জন্য মাঝিরা লড়াইও করে, অন্তত করতে যে চেষ্টা করে তার দৃষ্টান্ত তো ইতিহাসে অজস্র। এরকম একটি লড়াইয়ের প্রস্তুতি—লড়াই এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র-জোতদার-জমিদারদের পাল্টা আঘাত, মাঝিদের পরাজয় ও বিপর্যয়ের অসাধারণ আখ্যান তৈরি করা হয়েছে উপন্যাসে (পৃ. ২০৮-২২৭)। সে লড়াইয়ে তাদের শক্তি

যোগায় অতীতের মুনসীর লড়াই, তমিজের বাপের অর্ধচেতন উপস্থিতি আর জলের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে তৈরি গাথা।

> 'মাঝি বিনা বিল আর জল বিনা মাছ।
> পুত্রহীন মাতৃকোল পুষ্প বিনা গাছ।।
> আওরতে না পায় যদি মরদের চুম।
> যতো জেওর দাও তারে রাতে নাহি ঘুম।।'
> কিংবা
> 'মণ্ডলে করিল কবজা মাঝির কাৎলাহার।
> কাঙ্গাল মাঝিপাড়ায় উঠে করুণ হাহাকার।।'
> এবং
> 'বিলে না পরশ যদি পায় মাঝি অঙ্গ।
> জল শুকাইয়া যায়, না থাকে তরঙ্গ।।
> কেয়ামতে বলে শুন শুন দিয়া মন।
> কাৎলাহারে জল কান্দে আয় মাঝিগণ।।'

পাকিস্তান হলে এই বিল মাঝিদের কাছেই আসবার কথা, এরকম প্রতিশ্রুতিই মাঝিরা পেয়েছিল পাকিস্তানের সৈনিকদের কাছে। পেল মাঝিরা নয় মাঝিই—কালাম মাঝি, সে এখন নতুন ইজারাদার, সে বলে: 'বিল তো হামি ইজারা লিছি। দস্তুরমতো টাকাপয়সা খরচ কর‍্যা ইজারা লিছি এই মাস থাকা। মণ্ডলের কবজা থ্যাকা বিল খালাস করতে হামার খরচ তত কম হয় নাই, বাপু। হামাক খাজনা না দিলে আমার চলবি ক্যাংকা করা?' মাঝিদের একথাটা বুঝতে সময় লাগে—তারা ভাবে: 'আরে পাকিস্তানে জমিদারিই থাকিচ্ছে না। কিসের জমিদার? তার আবার পত্তন দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি?... পাকিস্তানেত আবার জমিদার আর লায়েবেক পোঁছে কেটা?' ঘোর কেটে যেতে বেশি সময় লাগে না। যে মাঝি জাত হিসেবে নিচু, যে মাঝির নেতা হিসেবে কালাম মাঝি শরাফতের সঙ্গে লড়াই করেছে, সে এখন জাতে উঠেছে, সেই এখন ইজারাদার—উপরন্তু পুলিশ 'তহসেন দারোগা' তার পুত্র। নতুন শত্রুকে সামনে দেখে মাঝিরা পাথর হয়ে যায়।

নতুন সামাজিক শক্তি

এই পাকিস্তান আন্দোলনের মোটা দিকগুলো আমরা জানি। কিন্তু এর ভেতরের গড়ে ওঠা নানা সূক্ষ্ম ও জটিল দিকগুলো তৈরি হয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম পর্যায়ে অনেক উপাদান ধারণ করে, অনেক দ্বন্দ্ব ধারণ করে, অনেক দ্বন্দ্ব তৈরি করে, আবার অনেক দ্বন্দ্বের নিরসন করে। ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে কলকাতার কেন্দ্র থেকে মফস্বল শহর এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে গ্রাম এমনকি বিল পর্যন্ত বারবার যাতায়াত করেছেন। এখানে ইসমাইলের মতো ব্যক্তি, নায়েব, *আনন্দবাজার* পত্রিকা, আবার তমিজের বাপ এরা সবাই যার যার অবস্থান জানায়। ইসমাইল বা আজিজ-কাদের-শরাফতরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে যত পরিষ্কার, তমিজের বাপেদের তা নয়, উপন্যাসের বুননেও এই বাস্তবতার প্রতিফলন আছে।

পাকিস্তান আন্দোলনের ভেতরে যে নানা স্রোত তৈরি হয়েছিল, নানা চরিত্রের টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে তার সম্পর্কেও আমরা সচেতন হই। একদিকে তরুণ কর্মীরা জমিদারি উচ্ছেদের দাবির কথা বলে, চাষাদের কাছে এসে তেভাগা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্যদিকে জমিদার নেতারা এসব প্রবণতাকে কমিউনিস্টদের কুপ্রভাব বলে শনাক্ত করে। নেতা কর্মীদের বোঝায়—

> 'তোমরা জমিদারদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে, বড়লোকদের মারবে। কমুনিস্টদের সঙ্গে তাহলে তোমাদের ফারাক কী? ইসলামে কি কারও সম্পত্তি দখল করার হুকুম আছে? আমাদের নবী করিম সালালাহু আলাহিসসালাম কি হজরত ওসমান রাজিআল্লাহ্ আনহুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন? বরং তার সঙ্গে তিনি তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ধনী গরিব বড়ো কথা নয় বাবা। পরহেজগার মানুষ আমির হলেও ভালো, গরিব হলেও ভালো ...তোমাদের লীগের বড়ো বড়ো হোমরাচোমরা তো সবাই জমিদার আর বড়োলোক। তাদের উচ্ছেদ করলে তোমাদের পার্টি টিকবে কী করে? (পৃ. ১০৮-৯)।'

শহুরে স্বচ্ছল উপনেতা জমিদারি উচ্ছেদে সায় দেয়, তেভাগায় সায় দিতেও অনেক সময় আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু কর্মীদের তৎপরতায় উদ্বিগ্ন নেতারা উপনেতাদের কাছে তদ্বির করতে থাকে—

> 'ছোঁড়াদের ডেকে বলে দাও, তোমরা ইসলামের কথা বলো।... ইসলাম গরীবদের হক আদায় করে। ইন পাকিস্তান উই উইল ইনট্রোডিউস জাকাত। আল্লাহ যাকে দৌলত দিয়েছেন সে তার প্রপার্টির টু অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে জাকাত ফান্ডে ইসলামে ইজ এ ফুল কোড অফ লাইফ।...'

কিন্তু শহরের সংগঠকের চিন্তা অনেকদিকে সামলাতে হয়। বর্গাচাষীদের সমর্থন দরকার, কিন্তু 'জেলার পশ্চিমে অনেকটা এলাকা জুড়ে আধিয়াররা ধান কেটে তুলছে নিজেদের ঘরে। ...এরা নিজেরা তো দিচ্ছেই না, এমনকি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে ধান সব নিজ নিজ ঘরে তোলার জন্যে নিরীহ গ্রামবাসীদের উস্কানি দিচ্ছে, ফলে পাকিস্তান ইস্যু মার খাচ্ছে। এলাকার ভদ্রলোকদের সাপোর্ট ছাড়া দল টেকে কী করে?' (পৃ. ১৩৩)

জোতদারদের উদ্বেগ গভীর—

> 'হমাগোরে সর্বশান্ত কর্য়া দিলো। আরে বর্গাচাষা হামার জমির ধান লিয়া গেলো লিজের ঘরত, আবার শুনি ওই চাষা বলে হামারই পার্টিরই মানুষ। মানষে হাসে, ইগলান কী পার্টি করো গো?'... তিন হাজার বিঘা জমির মালিকের সর্বশান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সবাই খুব চিন্তিত। তাদের সমবেত দীর্ঘশ্বাস পড়ে।...' (পৃ. ১৩৪)।

জোতদার দুই দিকের 'শত্রু' চিহ্নিত করে—

> আমাদের উপরে জুলুম দুই দিক দিয়া। জমিদার লিত্যি খাজনা ধরে। ফ্লাউট কমিশন রেপোর্ট দিলো, কই কিছু তো হয় না। জমিদারি উচ্ছেদ তো হামরাও চাই। আবার দেখেন লিচের দিকের বিপদ, জমির ফসল লিয়া যাচ্ছে আধিয়াররা। হামরা এখন করি কী?' (পৃ. ১৩৭)

মুসলিম পরিচয় সামনে আনতে গিয়ে অন্যান্য বিপত্তিও হয়। সুন্নী, শিয়া বিরোধ কিংবা কাদিয়ানি কিংবা বিভিন্ন মাজহাবের বিরোধ সামনে চলে আসে। এগুলোও সামলাতে হয়। ইসমাইল বলে—

> 'ইস এই করেই তো মুসলমান গেলো। এখনো তোমরা হানাফি আর মোহাম্মদি নিয়ে বাহাস করো।... ভোটের সময়টা অন্তত এসব কথা মুখেও এনো না... কায়েদে আজম তো সুন্নি মুসলমানও নন, শিয়াদের মধ্যেও তারা আলাদা খোজা কমিউনিটি লোক।' কাদের ইসমাইলের কথাবার্তায় উদ্বিগ্ন হয়, তার উদ্বেগের বিষয়টাও লক্ষণীয়। ইসমাইল নামাজ পড়ে না, সুযোগ পেলেই মৌলবি মুনসি নিয়ে ঠাট্টা করে কিংবা বাড়িতে তার মেলামেশা 'হিন্দু ভদ্রলোকদের' সঙ্গে এসব নিয়ে এই উদ্বেগ নয়, উদ্বেগ হল মাঝিদের জামাতে নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। কেননা একে মাঝিরা নিচু জাত আবার তাদের মজহাব আলাদা।' (পৃ. ২২৮-২২৯)

পাকিস্তান আন্দোলন দানা বাঁধার পেছনে যেমন গ্রামে-শহরে মুসলমানদের মধ্যে নতুন শ্রেণির উদ্ভব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এই শ্রেণিসমূহের সংহত রূপ লাভ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অভিজাত পরিচয়ে উন্নীত হওয়ার পেছনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। অভিজাত, জমিদার, নায়েব বা শিক্ষিত হিন্দুরা একদিকে যেমন বিকল্প সুযোগ থাকার কারণে দেশত্যাগ করেন, তেমনি এদের দেশত্যাগে উদ্যোগী ভূমিকাও নিতে দেখা যায় অনেক নব্যধনী বা আকাঙ্ক্ষী মুসলমানদের। উপন্যাসে আমরা এই কিছু চিত্রের শিল্পিত উপস্থাপনা দেখি। শহর গ্রামের অনেক বাড়ি, জমি, ব্যবসা, বিল ইত্যাদি দখল করে বা ক্ষমতার কেন্দ্রে এসে রাতারাতি অনেক আজিজ, কাদের, শরাফত, কালাম, সামসুদ্দিন ডাক্তার, সাদেক উকিল, সামাদ খান, মফিজুল হক, ইসমাইল সম্পত্তিশালী অভিজাত শাসকের কাতারে চলে আসে। যেখানে একটু ঘাটতি ছিল সেখানে পয়সার জোরে বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের পথ খোলা ছিল, 'শরাফত মণ্ডল একেবারে পাগল হয়ে উঠল: ওই বাড়ির কালো কেন, খোঁড়া কানা মেয়েও ঘরে নিয়ে এলে জেলার পূব এলাকার সবখানে তার ইজ্জত বাড়ে।' (পৃ. ৩৩৯)

হিন্দু জমিদারদের দেশত্যাগ এবং অন্যদিকে জমিদারি উচ্ছেদে লাভবান হয় শরাফতেরাই। ভূ-সম্পত্তির সঙ্গে যোগ হয় নতুন ব্যবসা, তার পুত্ররা টাউনে স্থায়ী হয়ে যায়। বাঙালি মুসলিম শহুরে মধ্যবিত্তের গোড়াপত্তন হয়। অন্যদিকে জমি আর পানি সবকিছুর উপর সব রকম অধিকার হারিয়ে তমিজেরাও ছিন্নমূল মানুষের নতুন গোষ্ঠী তৈরি করতে থাকে। পুঁজিবাদী সম্পর্কের আনাগোনা দেখা যেতে থাকে।

প্রকৃতি আর মানুষ

একদিকে জোতদারের সঙ্গে অন্যদিকে জমির সঙ্গে বর্গাদারের সম্পর্কের বহুদিক জীবন্ত রূপে উপস্থিত এই উপন্যাসে। জমির সঙ্গে চাষা বা কৃষকের সম্পর্ক নিছক বৈষয়িক বা ব্যবসায়িক নয়—যে রকম জোতদারের বা ধনী কৃষকের। জমি তার সৃজনশীলতার ক্ষেত্র, জমির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, ভালোবাসার-হতাশার-আনন্দের-তৃপ্তির-প্রাপ্তির। জমির সঙ্গে উৎপাদকের এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক বারবার ভেঙে যায় মালিকানার অশ্লীল দাপটে: 'জমির ধান তো চুরি করলুই, প্যাট তোর তাও ভরে না, না? এখন হামার জমির ধানের ভাত খাবার সখ হচ্ছে হামার বিলের মাছ দিয়া?' (পৃ. ২১৯) জেলে হিসেবে নিজেদের বিলে মাছ ধরতে যায় তমিজ, নিজের সর্বস্ব দিয়ে জমিতে ফসল ফলায়। কিন্তু তারপরও আক্রান্ত হতে হয় তাকেই, মালিকানার দাপটের সামনে সে কুলাতে পারে না। পালিয়ে বেড়াতে হয় মামলা কাঁধে নিয়ে।

উৎপাদনের সময় জমির সঙ্গে চাষার সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকে না, গান-কথা-কল্পনা সব পরিশ্রমকে আনন্দে পরিণত করে। জমি চাষের সময় চাষা কৃষি বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিদ, পানিবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক আরও কত কি তা এই উপন্যাসে অণু-পরমাণু নিয়ে উপস্থিত। এই চাষার ঘরে ধান তোলার উৎসবের কি তুলনা হয়? উচ্ছাসে কত কথা, কত পরিকল্পনা (পৃ. ১৪৮)।

কিন্তু সেই জমির ফসলের হিসাব নিয়ে যে নির্মম খেলা হয় তা এই উৎসব-উচ্ছ্বাসকে কিছু পরেই ম্লান করে দেয়। নির্মম বাস্তবে ফিরে আসে চাষা।

জোতদারের সাঁড়াশি আক্রমণ যখন তাকে জমি ও তার তৈরি ফসল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে তখন তেভাগার গল্প তাকে আকর্ষণ করতে থাকে। কেননা, নিজের শুধু দিনরাতের শ্রম নয়, জাগরণ আর ঘুমের স্বপ্ন, দিনরাতের কত কল্পনা—দিনে দিনে বেড়ে উঠা, রঙ বদলানো ফসলের সঙ্গে সরব-নীরব আলাপ, সোহাগ সবকিছু দিয়ে তৈরি যে ফসল সে তো নিছক একটি উদ্ভিদ নয়, মনের মানুষের থেকে তা কোনোদিক থেকেই ভিন্ন নয়। হিসাবের জটিলতায় আর ক্ষমতার ভারসাম্যের কারণে সেই ফসলই চলে যায় শরাফত মণ্ডলের ঘরে। এই ঘর এই অঞ্চলের মুসলিম লীগের কেন্দ্র, 'সকল মুসলিম ভাই ভাই' বলে আওয়াজ যখন তুলে শরাফত হিন্দু জমিদারের পাশে নিজের জায়গাটা পোক্ত করে নিচ্ছে। তখন মুসলিম বর্গাদারের কাছ থেকে চুষে নেয়ায় পিতা-পুত্রের সম্মিলিত যে কায়দা ইলিয়াস তুলে এনেছেন তার দিকে মনোযোগী না হয়ে উপায় নেই:

> 'যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে এবং হিসাব মোতাবেক' ফসল মণ্ডলের ভাগে যেতে থাকে, শেষে গিয়ে বিলের পানির জন্যও ভাগ দাবি করে তারা, 'পানির জন্যে ফের কিছু ধান ধার্য করার কথায় তমিজের গলায় কারবালা ঢুকতে শুরু করে, এক গলা কারবালা নিয়ে সে হাঁস-ফাঁস করে।' কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয় না—মণ্ডল চোখের তুলনায় গলা অনেক নরম করে বলে, 'লেয্য যা পাস তার চায়া তোক অনেক বেশি দিলাম। হিসাব করা দেখিস?' হিসাবের কুল আর তমিজেরা পায় না কিন্তু সে বিভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করে, সুবিধা করতে পারে না। জমির গন্ধ তাকে তাড়া করতে থাকে। (পৃ. ১৪৩-১৪৯)

দূষিত স্রোতে ভেসে যাওয়া

তেভাগার আন্দোলন কিংবা চাষাসহ নিম্নবর্গের মানুষদের সমস্যা-সংগ্রাম এবং সর্বোপরি এদেশে মানুষের মুক্তির আন্দোলন কীভাবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ঢুকে গেল কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মধ্যে হারিয়ে গেল তার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখনো যথেষ্ট হয়নি। এই উপন্যাসে এই বিষয়টিও অনেক ভেতর থেকে উপস্থিত।

তার একটি দিক পাই আমরা মুসলিম লীগের একটি জনসভার বর্ণনায়। জনসভার প্রধান আকর্ষণ জমিদার খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ আলি। ইলিয়াস তাকে, তার ভাষণ এবং প্রজাকুলের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করছেন এভাবে:

'কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মন্ত্রিত্ব ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়ে নিজের উপমন্ত্রিত্ব এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে করা ও না করা ইংরেজ ও এ্যাংলো ইনডিয়ান মেমসাহেবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌন সঙ্গম প্রভৃতি কারণে খাটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। সেই জমিদারের গাড়ির প্রতি জনসভার মনোযোগ অনেক বেশি এবং ভক্তিমিশ্রিত। যে মুসলমান কৃষকদের উপর যে হিন্দু জমিদারের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে এই জমিদার কাঁদো কাঁদো হলো, সেই জমিদারের গোপনে অপেক্ষমান নায়েবের সঙ্গে গিয়ে তারই পুত্রের সাথে দেখা করবার জন্য তাকে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতে হয় এবং দুঃখিত হয়ে খান বাহাদুর সভাস্থল ত্যাগ করার এজাজত চায় দুই হাত জোড় করে। হ্যাজাকের আলোয় ধবধবে ফর্সা হাতজোড়া তার লালচে দেখায় এবং হাতের রঙ ও বিনয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধতা চড়ে যায় চরম পর্যায়ে। করজোড়ে তার মাফ চাওয়ায় অভিভূত কোনো বুড়া শ্রোতা বুকে ঠান্ডা লাগানোর ঝুঁকি নিয়েও গায়ের কাঁথা টেনে নিজেদের ছানি-পড়বো পড়বো চোখের কোণ মোছে।'

জনসভার এক পর্যায়ে গানের ব্যবস্থা হয়। ধরে আনা হয় কেরামতকে। পাকিস্তানের গান তো দূরের কথা তেভাগা ছাড়া আর কোন গানই জানে না বলে তেভাগার শিল্পী কেরামত মুসলিম লীগের সমাবেশে গান গায় তেভাগার—

'যাহার হাতে নাঙল। যাহার হাতে নাঙল, ফলায় ফসল অন্ন নাই
তার পাতে।
জমির পর্চা লইয়া জোতদার থাকে দুধেভাতে।। রক্ত করি পানি
র অ ক্ত করি পানি মাটি ছানি ভাদ্রে রোপাই ধান।
চার মাসের মেন্নতে দেহে নাহি থাকে পরাণ। পৌষে ধান কাটি

পৌষে ধান কাটি, বাটাবাটি করিল জোতদার।
ভাগে পাইলাম আদা ফসল চলে না সংসার। চাষা মেনুতের দাম,
চাষার মেন্নতের দাম খালি আকাম জোতদারেরই কাছে।
দুই মাস গেলে চাষা ঘোরে মহাজনের পাছে।। জোতদার মহাজনে
জো ও তদার মহাজনে মনে মনে উহাদের পিরীত।
চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুজনেরই রীত।।

চাষার দুষমন জমিদার জোতদার অতি লেয্য কথা।। বলি জমিদারি
ব অ লি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই।।
জোতদার পাবে একভাগ ফসল চাষায় দুই ভাগ পাই।। তাই
তেভাগার ডাক
তা ই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষার জয়।।
চাষা বিনা জগত মিছা সর্বজনে কয় ।...' (পৃ. ১৭৯-১৮০)

এই গানকে হজম করে ফেলে লীগ নেতা সহজ সাম্প্রদায়িক মিশেল দেয়া তার বক্তৃতায়: 'হাজেরানে মজলিশ, ভাইসব, জমিদারদের হাত থেকে, মহাজনদের হাত থেকে, জোতদারদের হাত থেকে মুসলমান প্রজাদের বাঁচাবার জন্যেই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আজ পাকিস্তান হাসিলের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কবি কেরামত আলি তার গানের মধ্যে দিয়ে মুসলিম লীগের কথাই বলে গেলো...' (পৃ. ১৮১)। এরপর মুসলিম লীগের পক্ষে যে শ্লোগান উঠে তাতে শরীক হয় কেরামতও। উপন্যাস এগোয়, কেরামত ক্রমে লীগিকৃত হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে না হলেও আস্তে আস্তে সে নতুনভাবে তার গান বাঁধতে চেষ্টা করে—

'ভারতবর্ষে কায়েম করে আজাদ পাকিস্তান।
মোসলমানের সকল দুঃখের হইবে অবসান।' (পৃ. ২৩২)
কিংবা
'বিসমিল্লা বলিয়া আজি বাঁধিনু শোলোক।
খোশখবর দিব আজি শুন সর্বলোক।। আজি দীন গরীবের
আজি দীন গরীবের আঁধার দিনের হইল অবসান।
এই ভারতে কায়েম হবে আজাদ পাকিস্তান।। সেথায় সবাই সমান

সবাই সমান দীনী ফরমান হইবে সেথায় জারি।
প্রজার মঙ্গল তরে উচ্ছেদ হইবে জমিদারি।। জমিদারে প্রজায়।
জোতদার চাষায় একই আসন পান
চাষীমজুর দীনদরিদ্রের মুশকিল আসান।।' (পৃ. ২৫২-২৫৩)

কিন্তু পাকিস্তানের গানে তেভাগার রেশ নেতাদের বিরক্ত করে। নেতা বলে: 'রাখো! তোমরা একটা পয়েন্ট বোঝো না, মোসলমান গরিব ধনীর ভেদাভেদ করলে এখন লাভ হচ্ছে কার? সলভ্যান্ট মুসলমান থাকলে বেনিফিটেড হবে এন্টায়ার মুসলিম নেসন। সলভ্যান্ট লোক না থাকলে ডেভেলপমেন্ট হবে কী করে?' কিংবা, 'তোমার গানে ইসলাম কৈ? ইসলামের মহিমা নিয়া গান লেখো, তেজি গান লেখো মিয়া।' (পৃ. ২৫৩)।

কেরামত আর পারে না, ভেতর থেকে যা আসে তা থেকে ভিন্ন বা ফরমায়েশি গান বেশিদূর আগায় না।

অন্যদিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ভবানী পাঠক ক্রমে হয়ে যায় মা ভবানী। ভবানী পাঠকের গল্প চেরাগ আলী ফকির হয়ে বৈকুণ্ঠের মাধ্যমে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এভাবে উপস্থিত ছিল :

দশনামী প্রভুগণে বন্দিয়া পবিত্র মনে
গিরিসেনা দাঁড়ায় কাতারে।
ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি সনে
গোরা কাটো আদেশে হুঙ্কারে।
ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি সনে
গর্জনে শার্দুলে লজ্জিত।।
ভবানীর কণ্ঠধ্বনি মৃগরাজধ্বনি জিনি।
সেই ডাকে চঞ্চল মানাস নদীর জল
হইল গোরা শোণিতে রঞ্জিত।
কোম্পানির গোরাসবে পাঠাইয়া যমভবে
জলে প্রভু করে আচমন
বন হইতে সঙ্গোপনে গোরাগণ আক্রমণে
প্রভু সেথা ত্যাজিল জীবন।

গিরিগণে নামে জলে যতনে লইল কোলে
কৃষ্ণ কোলে যেন শত রাই।
পাষাণ হৃদয় বান্ধো কান্দো গিরিগণে কান্দো।
ভবানী পাঠক ভবে নাই (পৃ. ৪৬)

সেই ভবানী পাঠককে মা ভবানী বানানোর জন্য এলাকার গণ্যমান্য লোকেরা উঠে পড়ে লাগে। নদী থেকে মাঝিদের মাছ ধরা ঠেকানোর জন্য হিন্দু জমিদার হিন্দু প্রজাদের কাছে নতুন অস্ত্র ছাড়ে। বলে, 'বাঙালি নদীর কোলে মা ভবানীর দ', দয়ের মাছ তো মায়ের সেবার জন্যই... ঐ মাছ চুরি করে বেটা মাঝি, ম্লেচ্ছ মাঝি, এ্যাঁ? মায়ের সন্তান হয়ে আমরা তা সহ্যও করি। আবার তার সঙ্গে তোদের মহা খাতির! ছি!' কিন্তু বৈকুণ্ঠরা এতে সায় দিতে পারে না। সে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু জমিদারের লোকজন মা ভবানীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবেই কেননা তাতে 'মাঝিপাড়ার মানুষদের হটানো যায় এবং যদি মা ভবানীর পূজার প্রচলন করা যায় তো আশেপাশের তো বটেই, টাউনের ভদ্দরলোকদেরও এখানে টানা যাবে।' (পৃ. ২৩৯)।

পরাজয়ের আগেই পরাজিত

কী কারণে যে মাঝি-চাষা মানুষেরা নিজেদের ভেতরে প্রবল ঐক্যকে চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখেও কিছুই করতে পারলো না, কী কারণে তেভাগার শিল্পী দ্রুত ভাড়াটে হিসেবে দাঁড়াতে থাকলো তার ব্যাখ্যা করতে থাকলে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ভূমিকার প্রসঙ্গ আসবেই। এই উপন্যাসে সে বিষয়ে বিস্তারিত নেই কিন্তু ইঙ্গিত আছে। মুসলিম লীগের ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা গ্রামে যায় জিন্না-গান্ধী ঐক্য গড়বার পক্ষে জনমত গঠন করতে। ইসমাইলের আগ্রহের কারণ, তার নিজের এলাকা ঠান্ডা রাখবার জন্যই এটা দরকার। ইসমাইলের জড়ো করা লোকের সামনে পার্টি কর্মী বক্তৃতা দেয়, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়বার পক্ষে জোর কথা বলে এবং স্লোগান তোলে: 'গান্ধি জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।' বক্তৃতা শেষে মুসলিম লীগ নেতা ও এলাকার জোতদার উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শরাফত

মণ্ডলের বাড়িতে : 'ইসমাইল, অজয় দত্ত ও মিনতি এই গরমে খাওয়ার এতো এতো আয়োজন দেখে কাদেরকে মিষ্টি করে বকে, কিন্তু পেট পুরে পোলাও কোর্মা খায়। বড়ো জাতের শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে এভাবে খাওয়াতে পেরে শরাফত গদগদচিত্ত।' (পৃ. ২৬৬)

এলাকার 'নিচুজাতের মানুষেরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় নিজেদের নানা কথা নিয়ে, ঘেঁষতে পারে না।' গভীর ঐক্য যেখানে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি সেখানে কাজ বাদ দিয়ে উল্টা জনগণের ঐক্যকে অসম্ভব করে তোলার জন্য যারা চেষ্টা করছে সেই শাসকদের ঐক্য নিয়ে বামপন্থীদের মহা উৎসাহ আর ব্যস্ততার সেই ধারা এখনো জারি আছে। অবশ্য তখনও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল, খুবই দুর্বল। আলিম মাস্টারের কথাই ধরতে পারি:

> 'এদ্দিন পরে ওরা কয় গান্ধি জিন্নাক একত্তর হবার। দুইজনে আলাদা থ্যাকা যে জুলুমটা চালাচ্ছে, একত্তর হলে দ্যাশের মানুষ একটাকেও বাঁচবার দিবি না। তেভাগার মানুষ হয়া অজয় দত্ত হিন্দু মুসলমান মিল করাবার আর মানুষ পায় না? মাথা পাতে গান্ধি আর জিন্নার কাছে?' (পৃ. ২৭৫)

বর্বর অধ্যায়

ক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়, তার হিংস্র চেহারা তৈরি হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে লড়াই দুর্বল হয়ে পড়ে, লড়াইকারীরা হজম হয়ে যেতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতার যে বর্বর অধ্যায় দেশবিভাগের সময়ে রচিত হয়েছিল তার অলিগলি, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দিক। কলকাতার রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় যা হাতে থাকে তার বিবরণ আমরা এ গ্রামেরই চাকুরে ছেলের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। জানি উদ্বাস্তুদের আহাজারির মধ্যে। একই সঙ্গে আমরা তার টেনে নেয়া দমবন্ধ করা চেহারা দেখতে পাই কাৎলাহার বিলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। 'বন্দে মাতরম' আর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি যে মানুষকে একদিকে কত আতঙ্কিত আর অন্যদিকে কত হিংস্র করতে পারে তা আমরা জানতে পারি হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাট এবং সর্বোপরি সর্বগ্রাসী আতঙ্কের অন্ধকার থেকে। আবদুল আজিজের স্ত্রী, বাবরের মার পাগল হয়ে যাওয়া এরই

একটা ফলাফল। তার নিজের ধর্মীয় পরিচয় গৌণ হয়ে যায়। সে হয়ে ওঠে আর্তনাদ বা প্রতিবাদ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতার আরেক চিত্র দেখি স্তনকাটা নারীর মধ্যে। হিন্দু-মুসলিম সব নারী এখানে একাকার হয়ে যায়। নারী শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে নয় স্বামীর কাছ থেকেও তার উদ্ধার থাকে না।

কিন্তু এর হাত থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী সবাই দেশত্যাগ করতে পারে না। নায়েববাবু কিছিমের লোকেরা ভারত চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সমস্যা অন্য দিকেও—তেভাগার লড়াই তো দুদিকেই। তাদের দুশ্চিন্তা কিছুটা কমে নতুন রাষ্ট্রের 'দৃঢ়' ভূমিকায় : 'লোকটি এবার কথা বলে তার পাশের সঙ্গীকে, এদিকে কিন্তু পুলিশ প্রায় টাইট দিয়ে ফেলেছে। পাঁচবিবি জয়পুর একেবারে ক্লিন। পুলিশের বাড়ি না পড়লে কি আর বুলি কপচে কিছু কাজ হয়? সঙ্গীটি বোধহয় ইনডিয়ার খবর জানে বেশি, সে জানায়, আমাদের ওদিকেও পুলিশ মার দিতে শুরু করেছে। তবে এদিককার লিডাররাও তো সব ওপারে গেছে, তাই একটু টাইম নিচ্ছে, ঠিক হয়ে যাবে।' (পৃ. ৩৭১)

নায়েব কিছিমের লোকেরা দেশ ছাড়ার উপায় করতে পারলেও বৈকুণ্ঠরা দেশ ছাড়তে রাজি হয় না, ছেড়ে তারা যাবেই বা কোথায়? তাছাড়া এই মাটিতে তারা নিজেদের অধিকার অনেক গভীর পর্যন্ত অনুভব করে, তাদের লড়াই তো আজকের নয়, বহুদিনের—প্রজন্ম পরম্পরায়, তার যুক্তিও খুব সহজ:

> 'হামাক হুশিয়ার থাকা লাগবি। কিসক রে? এই যে গিরিরডাঙা আর নিজগিরিডাঙা, এই যে গোলাবাড়ি—ইগলান জায়গাত ওই সময় কোম্পানীর পাছাত ডাং মারিছিলো কেটা? ক তো কেটা? ভবানী সন্ন্যাসীর সাথে আসিছিলো হামার ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাপ, না-কি তার ঠাকুরদাই হবি।' (পৃ. ৩৭০)

কিন্তু সাহাদের জমি বাড়ি দখল হয়ে যায়, সাহার যে দোকানে বৈকুণ্ঠ কাজ করে সেই দোকান দখল নিয়ে শুরু হয় মণ্ডল-কালামের ঠান্ডা-গরম লড়াই।

ভাষা

ইলিয়াস পুরো উপন্যাসে মানুষদের আপাদমস্তক তুলে এনেছেন বলে তাকে ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে, ভাষার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, ভাষার রাজনীতি বা ভাষার মধ্যেকার 'ভদ্রলোক' আধিপত্য ভাঙতে হয়েছে। এ কাজটি শুধু যে 'আঞ্চলিক' ভাষার সার্থক ব্যবহার করেই সম্ভব হয়েছে তা নয়, তার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন বিপুল শক্তিকে আবিষ্কারের কাজটিও তিনি সম্পাদন করেছেন গভীর দক্ষতা ও মমতার সঙ্গে।

বৈকুণ্ঠর ভেতর একই গানের ভাষা বদলে যাওয়ার মধ্যে তার একটি ছোট্ট নমুনা দেখি। ভবানী পাঠক চেরাগ আলী ফকিরের গানের ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে ভদ্রলোকী ভাষায় দাঁড়াতে পারে না, অবশেষে তাকে তার নিজস্ব 'অপবর্গী' ভাষার উপরই ভর করতে হয়। বৈকুণ্ঠ প্রথম যেন শোনে—

'সুখনিদ্রাপরিত্যাজে জাগো মৃগরাজতেজে
মীন জাগে তবু জাগে জাগো গিরিগণ।
তোমরা সুপ্ত শয্যাপরি গৃহে প্রবেশিল অরি
বান্ধিল শৃঙ্খলে তোমরা নিদ্রাতে মগন।
ভবানী হুঙ্কারে জাগে জাগো গিরিগণ।।'

এর পরের অংশ রূপান্তরিত হয়ে যায়, যার কথা 'রোদে পোড়া', 'বৃষ্টিতে ভেজা'। চেরাগ আলির গলা ভারী, কিন্তু নদীর পানিতে, পানির বাতাসে আর বাতাসের হিমে ও তাপে সেই স্বরে ভাঙনের চিহ্ন, চিড় খাওয়ার দাগ। কঠিন কঠিন শব্দে অলঙ্কৃত গানের নীচে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকে ফকিরের গানের শব্দাবলি এভাবে—

'জাগো কাতারে কাতারে গিরিরডাঙা কাৎলাহারে
জোট বান্দো দেখো টেকে কয়টা দুষমন।
জোট বান্দো ভাঙো হাতের শিকল ঝন ঝন।
শিকল মিলায় রৌদ্রে শিশির যেমন।।'

স্বপ্নভঙ্গ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যথারীতি তেভাগা বাস্তবায়নের কিংবা সকল সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিগুলো ভেঙে যেতে থাকে। একমাত্র যা থাকে তা হলো নতুন মুসলিম ধনিক ও ক্ষমতাবান শ্রেণির সংহত হবার ধুন্ধুমার নৃশংস প্রতিযোগিতা। প্রতিশ্রুতির কথা সবাই ভুলে যায় না, বা নতুন অবস্থা মেনেও নেয় না;

> 'তমিজটা একেবারেই নাছোড়বান্দা, 'আপনেরা না কছিলেন জমির উপরে বর্গাদারের হক কায়েম করার আইন জারি হবি? ফুলজানের বাপেক আপনের বাপজান জমি থ্যাকা উঠায় ক্যাংকা কর্‌যা?' আবদুল কাদের রাগ করলেও হেসে ফেলে, 'তোর বাপু এতো কথাও মনে থাকে? তোক এমএলএ করা লাগে।' কাদের হো হো করেই হাসে। হাসিটা তার এখনো ইসমাইল বা ইয়াকুব বা এদের বাপের মতো এতটা উচ্চকণ্ঠ না হলেও বেশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সেই 'খানদানির হাসির চর্চা করতে করতেই জানায়'—যে, দুবছর আগে উঠা জমিদারি বাতিল বিল থেকে বর্গাদারের অধিকারের ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। তেভাগার কথা এখন অবান্তর কেননা 'উগলান দিন শ্যাষ'। তমিজের স্মৃতিতে এখনো তেভাগার লড়াই জ্বলজ্বল করে, 'জয়পুরেত যখন ধান কাটিচ্ছিলাম তখনি তো জোতদাররা সব দৌড়াচ্ছিল পাছার কাপড় তুল্যা (৩, ৩৩৬)

তমিজেরা বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতে সময় লাগে যে, সেই জোতদাররা এখন সেই পাছার কাপড় নামিয়ে গাঁট হয়ে বসেছে।

তমিজ একইসঙ্গে জেলে এবং চাষা। জমির মধ্যে উত্তরোত্তর যে নিজের সৃজনশীলতাকে আবিষ্কার করে। জমির গন্ধ স্বভাব আয়ত্ত করেও যে নিজেকে জমির সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারে না। মণ্ডল, কালাম মাঝি, কাদেরসহ পুরনো ও নতুন ক্ষমতার দাপটে তাকে শহরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। ক্রমে তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় চাকর। তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে আরও ভাল জায়গায় চাকর বানানোর ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে তার সৃষ্টিশীল সম্পর্ক এবং সে নিয়ে তমিজের যাবতীয় স্বপ্ন পুরোপুরি ধ্বসে যেতে থাকে।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের ধারাবাহিকতা

সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে সম্পত্তি দখলের উন্মত্ত আক্রমণে নিহত হয় বৈকুণ্ঠ। বিস্ময় আর বেদনা নিয়ে মারা যেতে যেতে বৈকুণ্ঠ মুনসীর গানের মধ্যে ডুবে যায় যেখানে মানুষের সম্মিলিত লড়াই আর স্বপ্নের কথা; ব্রিটিশবিরোধী লড়াই থেকে যা প্রবাহিত হয়ে এখনো থামেনি, চলমান নানারূপে। ব্রিটিশদের হাতে গুলিবিদ্ধ মুনসী নিজ দেশিদের হাতে নিহত বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর মধ্যেও উপস্থিত থাকে।

তমিজের বাপ জীবিত থাকাকালেই একটা রহস্যের আবরণ তৈরি হয়েছিল, তার চারপাশে। মৃত্যুর পর সে ক্রমেই আরও শক্তি অর্জন করতে থাকে। কোথাও ফকিরের খোয়াবনামার হদিস পাওয়া যায় না, আঁকি-বুকি কাটা সে বই হারিয়ে গিয়ে আরও বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আরও অনেক গাছের সঙ্গে পাকুড় গাছও কাটা পড়ে উন্নয়নের ধাক্কায়, গ্রামে ইটের ভাটা হয়, প্রকৃতি বদলে যায়, কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গ্রাম। পাকুড় গাছের হত্যাকাণ্ড তমিজের বাপকে তাড়িত করতে থাকে, তার কাছে এর থেকে বড় 'সর্বনাশ' আর কিছু হতে পারে না। সেই পাকুড় গাছ খুঁজতে গিয়েই তমিজের বাপ 'চোরাবালিতে' পড়ে 'মারা' যায়। পাকুড় গাছে অবস্থান নেয়া গুলিবিদ্ধ মুনসীর সঙ্গে চেরাগ আলী ফকির আগেই যোগ দিয়েছে, এখন সেই সারিতে দাঁড়ায় তমিজের বাপ। আর তমিজ জীবিত রূপেই সেই সারিতে যোগ দেয়ার জন্য পালায়, পালায় চিরস্থায়ী চাকর হবার ভাগ্যকে অস্বীকার করবার তাগিদ থেকে। পালায় অনেক দমনপীড়নের পরও তেভাগার যে সাড়াশব্দ এখনো রাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে।

তমিজের বাপের সন্তান তমিজ, বাবার চাইতে তার বোঝা অনেক স্পষ্ট, তার সীমাও অনেকদূর বিস্তৃত, অবশ্য কতদূর আমরা তা জানি না। অন্যদিকে তারই সন্তান সখিনা মা-র হাত ধরে কাৎলাহার বিলের ধারে, দীঘির পাড়ে, জমির উপর মুনসী, ফকির আর তমিজ ও তমিজের বাপের অস্তিত্বের স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। সেও যেন খোয়াব দেখতে

থাকে তার দাদার মতো, কিন্তু তার খোয়াবও তার আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙেচুরেই দাঁড়াতে থাকে সে জন্য তা পুরোপুরি তার দাদার মতো হয় না। দাদার পায়ের নিচে ছিল বিল-কাদা, সেখানে পা বসে যেতো; সখিনার পায়ের নীচে শক্ত জমিন-সামনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত, বিশাল আকাশ। তমিজের বাপের ঘোরের খোয়াব দিয়ে উপন্যাসের শুরু, তমিজের মেয়ের জাগ্রত খোয়াব দিয়ে উপন্যাসের শেষ। কিন্তু দুইয়ের মধ্যেই মানুষ থেকে মানুষের প্রবাহ। শক্তি ও দুর্বলতার, স্বপ্নের-লড়াইয়ের-ভালোবাসার।

মানুষের সময়, সময়ের মানুষ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে কেউ নায়ক নয়, কেউ খলনায়ক নয়। তার চরিত্ররা মানুষ, যারা সময়ের সৃষ্টি ও সময়ের স্রষ্টা। এখানে ইচ্ছাপূরণের কোন জায়গা নেই, নেই আরোপনের কোন সুযোগ। এবং এটা সম্ভব হয়েছে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সামাজিক গতিশীলতার প্রতি বস্তুনিষ্ঠ থাকা, এবং প্রবল দায়িত্ববোধকে উঁচু শিল্পমানে রূপান্তরের ক্ষমতার কারণে।

বিশাল জনগোষ্ঠী যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, তাকে সামনে রেখে এবং তার প্রেক্ষাপটে একটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষের ভেতরে ও বাইরে বিপুল ভাঙা-গড়া, তাদের অন্তর্জগত এবং চেতনার রঙ, তাদের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, ব্যক্তি ও সমষ্টির জগতের মধ্যেকার সূক্ষ্ম যোগসূত্র, বাস্তব ও ফ্যান্টাসির মধ্যেকার জৈব সম্পর্ক, জীবিতের মধ্যে মৃতের প্রবাহ কিংবা মৃত যে অনেক মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ করতে পারে তার জীবন্ত হয়ে উঠা, প্রবল দায়িত্ববোধকে উঁচুমাপের শিল্পবোধে রূপান্তরিত করা, প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য যাত্রা, বাস্তব অবাস্তবের অসাধারণ মিশেল, ভালোবাসা-ব্যঙ্গ-প্রতিবাদের এরকম অপূর্ব সমন্বয়, মাটির সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য উৎপাদক মানুষের একেবারে নিজস্ব ভাষা—গদ্যপদ্যে প্রকাশের এরকম মুন্সীয়ানা, এসব কিছু মিলিয়ে খোয়াবনামা যে একটি বিশাল নির্মাণ তার কোনো তুলনা বাংলা সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই।

সাহিত্য শুধু নয়, সমাজ-অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রেও যে ছিচকাঁদুনে, তরল, দায়িত্বহীন, অগভীর, খণ্ডিত চিন্তার যুগে আমরা বসবাস করছি সেসময় এই শিল্পকর্ম যে টানটান, গভীর, পরিশ্রমী, দায়িত্বশীল নির্মাণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে, তা চোরাবালির মধ্যে থেকে আমাদের অনেক উপরে তাকানোর সুযোগ ও ক্ষমতা দান করবে।

ডিসেম্বর ১৯৯৬

ইলিয়াসের উদ্বেগ ইলিয়াসের মানুষ

জাগো কাতারে কাতারে গিরিরডাঙা কাৎলাহারে
জোট বান্দো দেখো টেকে কয়টা দুষমন
জোট বান্দো ভাঙো হাতের শিকল ঝনঝন
শিকল মেলায় রৌদ্রে শিশির যেমন।

—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

বগুড়ায় বাসটা ঢোকামাত্রই এরকম যেন একটা অনুভূতি হলো যে, দেখা হতে যাচ্ছে ইলিয়াস ভাই উপস্থিত অনুপস্থিত বলেই উপস্থিতির নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। তার শরীর শেষ আশ্রয় এখানেই নিয়েছে। কবরের পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমরা কথা বলছি। ইলিয়াস যথারীতি বলছেন, 'আরে কি খবর? এসো, এসো, এসো। এই জায়গাটা দারুণ-বুঝলে? তোমাদের নিয়ে তো আবার মুশকিল, ঠিকমতো মাটি চেনো না। এখানে কয়েক স্তরের মাটি আছে। রঙের কারুকাজ দেখো। কীভাবে এক রঙ থেকে আরেক রঙ তৈরি হচ্ছে। ...দারুণ। এগুলো মাটির উপর থেকে বোঝা যাবে না। এই যে জায়গাটা এখানে দেখো—গুড়ি গুড়ি একধরনের উদ্ভিদ, পিপড়াগুলো দেখো। ওদের সারাদিন এত ব্যস্ত কাটে। শিয়াল আছে কয়েক রকম, তোমার খেয়াল করতে হবে। ...একটা পুঁথিতে দেখেছিলাম...। এই যে নিচের মাটির সঙ্গে লাগানো আরেকটা মাটির আভাস দেখছ এর সঙ্গে পুণ্ড্রনগরীর—খ্রিষ্টপূর্ব কালের... তারপর কৈবর্তরা যখন বিদ্রোহ করল...। এখানে আরও অনেকেরই যাতায়াত আছে। শিয়ালকে দেখা তো বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার—হা হা হা...।'

দুই

যেন ইলিয়াসের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে থাকলাম, যেসব জায়গায় ইলিয়াস দিনরাত ঘুরেছেন। যেখানকার ধুলো তাঁর পায়ের সঙ্গে মিশে ক্যান্সার নিয়ে মহাজগতের মহা ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর হাটাচলা, নোট নেয়া, পাইপ টানা, কথা, হাসি, ক্রোধ সব কিছুই আমার সঙ্গে ঘুরতে থাকে। বগুড়া শহরের বর্তমানে বসে ইলিয়াস দেখতে শুরু করেছিলেন হাজার বছরের আগের মানুষ ও সমাজ। তন্ন তন্ন করে দেখেছেন ৫০ বছর আগের সময়। দেখেছেন দোকান, ভাষা, মানুষ, গাড়ি, গালি, জিনিসের দাম, রাস্তা এবং বিশাল কাৎলাহার বিল।

সেই বিলে যাবার জন্য এখন বগুড়া থেকে বাস নামের কিছু বাহনে উঠতে হয়। ছয় থেকে সাত মাইল। প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। গোলাবাড়ি বাজারে গিয়ে নামতে হয়। এখন জমজমাট এই বাজারটিই খোয়াবনামার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কোক, ক্যাসেটে জমজমাট এখন এই বাজার। এখানে ১০০ বছরের পুরনো একটি বাড়ির সামনে বিরাট তোরণ মার্কা একটা গেট আছে। নাম লেখা প্রামাণিক। ঐ বাড়িরই মানুষ সাত্তার, কদিন আগে মারা গেছেন, ছিলেন ইলিয়াসের নিত্যসঙ্গী। তার জামাই আনসার, বগুড়া শহরে থাকেন, আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। আনসারদের পরিবারের যে সমষ্টিগত বিশ্বাস তাদের জীবন-যাপনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা হলো—তাদের এক পুত্র সন্তানের সঙ্গে জ্বিন থাকে। এই আনসারও ইলিয়াসের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছিলেন।

খোয়াবনামার সেই ভরাট কাৎলাহার বিল এখন শুকিয়ে গেছে। মাঝিপাড়াও চলে গেছে দূরে। মাছ মারার বৃথাই চেষ্টা করছিলেন আট-দশজন মানুষ, বিভিন্ন বয়সের। মাছ নেই। উন্নয়নের ধাক্কায়, সার-কীটনাশক ওষুধের আক্রমণে মাছ পালিয়েছে। তবু এই চেষ্টা ছাড়া উপায়ও নেই। অন্য কাজও নেই। ইটের ভাটা দিয়ে যে উন্নয়ন শুরু হয়েছিল তা এখন আরও পুষ্ট হয়েছে। মাছ মারার চেষ্টায় ক্লান্ত মানুষেরা জিজ্ঞেস করলেন একজন কাঁচাপাকা চুলের মানুষের কথা, আমরা চিনি কিনা। অনেকদিন তাঁর দেখা নেই। এখানেই তাঁর সঙ্গে এঁদের অনেক কথা হয়েছে। কাৎলাহার বিলের

শুরুতেই পোড়াদহ মেলার জায়গা। এখনো মেলা হয়। মণ্ডলদের বাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। এখন এলাকার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ব্যবসায়ী, শহরেই থাকেন।

দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো শহর পুণ্ড্রনগরী নিয়ে ইলিয়াস নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই নেশা তৈরি হয়েছিল ইতিহাসের উপর শুধু ধুলোমাটি নয়, কাদা আর পাথরের আস্তরণ সরানোর তাগিদ থেকে। যত তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন, ততই অতীত বোঝার জন্য তার তাগিদ বেড়েছে। পুণ্ড্রনগরীর যথার্থ অনুসন্ধান ছাড়া এই অঞ্চলের ইতিহাস, মানুষকে বোঝা যাবে কীভাবে? মহাস্থানগড়ে যতবার গেছেন ততবারই তিনি উত্তেজিত হয়ে ফিরেছেন। একবার বললেন, একটা বিশাল কালো পাথর যার উপর বিভিন্ন লেখা এখনো উদ্ধার করবার মতো অবস্থায় আছে সেটা দুভাগ করে পুকুরের দুপাশে কাপড় কাচা হচ্ছে। লেখাগুলো ক্রমেই মুছে যাচ্ছে। কী অমূল্য চিহ্ন যে চিরদিনের জন্য মুছে যাচ্ছে তা আমরা জানি না। ওখানে আছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। তাদের সামনেই এগুলো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মসজিদ সম্প্রসারণের নামে কন্ট্রাক্টর কাজ বাগাচ্ছে। ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কয়েক পরতের নিদর্শন। দেখলামও মাইলের পর মাইল, স্বর্ণখনির মতো বললে ভুল হবে, কেননা এগুলো অর্থ দিয়ে পাওয়া যাবে না। অমূল্য। ইতিহাস অনুসন্ধানের ইট নিয়ে তৈরি হচ্ছে বর্তমান বাড়ি ঘর।

তিন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য-প্রেমিকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আগে একধরনের ন্যাকা বামপন্থী ছিল যারা সুর করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করত যে, গরিবরাও মানুষ। এখন সেই ন্যাকারা যুক্তিসঙ্গত কারণেই সমাজতন্ত্রের উপর আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা বা তাদের উত্তরসূরীরা এখন ডলারের সমাবেশ পকেটে রেখে দারিদ্র্যের প্রেমে গদগদ, এই প্রেমই তাদের জমজমাট ব্যবসা। তারা সবাইকে বোঝায় গরিবরাও মানুষ, গরিবরা খুব ভালো, তারাও খুব কাজ করতে পরে, তারা টাকা নিয়ে সে টাকা

আবার ফেরতও দেয়, তারা অনেক গদ্য-পদ্যও জানে, তাদের মেয়েরাও কথা বলে দারুণ। তাদের এসব কথা শুনে শুনে মধ্যবিত্ত মাথা ঝাঁকায়, গবেষক-পণ্ডিতরা ফুটনোট লেখেন। ইলিয়াস এদের এই ন্যাকামী দেখে, ভণ্ডামি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। বলতেন, শুয়োরের বাচ্চারা 'ওরা মানুষ' এটা তোরা সার্টিফিকেট দিচ্ছিস, কিন্তু তোদের মানুষ বলে কে? তিনি বলতেন, গরিবি কেন মহৎ ব্যাপার হতে যাবে? গরিবি কেন মানুষকে বেশি দক্ষ করবে? তাহলে তো এগুলো রেখেই দিতে হয়!

তাঁর কাছে সকল মানুষই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, অঞ্চল সর্বোপরি শ্রেণি নির্বিশেষে মানুষকে গুরুত্বদান মুখস্ত বুলি দিয়ে আসে না। হাজার বছরের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আসে তাতে মানুষের প্রতি গুরুত্বদান পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়। করুণা আর সম্মান এক কথা নয়। অচেতনভাবেই শ্রেণিবোধ, জাতিবোধ, পুরুষতন্ত্র দখল করে রাখে এমনকি প্রগতিশীলতার দাবিদারকেও। নিজের খুব ভেতরে যদি ক্রমাগত সমালোচনা ও পর্যালোচনার ধারা অব্যাহত না থাকে, তাহলে নানারকম বৈষম্যের বোধ ও তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়। ইলিয়াসের মধ্যে এর অব্যাহত প্রবাহ তাকে বরাবর অগ্রসর করে রেখেছে। তার কাছে মানুষই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সৃজনশীল ও শ্রমজীবী মানুষেরা একটু বেশি।

মানুষকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে না পারলে, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের অক্ষমতা থাকলে কিংবা মানুষকে তার ধারাবাহিকতা, সামাজিক অবস্থান ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন করে দেখলে তাকে হয় ফেরেশতা নয় শয়তান বলে মনে হবে। এবং মানুষকে এভাবে দেখে যেমন শিল্পসৃষ্টি হয় না তেমনি সমাজ বিশ্লেষণ ও তার পরিবর্তনের কাজও হয় না। সমাজ ফেরেশতা বা শয়তান দিয়ে গঠিত হয় না। গঠিত হয় মানুষ দিয়েই। যে মানুষ সমাজ পরিবর্তন করবে সেও নানা দুর্বলতা-সবলতা নিয়েই মানুষ। তাকে মহিমান্বিত বা কালিমালিপ্ত করা নয়, ঠিকভাবে শনাক্ত করাটাই দরকার। দরকার শিল্পের জন্য, দরকার এই বর্বরতা থেকে বেরুনোর জন্য।

ইলিয়াসের কাছে এই কাজগুলোর মধ্যে কোনো বিভেদ ছিল না বরঞ্চ তা ছিল একই বিষয়ের খুবই ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক। একবার বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'নির্বাচনের জন্য পোস্টারই যথেষ্ট, কিন্তু বিপ্লব পোস্টার দিয়ে হয় না, তার জন্য দরকার হয় সাহিত্য।' এই সাহিত্য বিপ্লবকে রাস্তা দেখায়, অন্যদিকে বিপ্লব সাহিত্যকে মুক্ত করে বহুরকম প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ শৃঙ্খল থেকে। এখান থেকেই '৯০ সালে লেখক শিবিরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের মূল স্লোগান তিনিই ঠিক করেছিলেন : 'শিল্প সাহিত্য বিপ্লবকে দিক ভাষা, বিপ্লব শিল্প সাহিত্যকে দেবে মুক্তি' যা এখন সংগঠনের মূল নির্দেশিকায় পরিণত হয়েছে। আর এই বোধ থেকেই তিনি প্রায়শই বলতেন, লেখক শিবিরের মতো সংগঠনের খুব দরকার।

মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার অক্ষমতায় তাকে শয়তান বা ফেরেশতা হিসেবে দেখাটা শুধু আমাদের সাহিত্য জগতের বৈশিষ্ট্য নয় এমনকি বিপ্লবী রাজনীতি জগতেরও রোগ। ইলিয়াস বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপ্লবী আন্দোলনকে অপরিহার্য করে তোলার ভিত্তি নির্মাণে নিজের দায়িত্বকে সবসময়ই যেন ঝালাই করতেন। আবার একই সঙ্গে তিনি এদেশের বামপন্থী আন্দোলনের একজন কড়া সমালোচকও ছিলেন। এর মধ্যেকার দুর্বলতা, এর মধ্যেকার ভদ্রলোকী ন্যাকা কিংবা অথর্ব অগভীর যান্ত্রিকতা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা ছিল ক্ষুরধার।

চার

১৯৮৪ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লেখক শিবিরের সদস্য হন। সে বছরই সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৮৬ সালে হাসান আজিজুল হক সভাপতি হন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস হন সহ-সভাপতি। হাসান রাজশাহী থাকেন বলে সভাপতির অনেক দায়িত্ব ইলিয়াসের উপরই এসে পড়ে। ১৯৮৬ থেকে ইলিয়াস ক্রমান্বয়ে সংগঠনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েন এবং হয়ে দাঁড়ান সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল তাঁর একটি প্রিয় স্থান। ইলিয়াসের আড্ডা ও কাজ, সিরিয়াস ও হালকা কথা, কাজ ও অবসরের মধ্যে কোন ফারাক ছিল

না। তিনি সবসময়ই ছিলেন সিরিয়াসলি ফালতু কথা বলার বিরুদ্ধে যা আমাদের সমাজের পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা সচরাচর করে থাকেন। তিনি বরঞ্চ হালকাভাবে সিরিয়াস কথা বলারই পক্ষপাতি ছিলেন। সেজন্য লেখক শিবিরের আড্ডা আর মিটিং-এর মধ্যে তফাৎ করা যেত না। আমরা আনন্দ পেতাম, সমৃদ্ধ হতাম। গল্প হতো, সিদ্ধান্তও হতো। পথ অনুসন্ধান ও মস্তিষ্ককে সচল করা, আত্মসমালোচনা ও ইতিহাস পর্যালোচনা সবই হতো।

তিনি প্রায়শই নিজেদের দক্ষতা ও কাজের গতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। কিন্তু যতটুকু কাজ হয়েছে তারও গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তারও কোনো প্রচার ছিল না। বাংলাদেশের জাতীয় প্রচার মাধ্যম কূপমণ্ডুক, তরল, কপটদেরই আশ্রয়। সেখানে জায়গা না পাবারই কথা। ইলিয়াস ক্রুদ্ধ হতেন, অবাক হতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ভিন্ন নয়। যে দুটি উপন্যাস ইলিয়াসকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী জায়গা করে দিয়েছে, যে উপন্যাস দুটি দিয়ে ইলিয়াস বাংলা উপন্যাস শুধু নয়, চিন্তার গঠনকেও বড় ঝাঁকি দিয়েছেন সে দুটো উপন্যাসই প্রথমে শীর্ষস্থানীয় দুটো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয়েছিল। ঘটনা ঘটেছিল একইরকম। মাঝপথে দুটোরই ছাপা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লেখক শিবিরের অনেক বিবৃতি কিংবা অনুষ্ঠানের খবরই সংবাদপত্রে জায়গা পায়নি। প্রকাশ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রয়োজনীয় বক্তব্য। সেজন্য তৃণমূল প্রকাশকে তিনি খুবই প্রয়োজনীয় একটি কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

সংগঠনের কাজে, বিভিন্ন আলোচনা সভা, সম্মেলনে আমাদের একসঙ্গে বহু জায়গায় যেতে হয়েছে। মনে পড়ছে চট্টগ্রাম, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, হাতিয়া, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী ঘোরার কথা। তার সঙ্গে প্রতিটি সফরই যেন ছিল একেকটি বিশাল সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা। সফরে গিয়ে বক্তৃতা দান হয়ে দাঁড়াতো গৌণ ব্যাপার। মানুষ, স্থান নিয়ে গল্প, অনুসন্ধান। ডায়েরিতে নোট রাখা, শোক-প্রবাদ-মিথ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা, স্থানীয় শব্দভাণ্ডার খেয়াল করা, খাদ্যাভ্যাস, মানুষের সংগ্রাম এবং তার ইতিহাস। যারাই একসঙ্গে হতাম তারাই যেন বদলে বদলে যেতাম—নতুন সংগ্রহ ও উপলব্ধির আনন্দের যোগান আসতো।

১৯৮০-এর দশকের শেষভাগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কয়েকটি বছর একসঙ্গে অনেক কাজ ও পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। '৮০-এর দশকের শেষে নিয়মিত লেখক-পাঠক সমাবেশের পরিকল্পনা করে সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। মঞ্জু সরকার তখন ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তাঁর ওখানে আমাদের বহু বসা হয়েছে। ঘোষণাও তৈরি হয়েছিল। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র মিলনায়তনে তিনদিনের 'শিল্প সাহিত্য ও মতাদর্শ' শিরোনামে অনেকগুলো আলোচনা হয়েছিল। এটা সংগঠিত করা, এর কাঠামো দাঁড় করানোতেও ইলিয়াসের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এখানেই ইলিয়াস পড়েছিলেন তাঁর 'উপন্যাস ও সমাজ বাস্তবতা' প্রবন্ধটি।

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ এবং তাকে আদর-যত্নে পুষ্ট করবার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করা এবং সামাজিকক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবার ব্যাপারে লেখক শিবির অনেক কর্মসূচি নিয়েছিল। অনেক রাজনৈতিক দল এবং তাদের অনুরক্ত বুদ্ধিজীবীই এ কারণে আমাদের উপর বিরক্ত ছিলেন। কেননা বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের মূল সংগঠন জামায়াতে ইসলামীকে নিয়েই তখন এসব দল এরশাদবিরোধী আন্দোলন করছিলো। ইলিয়াস লেখক শিবিরের এসব কর্মসূচিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, পাশাপাশি তিনি মাদ্রাসা ছাত্রশিক্ষকদের পাইকারি গালি দেয়ার, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মধ্যবিত্তীয় প্রবণতারও বিরোধী ছিলেন। তাঁর 'কান্না' এবং '*জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল*' গল্পে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিরই খবর পাওয়া যায়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা দফতরে কাজের সূত্রে ও নিজের আগ্রহেই এদের বোঝার চেষ্টা করতেন। জোর দিয়ে বলতেন মাদ্রাসার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র ও শিক্ষকেরা বাস্তবে নিজেরাই শিকার। এরা হলো নাটবল্টু। এদের তৈরি করার পেছনে আছে শাসক শ্রেণি-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা যারা নিজেরা মাদ্রাসায় পড়েনি, সন্তানদের মাদ্রাসায় তো দূরের কথা দেশেই পড়ায় না। এদের তৈরি করবার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও সক্রিয়।

'৮০-এর দশকের শেষদিক থেকে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিলেবাস। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে পাঠক্রম নির্ধারণ

ও পাঠ্যপুস্তক তৈরির প্রক্রিয়াটি সাধারণত সকলের দৃষ্টি বা মনোযোগের আড়ালেই থাকে। বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন হয় আর অতি সন্তর্পণে মানুষের সর্বনাশ করতে থাকে গণশত্রুরা, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পিত নানা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। ইলিয়াস ক্রমাগত এ ব্যাপারে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। ছাত্র সংগঠন, বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কাজের ধরন নিয়ে তার বরাবরই আপত্তি ছিল। তিনি মৌলবাদবিরোধী অনির্দিষ্ট কিছু মিছিল বা হুংকারের চাইতে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কাজ মনে করতেন শিক্ষা নিয়ে, সিলেবাস নিয়ে এদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায়।

সিলেবাস তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তার সবচাইতে উদ্বেগের বিষয় ছিল যে, জামাতীমার্কা লোকেরা বিএনপি বা বিভিন্ন ইসলামী নামের আড়ালে তাদের মতাদর্শিক ও সংকীর্ণ কাজগুলো করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সবসময়ই সক্রিয় থাকে। কিন্তু এসব জায়গায় বসে থাকা অনেক 'প্রগতিশীল' ব্যক্তি নিজেদের পদ রাখার জন্য বা কিছু পয়সা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবার জন্য এ সবের কোন প্রতিবাদই করেন না। তিনি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েই বলতেন কীভাবে সরকারি উদ্যোগে, ইউনিসেফের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রগতিশীল নামে পরিচিত শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বিজ্ঞানমনস্ক, ইতিহাসমনস্ক শিক্ষার পথে নানা সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালে 'বাংলাদেশের শিক্ষা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শিরোনামে লেখক শিবির থেকে তিনদিনের ৯টি অধিবেশনে যে জাতীয় সেমিনার হয় সেখানে এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কোন 'প্রগতিশীল' দৈনিকেই-এর খবর বের হয়নি। অন্যদিকে *ইনকিলাব*, *সংগ্রাম* জাতীয় পত্রিকাগুলো উস্কানি দেবার জন্য বিকৃত করে বিভিন্ন সময়ই নানাকিছু ছেপেছে।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন হলো। সে সময় ইলিয়াস ছিলেন সঙ্গীত কলেজে। সম্মেলন প্রস্তুতির যাবতীয় কাজ ওখানেই হতো। বিষয়বস্তু, লেখক, আলোচক, বিজ্ঞাপন, অর্থ সংগ্রহ, চিঠি লেখা, স্যুভেনির পোস্টার, স্লোগান সবকিছু নিয়ে কাজ ও আলোচনার মূল

জায়গা ছিল ইলিয়াসের বাড়ী ও অফিসে ঘর। তাঁর আগ্রহেই আমরা সমর মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি পোস্টার তৈরি করে দেন। ইলিয়াস, আমাদের অনেক অলোচনা বিতর্কের পর, নিজেই সম্মেলনের মূল স্লোগান ঠিক করেছিলেন, 'সৃজনশীলতায় মুক্তির অঙ্গীকার'। তিনিই লিখেছিলেন সাহিত্য সম্মেলনের ঘোষণা।

১৯৯০-এর অক্টোবরে হল জাতীয় সম্মেলন। চট্টগ্রামে যে সময় এই সম্মেলন হচ্ছিল তার পরপরই সূত্রপাত হলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্বের। ঐ সম্মেলনে লেখক-শিল্পীদের রাজনৈতিক ভূমিকা, তাঁদের সংগঠনের রাজনৈতিক ভূমিকার ধরন ইত্যাদি নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। আসহাবউদ্দীন আহমদ ছিলেন সম্মেলনের প্রধান সংগঠক। তাঁর সম্পর্কে ইলিয়াস বলতেন, 'আসহাব ভাই-এর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি শেক্সপিয়রকে লোককবি বানিয়েছেন'। সম্মেলনে ইলিয়াস এবং হাসান ছিলেন প্রধান বক্তা। হাসান আজিজুল হক লিখেছিলেন জাতীয় সম্মেলনের ঘোষণা। এরশাদের পতনের পর লেখক-শিল্পীদের নিয়ে একাধিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। অনেকগুলো সমাবেশ, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির পর যে বক্তব্য ও দাবিনামা তৈরি হলো সেটা প্রধানত ইলিয়াসেরই তৈরি করা।

১৯৯২ সালে দেশে যুদ্ধাপরাধী বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। নির্মূল কমিটির প্রাথমিক গঠনে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন লেখক শিবিরের বর্তমানের বা অতীতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ইলিয়াস সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করতেন, এটা ভুলে যাবার সৎ সাহস ছিল বলে এসব ক্ষেত্রে অংশ নিতে তার কোনো পিছুটান ছিল না। এই আন্দোলনে কোণঠাসা হয়ে যাওয়া জামায়াত আত্মরক্ষার সুযোগ পেল বিজেপির কাজে। বাবরি মসজিদ ভেঙে তারা অস্ত্র তুলে দিল জামায়াতের হাতে। জামায়াতিরা আক্রমণ করল নির্মূল কমিটি ও বিভিন্ন বামদলের অফিস। সারাদেশে সৃষ্টি করল ফ্যাসিবাদী উন্মাদনা।

তসলিমা নাসরিনের একটি লেখা কে কেন্দ্র করে লেখক-শিল্পীদের বিরুদ্ধে মুরতাদ আখ্যা দেয়া এবং বিভিন্ন লেখক-বিজ্ঞানী শিল্পীদের ফাঁসি দাবি, ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের দাবিতে মাঠ গরম করা এই হয়ে দাঁড়াল

তখনকার প্রধান দৃশ্য। জামায়াতীদের নেতৃত্বে মুরতাদ নাম নিয়ে যাবতীয় বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উপর ক্রমাগত বিষোদগার, হামলা এবং মুক্তবুদ্ধিচর্চার বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ব্লাসফেমি আইন পাশ করার পরিবেশ তৈরির আয়োজন চলছিল তখন। দম আটকানো এই অবস্থার মধ্যে লেখক শিবির থেকেই বড় আকারে লেখক-শিল্পীদের নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়। এই প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল সফল করার কাজটিকে সে সময় প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইলিয়াস। ঘরে ঘরে গিয়ে, অফিসে কর্মস্থলে গিয়ে লেখক শিল্পীদের এর গুরুত্ব বোঝানো ও অংশগ্রহণের তাগিদ দেয়া, পত্রিকা অফিসগুলোতে ঘুরে ঘুরে এর প্রচারের গুরুত্ব বোঝানোর কাজে তিনি ছিলেন আমাদের সবার আগে। কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা কাজের ফলেই প্রতিবাদ সমাবেশ সফল হয়েছিল।

অসুস্থ হবার আগে সর্বশেষ যে আয়োজনে তিনি সক্রিয় ছিলেন সেটি হল বিশ্বে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের নিয়ে আলোচনা-মতবিনিময়। লেখক শিবির থেকে এর আয়োজন করা হয়েছিল, আয়োজন করেছিলেন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগ থেকেও। বাংলা বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা ছিলেন খুবই কম।

পাঁচ

খবরটা প্রথম জানলাম ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৬। সেদিন ঢাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সম্মেলন হচ্ছিল। সেখানে যাওয়ার পথে রাস্তায় দেখা হল লেখক শিবিরের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডা. মনিরুল ইসলামের সঙ্গে। সকালে ইলিয়াসের পায়ের ব্যথা সংক্রান্ত বেশকিছু পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ ও সেগুলো নিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে ইলিয়াসের সঙ্গে মনিরুলও ছিলেন। পিজি ও বারডেম।

ইলিয়াস পায়ের প্রচণ্ড ব্যথাকে উপেক্ষা করে বা করবার জন্য পিজির অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমানের ঘরে মহাগল্প, হা হা হাসি এবং চা সিঙ্গাড়া ইত্যাদি নিয়ে ছিলেন। এই চিকিৎসকের উপরই এইদিন পর্যন্ত ইলিয়াস

পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। ব্যথাটা ছিল কয়েকমাস ধরেই। আমরা শুনেছি, কিন্তু ব্যথার ভয়াবহতা অনুভব করিনি। সে সময়, ছাপা হবার আগে *খোয়াবনামা*র উপর শেষ হাত চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর ব্যস্ততার আড়ালে শরীরের কষ্ট চাপা পড়ে যায়, আমরা উপন্যাস ও তার চারপাশের কথা শুনতে শুনতে তাঁর শরীরের কষ্টের কথা ভুলে যাই। কেননা এমনিতে ইলিয়াস ব্যথা বা কোনো ধরনের কষ্টের কথা কখনো মুখ ফুটে বলতে পছন্দ করতেন না। একেবারে না পেরে উঠলে বা জেরার মুখে পড়লে বলতেন, কিন্তু বলতেন এমনভাবে যেন এটা খুবই মজার বা আনন্দের বিষয়। ইলিয়াসের এরকম প্রতারণামূলক আচরণে আমাদের মতো বেকুবেরা খুব সহজেই প্রতারিত হতাম এবং আমরাও যেন অসুখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দ নিয়ে হা হা তে যোগ দিতাম। মন প্রফুল্ল ও সমৃদ্ধ করে আমরা বাসায় ফিরতাম, ইলিয়াসের কষ্টটা রয়েই যেত।

হতে পারে, ঠিক একই কারণে ডাক্তাররাও বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যথাকে গুরুত্ব দেননি। দিনে দিনে অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী পেইন কিলার চলতে থাকল। প্রথমে ট্যাবলেট তারপর ইঞ্জেকশন, কাজ হলো না। এরপর ডাক্তার ঠিকঠাকমতো পরীক্ষা না করেই আরও ব্যবস্থা দিলেন, প্রথমে ট্র্যাকশন, পরে রে দেয়া। আমি জানিনা কিন্তু না ধারণা করি এই ব্যবস্থাগুলোই পায়ের ভেতরের ভয়াবহ অসুখটিকে আরও হয়তো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মনিরুল পরিষ্কার করেই বললেন, ক্যান্সারের সব লক্ষণই পাওয়া গেছে আজকের পরীক্ষায়। বারবার শুনি, শুনতে চাই না, শুনি, ফাঁকফোকর খুঁজি, অন্য সম্ভাবনার কথা বের করতে চাই ডাক্তারের মুখ থেকে। শেষ পর্যন্ত একটা সম্ভাবনার কথা জেনে যেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরি। হাড়ের টিবিও হতে পারে, তবে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এই সম্ভাবনাই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি। আর একটি সম্ভাবনাকে মনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করি—এদেশে এরকম বিস্তর ঘটনা আছে যে, এদেশের ডাক্তাররা বলেছেন ক্যান্সার কিন্তু অন্যদেশে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে তেমন কিছুই না। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারি না। ভয়-উদ্বেগ সব সাহস কেড়ে নেয়। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। অসম্ভব এক পরিস্থিতি পার হতে থাকি আমরা সবাই।

অবশেষে টেলিফোন আশ্রয় করি। ইলিয়াসের এই কণ্ঠ আমি চিনি না। ভাঙা, ভেজা, মার খাওয়া-আমি বার বার টিবির সম্ভাবনার কথা বলতে চেষ্টা করি, জোর দিয়ে বলতে চাই, হয় না। ইলিয়াস বারবার বলেন, আমার আর পাঁচটি বছর খুব দরকার ছিল, অন্তত দুটো বছর!

ইলিয়াস কলকাতায় গেলেন ১৯৯৬-এর ২৬ জানুয়ারি। কলকাতায় যাবার আগ পর্যন্ত আমরা এই বিশ্বাস নিয়েই থাকতে চাইলাম—সব মিথ্যা প্রমাণিত হবে। যাবার আগে কয়দিন অনেক গল্প, কথার আড়ালে আমরা উভয়পক্ষ নিজেদের আড়াল করতেই ব্যস্ত ছিলাম। ইলিয়াস বলেন, কলকাতায় গিয়ে যদি সব মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে কী একটা লজ্জার ব্যাপার হবে, সবার এত ব্যস্ততা!

পুরো বছর জুড়ে আমাদের সব বিশ্বাসই একে একে ভাঙতে থাকে। কলকাতা থেকে খবর আসে, আমাদের সব আশা ভেঙে পড়ে, ইলিয়াস লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পান!

এ সময়েই, জন্মদিন ১২ ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি সময়ে, প্রকাশিত হয় এ পর্যন্ত ইলিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘদিনের সবচাইতে বেশি কষ্ট-আনন্দ নিংড়ে নেয়া '*খোয়াবনামা*'। ইলিয়াস কলকাতায় তখন তাঁর পাঠক আবৃত। শরীরে অসম্ভব কষ্ট নিয়েও তখন তিনি সমাজ সাহিত্য আর অসুস্থতা নিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। এর আগেও আমরা অন্য সময়ে দেখেছি তিনি তাঁর যাবতীয় অসুখ-বিসুখে নিজের শরীর থেকে নিজের দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করেন। তাঁর বর্ণনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা শুনে মনে হতো তখন তিনি অন্য কারও কথা বলছেন গভীর পর্যবেক্ষণ দিয়ে। কিন্তু এই অসম্ভব চেষ্টারও তো একটা সীমা আছে। ইলিয়াস শেষ পর্যন্তই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, এর কোনো সীমা নেই।

কেমোথেরাপির ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয় মার্চের প্রথম থেকেই। ইলিয়াসের শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা একে একে বাড়তেই থাকে। সব ডাক্তার মিলে সিদ্ধান্ত নেন, ডান পা একেবারে গোড়া থেকেই বাদ দিতে হবে। কোনো বিকল্প নেই। তারিখ ঠিক হয় ২০ মার্চ। এ সময়েই শরীরের অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে আরেকদিক থেকে যুক্ত হয় প্রবল মানসিক

চাপ। আনন্দবাজার গোষ্ঠী *খোয়াবনামা*কে নির্বাচন করে পুরস্কারের জন্য। এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের স্পষ্ট বিরোধিতা ইলিয়াসের সামগ্রিক অবস্থানের সঙ্গে ছিল খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া আনন্দবাজার গোষ্ঠী নিয়ে তার কিছু নির্দিষ্ট তীব্র সমালোচনা ছিল। দেশে ফিলিপসসহ সমজাতীয় অনেক দামি পুরস্কারকে তিনি উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফিলিপস পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে গিয়ে একজন ইলিয়াসকে বলেছিলেন, 'জীবনে তো আপস করতেই হয়। আপস না করে চলা যায় না।' ইলিয়াসের উত্তর ছিল, 'আপস তো করছিই। সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছি, এটাই তো একটা আপস। এই আপস আমাকে করতে হচ্ছে কেননা এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু যে আপস না করে আমি থাকতে পারি সে আপস আমি কেন করবো?'

অর্থের প্রয়োজন, লোভ, খ্যাতি, প্রচারকে উপেক্ষা করেই ইলিয়াস নিজের সৃষ্টির প্রতি, কাজের প্রতি নিজের অঙ্গীকারকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আনন্দবাজার পুরস্কারের সময় ইলিয়াস দাঁড়াতে পারেন না। ভয়াবহ শরীরী যন্ত্রণা ও হাসপাতাল-ঔষধের মোটা মোটা বিল, ঋণ, ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট ব্যয়ের সম্ভাব্য বিরাট অংক সব মিলিয়ে তার অসহায়ত্ব প্রবল ইলিয়াসকে দুর্বল করে ফেলে। ঘুম অসহ্য হয়ে ওঠে, শরীরের যন্ত্রণার চাইতে মনের যন্ত্রণা ও গ্লানিবোধ ধ্বসিয়ে দেয় অপরাজেয় ইলিয়াসকে।

২০ মার্চ পা কেটে বাদ দেয়া হয়। এই পা-র প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুরো জীবনই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। ধুলা-বালি, জনপদ, হাড্ডি খিজির, চেংটু, তমিজের বাপ, বয়তুল্লাহ সবার চলার পথের সামনে দেয়াল উঠে যায়। ইলিয়াসের পা কোথাও চলে যায়, রূপান্তরিত হতে থাকে অন্য কিছুতে- কিন্তু এক জায়গায় আটকে থেকেও, ঔষধের মধ্যে ডুবে যেতে যেতেও ইলিয়াস তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। পা-হীন জায়গায়, প্রাক্তন পা-র জায়গাটুকুতে থেকে থেকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। ডাক্তাররা বলেন এটা হলো ফ্যানটম পেইন, চলে যাবে। কিন্তু যায় না। ইলিয়াসের পক্ষে অতীত থেকে, নিজের সৃজনশীল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়া তো অসম্ভব। শেষ পর্যন্তও তাই অনুপস্থিত পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা ইলিয়াসকে তাড়া করেছে।

ইলিয়াস যখন ঢাকায় ফিরলেন, তখন তার পরিচিত চেহারা আর নেই। বয়স বেড়ে গেছে অনেক। কেমোথেরাপির ধাক্কায় মাথার চুল নেই। পা-র অনুপস্থিতি ঢাকার উপায় নেই। হুইল চেয়ার এবং ক্রাচ সর্বক্ষণের সঙ্গী। কথা বলবার সময় অসম্ভব ক্লান্তির ভেতর থেকে আমাদের পুরনো প্রাণবন্ত ইলিয়াস ভাই বেরিয়ে আসেন। কলকাতায় তাঁর চিকিৎসায় স্থবিরবাবু, নাজেস, মৌসুমীদের কত পরিশ্রম, ভালোবাসা, নার্স, বাবুর্চিদের গল্পের পাশাপাশি কলকাতার লেখকদের কথা, বর্তমান লেখালেখির খবর, দেশের ইত্যাদি বিষয়ে আমরা ঘোরাঘুরি করতে থাকি। বিশ্বাস করতে থাকি ইলিয়াস ভাই আবার উঠে আসছেন।

শুরু হয় কাশি। বুকে ব্যথা। রক্ত পড়া। তার বর্ণনাও শিল্প হয়ে উঠতে থাকে। আমরা তাঁর বেদনা আর কষ্ট অনুভব করার আগেই ডুবে যাই তাঁর বর্ণনার মাদকতায়। কমিউনিটি হাসপাতালে কেমোথেরাপি শুরু হয় আবার। ঢাকায় কেমোথেরাপি নতুন তখন, দক্ষ জায়গা নেই। স্থবিরবাবু এই হাসপাতালের ব্যাপারে আস্থাশীল। এখানে ইলিয়াসের উপর দিয়ে শুরু হয় যেন নার্স ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ। ইঞ্জেকশন দেয়ার সময় ১, ২, ৩, ...১০, ১১ এমনকি ১৫ বার সুই ফোটানো হয়। আমাদের অসহ্য হয়ে যায়। ইলিয়াস যেন তাঁর সহ্যসীমা পরীক্ষা অব্যাহত রাখেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরে কলেজের ক্লাস নেয়া আবার শুরু হয়। বিভাগে এমনকি বাসাতেও। বিভাগের বই কেনার জন্য আর লোক পাওয়া যায় না। ইলিয়াসকেই হাঁচড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেবিতে উঠতে হয় এবং বাংলাবাজার খুঁজে খুঁজে ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় বই বাছাই, কেনা এবং তা বিভাগে পৌঁছে দেয়ার কাজ সবই করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অসাধারণত্ব শুধু মৌলিকত্ব, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্যতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অসাধারণ দায়িত্ববোধ তাঁকে যে চরিত্র দান করেছিল তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

কাশি বাড়তেই থাকে। চলতে থাকে নানারকম ঔষধের অত্যাচার। বুকের ব্যথা এবং অবিরাম কাশি তার কণ্ঠ বদলে দেয়। এমনিতেই ঘুম হয় না, কাশি তা আরও কমিয়ে দেয়। মুখে ঘা হতে থাকে। আবারো আতঙ্কের

অন্ধকার ঘিরে আসে আমাদের চারদিকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় আবার। ফলাফল বারবার খারাপ আসতে থাকে। অবশেষে পরীক্ষার জন্য কাগজপত্র কলকাতায় পাঠানো হয়। এবং একদিন তার উত্তর আসে। জীবনে এতবড় সুখবর শোনার অনুভূতি কখনো পাইনি। শরীরে ক্যান্সার আর নেই।

এক টুকরো কাগজ, মনে হলো পুরো পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে। কাশি, থুথুতে রক্ত তখনও চলছে। কিন্তু সেগুলো তখন আমাদের কারও কাছেই কোন গুরুত্ব বহন করে না। আমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে থাকি। এরপরের কয়েকদিন কী কী কাজ আমাদের এখন হাতে নেয়া উচিত, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হতে থাকে। ইলিয়াস তাঁর নতুন উপন্যাসের কাজের কথা বলতে থাকেন। বলেন—কলকাতার অভিজিত, মিহির, পৃথ্বিশ, তরুণসহ যারা স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করছেন তাঁদের নিয়ে এবং এদেশের তরুণ যারা এখনো দূষিত পঙ্কিলে ডুবে যায়নি তাদের সবাইকে নিয়ে সাহিত্য সম্মেলন করা দরকার। এই সম্মেলন নিছক সাহিত্য নিয়ে পণ্ডিতি কচকচি নয়, এটা হলো সাহিত্যের মর্মবস্তুরই অনুসন্ধান। আব্বাস উদ্দিনের গান শুনতে শুনতে ইলিয়াস আরও বলেন, উনিশ শতক আমাদের যেমন অনেক কিছু দিয়েছে তেমনি ক্ষতিও করেছে অনেক। ভদ্রলোকী সংস্কৃতির আধিপত্য এদেশের বিশাল সম্পদ ভাণ্ডারকে কীভাবে ধ্বংস করেছে তার হিসাব করা কঠিন। ভাষা, উপলব্ধি, নিজের প্রকাশভঙ্গির এদেশীয় সত্তাকে প্রাণহীন করে ফেলেছে আরোপিত ভদ্রলোক সংস্কৃতি। এ নিয়ে যে কত কাজ করা দরকার।

নতুন করে যখন আমরা উঠে দাঁড়াচ্ছি তখন, ঠিক সে সময়টাতেই ইলিয়াসের উপর আরেকটি বড় আঘাত আসে। এক পায়ে হাঁটতে গিয়ে টাল হারিয়ে পড়েন এবং ডান হাতটা ভেঙে যায়। সে হাতটিই বাঁধা পড়ে, অচল হয়ে যায় যেটি দিয়ে শত অসুস্থতার মধ্যেও তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। লেখা বন্ধ হয়ে যায়, এক পায়ে যতটুকু বা হাঁটাচলা যেত, যতটুকু বা তিনি নিজে শিক্ষকতার কাজ চালাচ্ছিলেন তাও বন্ধ হয়ে যায়। শুয়ে থাকার যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। এক পর্যায়ে বলেন, 'দিস মাস্ট বি মাই লাস্ট বেড। পত্রিকায় লেখা হবে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মৃত্যু...।'

মহাশ্বেতা দেবীর ঢাকায় আগমন তখন ছিল আমাদের সবার জন্যই এক বিরাট স্বস্তির ব্যাপার। প্রায় মাসখানেক ছিলেন তিনি। এর আগে শাশ্বত, অমিতাভেরা যখন তাঁকে নিয়ে ছবি বানানোর জন্য এলো সে সময়ও ইলিয়াস অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন, ব্যস্ত থেকেছেন। মহাশ্বেতা দেবী ও ইলিয়াসের মধ্যে যেন দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সাক্ষাত হয়েছিল। দুজনের এত বিষয় দুজনের মধ্যে আলাপের ছিল। মহাশ্বেতা কাজ করেন শবর ও বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে। এই কাজ নিছক এনজিও মার্কা কাজ নয়, তাদের 'উন্নয়ন' ঘটানো নয়, তাদের 'মূলধারা'য় নিয়ে আসার 'মহান' কর্ম নয়—বরঞ্চ তাদের মধ্যে দিয়ে বর্তমান 'সভ্যতা' 'উন্নয়ন' 'দারিদ্র বিমোচন' এর প্রতারণা ও অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করা ও তা মানুষকে জানানো। মহাশ্বেতা বলেন, 'যে সমাজে শিশুদের বিবেচনা করা হয় সকলের সন্তান হিসেবে, শিশুদের প্রতি যেখানে সকলেই দায়িত্ববোধ করেন ও দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে নারী নির্যাতন অকল্পনীয় ব্যাপার, যেখানে বর্বর প্রতিযোগিতা নয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সামষ্টিক বোধই স্বাভাবিক ঘটনা সে সমাজকে বলা হয় বর্বর, আর আমাদের সমাজ হলো মহা-উন্নত!'

দুজনে বলতে থাকেন, দুজনেই নিবিড় বক্তা ও মনোযোগী শ্রোতা। ইলিয়াসের সব ক্লান্তি, ব্যথা, কষ্ট যেন ঢাকা পড়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী শবর খেড়িয়াদের কথা বলেন, নিজের পরিবারের কথা বলেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, মানুষের জীবন ও সংগ্রামের অসাধারণ পর্বগুলো দুজনের কথা, ভাষা, গান, কবিতার মধ্য দিয়ে অবিশ্বাস্য শক্তি নিয়ে চারপাশের আমাদের প্লাবিত করে। মহাশ্বেতা গান করেন, ইলিয়াস কখনো চোখ বন্ধ করে শোনেন কখনো নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করতে থাকেন। কখনো মহাশ্বেতার গভীর মমতাময় হাতে মাথাটা ছেড়ে দিলে অসহ্য বেদনা তরল হয়ে আসে। এরমধ্যে কেরালার লেখক আনন্দ আসেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন ইলিয়াস। তাঁর লেখা রাত জেগে পড়তে থাকেন। মাস পার হয়ে যায় ডান হাতটা আর ঠিক হয় না। কাশি আবার ফিরে আসে। এক সময়ে অস্থির হয়ে বাঁ হাতেই লেখার চর্চা শুরু করেন।

ছয়

হাতটা ঠিক হবার সময় যখন ঘনিয়ে আসছে তখনই এলো শেষ কামড়। ২০ ডিসেম্বর থেকে আবার সেই হাসপাতাল। অক্সিজেন একটানা। বারবার ঘুমিয়ে যান। বলেন, 'শুধু ঘুম পাচ্ছে। কতদিন যে ঘুমাইনি'। ঘোরের মধ্যেই নিজের ঘুম আর ঘোরের বর্ণনা দিতে থাকেন। আকবর আলী খান, শিকড়ের গান, আব্বাসউদ্দীন শুনতে থাকেন। প্রতিদিন রক্তের পরীক্ষা। ফলাফলে পাগলামি, একেক সময় একেক রকম। একটু উন্নতি হলে সেটাকেই আমরা বেশি করে বলতে থাকি, বিশ্বাসও করতে থাকি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিশ্বাসই প্রবলভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করেছি যে, ইলিয়াস আমাদের সঙ্গে থাকবেনই। আমাদের ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন? কী করে যাবেন?

আগস্ট ১৯৯৭

ইলিয়াসের লেখার জমিন

কী করতে চেয়েছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)? কী জন্য তাঁর দিবারাত্রি অস্থিরতা, উদ্বেগ আর নির্ঘুম তাকিয়ে থাকা? সবকিছু, ক্লান্তি-দূষণ-ক্ষুদ্রতা-নীচতা-কষ্ট-জটিলতা ভাসিয়ে দিয়ে যে হাসি তাঁর, তার আড়ালে কেন তাঁর অপরিসীম যন্ত্রণা? জমজমাট আড্ডার কেন্দ্রে বসেও কেন তিনি অবিরাম সক্রিয় চিন্তায়, প্রশ্নে, অনুসন্ধানে? কী করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর সকল সক্রিয়তার কেন্দ্রীয় ফসল লেখার মধ্যে, শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে?

ইলিয়াসের লেখা না পড়লে, তাঁর লেখার গভীরে প্রবেশ না করলে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান সম্ভব নয়। তাঁর লেখায়, গল্প উপন্যাস—একের পর এক যা ইলিয়াসের নিছক আনন্দ নয়, যন্ত্রণা, অনিদ্রা, শারীরিক পরিশ্রম, দিনের পর দিন রাতের পর রাত অধ্যয়ন, বর্তমান ও অতীতের লোকালয়ে অজানার সন্ধান, রক্ত-হাড়-মাংসের এই সবকিছুরই ফসল তা তো কেবল নিরেট কাহিনী নয়। যা তাঁর অস্বস্তি আনন্দ যন্ত্রণা উপলব্ধি শ্রমের ফসল সেটাই পাঠকের শ্রম আনন্দ যন্ত্রণা অস্বস্তি উপলব্ধির কারণ। তাঁর মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ, সম্পর্কের বর্তমানেই কেন্দ্রীভূত নয়—তা অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতে প্রবাহিত।

শেষ পর্যন্ত কি তাহলে মানুষই তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, অনুসন্ধানের লক্ষ্য, আবার অনুসন্ধানের অবলম্বন? কিন্তু এই কাজ কি সহজে হবার? এই কাজ তো বহুমাত্রিক, বহুদিক দিয়ে চলাফেরা না করলে অনেক ধোঁয়া

কুয়াশা ধুলা দেয়াল সরিয়ে সরিয়ে না গেলে এর কাছে যাওয়া যায় না। এ যেন এক অসম্ভব যাত্রা। কিন্তু এ ছাড়াই বা উপায় কী?

'মৃত্যু'র পাঁচ মাস আগে মহাশ্বেতা দেবীর কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিজের ভবিষ্যত উপন্যাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তার থেকে একটা বড় উদ্ধৃতি এখানে দেয়া প্রয়োজন বোধ করি। তিনি লিখেছেন—

> '...এই উপন্যাসের লোকজন যেখানে বাস করে ঐ জায়গাটি আপনার চেনা, 'এককড়ির সাধ'-এর নায়কের বাড়িও সেখানেই। মহাস্থান আমার বাড়ি বগুড়া থেকে মাত্র ছয় মাইল। ছেলেবেলা থেকেই প্রাচীন পুণ্ড্রনগরীর বিশাল ধ্বংসাবশেষের প্রায় সবটাই আমি চষে বেড়াচ্ছি, বেশিরভাগ সময় একা, মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে। বগুড়া শহরের উত্তরে সুবিল বলে একটা জায়গা আছে, পুণ্ড্রনগরীর শুরু বলতে গেলে সেখান থেকেই। তারপর গোকুল, সেখানে বিশাল একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তুপ, গোকুল পেরিয়ে মহাস্থান। ওখানে এখন একটা মিউজিয়াম, মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে আরও মাইল কয়েক গেলে শিবগঞ্জ, সেটাও কিন্তু প্রাচীন পুণ্ড্রনগরীর অংশ। আপনার এককড়ি করতোয়ার জলে মহাস্থানের ভাঙাচোরা প্রাসাদের লাল ইটের ছায়া দেখেছিলেন, মনে আছে? আমার উপন্যাসের লোকজন বাস করে সেই করতোয়ার তীরে। তবে এ লাল ছায়া কতোবার যে কায়া পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই দিব্যোক আর ভীমের কৈবর্তক বিদ্রোহের আমল থেকে মজনু শাহের ফকির বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অজস্র মানুষের রক্তে করতোয়া ভেসে গেছে মানুষের রক্তে। এমনকি, শুনেছি যে, বৌদ্ধদের অহিংস ধর্ম প্রচারের সময় এখানে কয়েক হাজার জৈন সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছে।...'
>
> 'আমি অবশ্য থাকতে চাই ১৯৭১-এর যুদ্ধের মধ্যে। কিন্তু তা হলে কি জায়গাটিকে ইজ্জত করা হবে? তাই বড় বিপাকে পড়েছি। উপন্যাস লেখার আগে আমি মেলা নোট টোট নিই, দি.... একটা করে ফেলি। কিন্তু একবার লিখতে শুরু করলে সব ওলট পালট হয়ে যায়, চরিত্ররা বাহাদুর হয়ে ওঠে, আমার শাসন মানতে চায় না। আর একটা মুশকিল হয়েছে। লেখার সময়, মানে লিখতে লিখতে

> ঐ জায়গাটায় আমাকে বারবার যেতে হবে। আরও মানুষের মুখের গল্প শুনতে হবে। কিন্তু এই মার্চে ক্যানসারের উৎপাত থেকে রেহাই দিতে ডাক্তারের আমার ডান পায়ের গোটাটাই কেটে ফেলেছেন। এখন ক্র্যাচে ভর করে হাঁটি। কিন্তু এভাবে কি ওখানকার উঁচু নিচু জায়গাটা পেরোতে পারব? বলতে কি, ওখানে যাবার জন্যেই আমি প্রাণপণে ক্রাচে হাঁটা রপ্ত করার চেষ্টা করছি। মাস দুয়েক পর বগুড়া যাবো, তখন মহাস্থানে গিয়ে দেখবো কতটা হাঁটা যায়।'

সম্ভবত এইজন্যেই এবং শিক্ষকতার প্রবল দায়িত্ববোধের টানে তিনি ক্রাচে ভর করে ঢাকা কলেজে গেছেন এবং বিরতিহীন ক্রম উচুঁমুখী সিঁড়ির ধাপগুলি একা পার হবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছেন নিজের উপর। নিজের শরীরে তাঁর নিজেরই যে কত আঘাত!

ইলিয়াসের অনুসন্ধানে, তিনি যত সামনে যাচ্ছেন ততই যেন তাকাচ্ছেন পেছনে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পাটাতনের উপর শহর গ্রামের অসংখ্য নারী পুরুষকে নিয়ে নির্মাণ করলেন *চিলেকোঠার সেপাই*। তার প্রায় দশ বছর পর *খোয়াবনামা* প্রকাশিত হলে আমরা দেখি, আর জমিন পাকিস্তান-পূর্ব তেভাগা আন্দোলনের গ্রাম শহর। এরপর তিনি যখন পরিকল্পনা করেন একাত্তরের উপর দাঁড়াতে, তখন তিনি পুণ্ড্রনগরীর হাজার বছরের সৃষ্টি-ধ্বংস খুঁজতে থাকেন। দিব্যোক-ভীম এর কৈবর্ত বিদ্রোহ তাঁকে অস্থির করে তোলে ইতিহাসের নতুন পাঠ নিতে। ইতিহাস খুঁড়তে গিয়ে তিনি মহাস্থানের খোঁড়াখুঁড়িকে অতিক্রম করেন।

কেন সামনের দিকে এগুতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকাতে হয়? কেন যতই তিনি এগুচ্ছেন ততই তাঁর তাগিদ তৈরি হচ্ছে পেছনের দিকে আরও স্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপের? তাগিদ তৈরি হয়, কারণ পেছনের মানুষদের উপর জনপদের উপর ইতিহাস নামক অনেক আবর্জনার স্তুপ তৈরি করা হয়েছে। মানুষ ঢাকা পড়ে আছে, ঢাকা পড়ে আছে জীবন প্রবাহের আসল চেহারা। সেগুলোর উম্মোচন না করে সামনে তাকানো কঠিন। এ শুধু গত দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে বেড়ে উঠা, ইলিয়াসের ভাষায় 'জন্মপঙ্গু' ভদ্রলোকদের তৈরি আবর্জনা নয়—তারও বহু আগে থেকেই তা জমে উঠছে শাসকদের যন্তর মন্তর ঘরে মগজ ধোলাই হওয়া রচনাকার

দলিল প্রণেতা শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। হাজার বছর আগের দিব্যোক-ভীমকে বুঝতে গেলে তাই বিখ্যাত কবির গাঁথাকেই প্রশ্ন করতে হয়। মিথ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষকেই নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়।

ঔপনিবেশিককাল এখানে, এই আবর্জনার স্তূপের উপর শক্ত পাথর চাপা দিয়েছে, তার উপর বসিয়ে দিয়েছে নতুন শাসক, নতুন ভদ্রলোকদের। এই শাসক ভদ্রলোক মধ্যবিত্তকে না সরিয়ে, চপেটাঘাত না করে, চাবুক না মেরে তাই ইলিয়াসের কাজ করবার উপায় থাকে না। ইলিয়াসকে তাই খুব রাগী, অসহিষ্ণু মনে হতেই পারে।

ইলিয়াসের বিভিন্ন লেখায় এই মধ্যবিত্তের উপস্থিতি দেখি। মধ্যবিত্তের রাখঢাক করা, ভণিতার আড়ালে থাকা, ধর্ম-অর্থ-সংস্কৃতি-আধুনিকতা-বশ্যতা-বাহাদুরি-লাম্পট্য-নৈতিকতা ইত্যাকার মিশেল দেয়া মধ্যবিত্তের জীবনটা উন্মোচন করা ইলিয়াসের কাছে খুব জরুরি মনে হয়েছে। কেননা এই মধ্যবিত্তের কাঠামো অতিক্রম না করলে, তাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণের মুখোমুখি না করলে জীবনের কাছে যাওয়া অসম্ভব।

মধ্যবিত্তের জন্যই তার ধরন যাত্রা নির্দিষ্ট করেছে—'এই মধ্যবিত্ত হল দেশবাসীর প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তির দেওয়া উপহার। উপনিবেশের মানুষ একটু ছোটই হয়, তাকে খাটো করে রাখতে না পারলে শাসক টিকে থাকে কী করে?' এই খাটো হয়ে থাকায় অনুগত মধ্যবিত্ত সদা গদগদ। এই দেশে ইউরোপের প্রভুদের অনুসরণে উপনিবেশের জন্মপঙ্গু 'ব্যক্তি ভুগছে সায়েবদের ব্যক্তিসর্বস্বতার ব্যারামে।' তাছাড়া 'আমাদের এই উপনিবেশে মধ্যবিত্তের নাবালক ও বামন সন্তান শ্রীমান শক্তি বাবু চলছিলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, তার খোঁড়ানোকে দেখা হচ্ছিল নাচের মহড়া বলে। তা তিরিশের দশকে শ্রীমান আছাড় খেয়ে পড়েই গেলেন, তাঁর কাপড়-চোপড় আর কিছুই রইল না, রোগাপটকা গতরটা উদোম হয়ে গেল।' আবির্ভূত হলো, 'ঢাল ও তলোয়ারবিহীন শ্রীযুক্ত নিধিরাম সর্দার ন্যায়রত্ন তর্কবাগীশ মহাশয়।'

এই মহাশয়ের আত্মপরিচয়ের সংকট, বিশ্বাস আর সংশয়ের মধ্যে দোল খাওয়া, হীনমন্যতা জমিদারির স্বপ্নকল্পনা—বার্ধ্যকের বোদের নিরাপত্তা জাল—আলস্যের ঢেকুর শর্টকাট রাস্তার ধান্ধা—শেকড়কে অস্বীকারের

গর্ব—যত শিক্ষা তত ধর্ম ইত্যাকার যাবতীয় নির্ঘুম বা সুখের ঘুমের দিনকাল ইলিয়াস নিষ্ঠুরভাবে ধরতে চেষ্টা করেন। এই নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে বিস্তীর্ণ জনপদের অকথ্য জীবনে বসবাসরত নারী পুরুষ শিশুবৃন্দের প্রতি গভীর ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধের মধ্য থেকেই তৈরি।

এই মধ্যবিত্ত উপনিবেশ পার হয়ে পাকিস্তান হয়ে এখন বাংলাদেশে লম্পট-লুটেরা-দুর্বৃত্তদের যাবতীয় অপকর্মের বিশ্বস্ত সঙ্গী, সহযোগী, মতাদর্শিক-যৌক্তিকিকরণের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি, তার জাল এখন আরও বড়, সে 'স্বাধীন' 'সার্বভৌম' ভৃত্য। চিন্তার ক্ষমতাকে তালা মেরে রাখতে রাখতে সেখানে জং ধরে গেছে। চিন্তার প্রয়োজন নেই, সৃজনশীলতার প্রয়োজন নেই, দায়িত্ববোধ বৃথা কিংবা অপ্রয়োজনীয় শব্দ। সামরিক কর্তা থেকে আমলা-বিশেষজ্ঞ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক: ক্যারিয়ার, সাফল্য সবকিছুই চিন্তার নিষ্ক্রিয়তার সাথে সম্পর্কিত। মর্যাদার অর্থ এখানে হল জনগণ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি, বর্ণপ্রথা মুসলিম প্রধান সমাজে মধ্যবিত্তের মধ্যে এখন যেন প্রবলভাবে উপস্থিত। ভণিতা সেজন্য তার অন্তর্গত, আলাদা করে ভণিতা নেই। তবে এই মধ্যবিত্তের অস্তিত্বে তো আলাদা নয়। এটা তো কেবল কিছু ব্যক্তির ঝুলে থাকা নয়, কিংবা নয় ঈশ্বর থেকে পাওয়া কোনো বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস, মালিকানার ব্যবস্থা, ধর্মের নানারূপ, শাসক শ্রেণির চেহারা, দমনপীড়ন ব্যবস্থা এবং এগুলোর সুতা ক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা পর্যন্ত সম্পর্কিত।

এগুলো নিয়ে লিখতে গিয়ে ইলিয়াস তাই বুনটগুলো পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হন। অন্য অনেকের মতো একই কাহিনির হাজারো বয়ান যা দিয়ে 'গল্প' 'উপন্যাস' যদিও বা সম্ভব, শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়—সম্ভব নয় সাহিত্য নির্মাণ। ছোটগল্প সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকেই তিনি তাই প্রশ্ন করেন, বর্তমান সময়ে গ্রাম শহরের মানুষ যে হাজারো সূত্রে বাঁধা সেই 'লোকটিকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কি ছোট ছোট কথার আদর্শ দিয়ে কাজ হবে? তার একটি সমস্যা ধরতে গেলেই তো হাজারটা বিষয় এসে পড়ে, কোনোটা থেকে আরগুলো আলাদা নয়। একজন চাষীর প্রেম করা কি বৌকে তালাক দেওয়া, তার জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কি ভূমিহীনে পরিণত

হওয়া, তার ছেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে রওনা হওয়া এবং সেখান থেকে সৌদি আরব যাওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার কবলে পড়া তরুণ চাষীর প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা—এসবের সঙ্গে সারের উপর ভর্তুকি তুলে নেওয়া কিংবা জাতীয় পরিষদের ইলেকশনে কোটিপতির ইলেকশন ক্যাম্পেইনে টাকার খেল দেখানো কিংবা এনজিও-র কার্যক্রমের সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

এনজিওর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের জন্য সাম্প্রতিক, তা এখন অনেক মধ্যবিত্তেরও দাঁড়ানোর জায়গা, মনস্তাত্ত্বিক—শারীরিক। এই এনজিও সম্পর্কে ইলিয়াসের সারকথা—

> ‘রাজনীতি আজ ছিনতাই করে নিয়েছে কোটিপতির দল। এদের পিছে পিছে ঘোরাই এখন বিত্তহীন মানুষের প্রধান রাজনৈতিক তৎপরতা। এখনকার প্রধান দাবি হল রিলিফ চাই। এনজিওতে দেশ ছেয়ে গেল, নিরন্ন মানুষের প্রতি তাদের উপদেশ—তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। কী করে?—না, মুরগি পোষো, ঝুড়ি বানাও, কাঁথা সেলাই করো। ভাইসব, তোমাদের সম্পদ নেই, সম্বল নেই, মুরগি পুষে, ডিম বেচে, ঝুড়ি বেচে তোমরা স্বাবলম্বী হও। কারণ, সম্পদ যারা হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে তা তাদের দখলেই থাকবে, ওদিকে চোখ দিও না।...’

উন্নয়ন, ক্ষমতা, ধর্ম আর দারিদ্র্য বিমোচনের বাণিজ্য কিংবা প্রহসন তো কেবল এই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এরমধ্যেই মানবিক সম্পর্ককে পিষ্ট করে দিয়ে চলে যায় ‘নৈর্ব্যক্তিক’ বিশ্বব্যবস্থা—

> ‘রাষ্ট্রের কোমরে বাঁধা দড়ির প্রান্তটি যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে তাকে গণ্য করাও তো ছোটগল্প লেখকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। বাঙালি বনাম বাংলাদেশি যুদ্ধে প্রাণ দেয় ইউনিভার্সিটির ছেলে, ইউনিভার্সিটিতে তালা ঝোলে আর গ্রামে পাটের দাম না পেয়ে পাটে আগুন জ্বালিয়ে দেয় বৃদ্ধ চাষী। সেই রিক্ত চাষীর গালে কার হাতের থাপ্পড়ের দাগ? কার হাত? মায়ের গয়না বেচে যে তরুণ পাড়ি দিয়েছে জার্মানি আর আমেরিকায় সেতো আর ফেরে না, তার মায়ের নিঃসঙ্গতাকে কি শুধু মায়ের ভালোবাসা বলে গৌরব দেওয়ার জন্য গদ গদ চিত্তে লেখক ছোটগল্প লিখবে?’

জমিনকে তন্নতন্ন করে দেখতে গিয়ে, মানুষকে তার সমগ্র হিসেবে তুলে আনার জন্য ইলিয়াস তাই বারবার উপলব্ধি করেন, বারবার উচ্চারণ করেন, বারবার নিজে হাতে কলমে মাঠে নামেন—পুরনো কলকব্জা বদলাতে হবে। স্যাঁতস্যাঁতে, তরল, তৃপ্তির ঢেকুর তোলা কাহিনি বয়ান থেকে বেরিয়ে অনেক দূর যেতে হবে। জটিল বহুদূর বিস্তৃত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করবার জন্য নতুন প্রকরণ চাই। অসম্ভব, অমানুষিক পথযাত্রা। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো করতেই হবে, সময়ই জাহির করে ক্ষেত্র, মানুষের সজাগ আর পরিশ্রমী কাজ তাতে ফসল বোনায়।

মানুষকে স্পর্শ করতে গেলে তো তার বিশাল জগতকেই উপলব্ধি করতে হয়। আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আকাশ পাতাল, কয়েকটি জগত। এখানে—

> ‘আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা খেয়ে প্রাণ ধারণ করেন, আমাদের এই দেশের অতি অল্প কিছু লোকের কুকুরও এর চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খায়। ...আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে গ্রামের শ্রমজীবীরা গ্রীষ্মকালে যে পানি খান, এই সোনার দেশেই ভদ্রলোকেরা তাই দিয়ে শৌচকার্য করার কথাও কল্পনা করতে পারেন না।’

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্য আর অকথ্য জীবন সম্পর্কে একটা চিত্র মধ্যবিত্তের মাথায় আছে। সেই চিত্রে বিপর্যস্ত হয়ে মধ্যবিত্তেরই একটি অংশ মধ্যবিত্তের গুমোট, অতিশয় কিলবিলে, স্যাঁতস্যাঁতে, আত্মপ্রতারণার জগত থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ লেখালেখি করেন, কেউ কেউ এমনকি অনেকটা এগিয়ে এসে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ভূমিকা পালনেরও চেষ্টা করেন। এদেশে অসংখ্য এরকম কর্মীর ইতিহাস আমরা জানি। একসময়ে বসে পড়া, খসে পড়া, নতুন জিহ্বা নিয়ে প্রভুর জুতা চুম্বন করা, পালিয়ে যাওয়া অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীর নড়াচড়া আমাদের সামনে থাকলেও নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা বেশি। এরমধ্যে অনেকে হয়তো হতাশ কিন্তু আত্মসমপর্ণ করতে নারাজ। ইলিয়াসের লেখায় মধ্যবিত্তের এই অংশটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ ইলিয়াস মানুষ অনুসন্ধান করছেন, তার

জমিন ছিঁড়েখুঁড়ে দেখছেন নেহায়েতই দেখার জন্য নয়—তার লক্ষ্য শিল্প সৃষ্টির এবং তার চাইতেও বড় নতুন জমিন সৃষ্টির অসাধারণ আনন্দের কষ্টকর যাত্রাকে স্পষ্ট করবার জন্য। এই শিল্প সৃষ্টি তাঁর কাছে বিপ্লবী রাজনীতি বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। সেজন্য তাঁর বিশ্লেষণের একটা সারকথা ছিল— 'নির্বাচনের জন্য পোস্টারই যথেষ্ট, কিন্তু বিপ্লবের জন্য চাই সাহিত্য'।

মধ্যবিত্তের যে অংশ বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গত কয়েক দশকে অনেক লড়াই সংগ্রাম ত্যাগ পরীক্ষা অতিক্রম করেছেন তাদের প্রতি ইলিয়াসের মনোযোগ তাঁর লেখালেখির বিশেষ অংশ। বিশেষ মনোযোগ এমনকি সমালোচনা তৈরি হয়েছে বড় প্রত্যাশার কারণেই। আর এর থেকেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণগুলি পাই, যেগুলি একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে আসা বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী, সম্পত্তিহীন শ্রমজীবী নারী-পুরুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পষ্ট করে তোলে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের মূল পরিচয়কে 'দারিদ্র্য' এর মধ্যে আটকে ফেলায় দেশী-আন্তর্জাতিক শাসক শ্রেণির বিশেষ আগ্রহ। এই জনগোষ্ঠী, তাই তাদের দৃষ্টিতে, সক্রিয়, সৃজনশীল জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই, তারা দরিদ্র—তাদের কেবলই পয়সার অভাব। সুতরাং পয়সার যোগানই সমস্যার সমাধান। সুতরাং ক্ষুদ্রঋণ, রিলিফসহ টাকা যোগানের ইত্যাকার পথই মহিমান্বিত হতে থাকে। এই দর্শন সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি যেমন আড়ালে নিয়ে যায় তেমনি যাদের সৃজনশীলতাই আমাদের টিকে থাকার ভিত্তি তারাই হয়ে পড়েন 'বোঝা' 'উদ্বৃত্ত' 'অসচেতন' 'দরিদ্র'। এরকম বোধের মধ্যে থাকলে করুণা, দায়, হঠাৎ হঠাৎ তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠা তাই মধ্যবিত্তের একটি অংশের তৎপরতা হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বামপন্থী নামের অনেক কর্মীদেরও আচ্ছন্ন করে রাখে। এখানে মানুষের প্রতি করুণা থাকে, সম্মান বা মর্যাদাবোধ থাকে না।

ইলিয়াস তাই বলছেন—'কিন্তু এই দারিদ্র্য দিয়েই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না। ...তাঁর যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য তাঁর সংস্কৃতিকে জানা একেবারে প্রথম ও প্রধান শর্ত। ... নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চার

উৎস হলো তাঁর জীবিকা।...' ইলিয়াস এই মানুষদের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে জীবনের জমিনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যে মধ্যবিত্ত জীবন-বিযুক্ত সংস্কৃতিচর্চায় উৎফুল্ল বা তৃপ্ত তার পক্ষে এর তাৎপর্য বোঝা কঠিন। ইলিয়াস বলছেন,

> 'সংস্কৃতি চর্চা তাঁদের কাছে কেবল মনোরঞ্জনের ব্যাপার নয়। কৃষক যখন গান করেন তখন মন হাল্কা করার উদ্দেশ্যে করেন না। গান না করলে শ্রম অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাঁকে গাইতে হয়। শরীরের সঙ্গে গানও তাঁকে জমিতে খাটতে সাহায্য করে।...শুধু গান নয়, নৌকার গলুই, লাঙলের জোয়াল, দায়ের ফলা, কাস্তের গা প্রভৃতি জায়গায় যেসব কারুকাজ করা হয় তার প্রত্যেকটির উৎস কিন্তু শ্রম, জীবিকার শ্রমকে সহজ করে তোলা।...নিরক্ষর শ্রমজীবীর হাতে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, ভাষার অলঙ্কার ব্যবহার করে এঁরা সাহিত্য চর্চার ক্ষুধা মেটান। এতে সাহিত্যচর্চা হয় না, কিন্তু এটা তাদের সংস্কৃতিচর্চার অংশ।'

শেকড় থেকে মধ্যবিত্তের ক্রমদূরত্ব এই জনগোষ্ঠী থেকে আগত বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদেরকেও এমন এক বৃত্তের মধ্যে আটকে রাখে যা থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু এই বৃত্তের মধ্যে থাকলে 'যাদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রামে নামা' তাদের প্রতি করুণা/দয়া/মমতা তৈরি হতে পারে কিন্তু 'মর্যাদাবোধ' তৈরি হয় না। আর মর্যাদাবোধ না থাকলে প্রয়োজনীয় যোগাযোগই স্থাপিত হয় না।

এমনকি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে মধ্যবিত্ত অভ্যস্ত, তার সাথেও একটা দূরত্ব থেকে যায়। জনগণের মধ্যে 'প্রবাদ ও উপমার ব্যবহার করার প্রবণতা অনেক বেশি। সরাসরি সরল বাক্য দিয়েও বক্তব্য প্রকাশ করা চলে, কিন্তু প্রবাদ-শ্লোক-ছড়া-উপমা প্রভৃতি বক্তব্যকে একই সঙ্গে তীব্র ও আকর্ষণীয় করে।' কিন্তু মধ্যবিত্তের পক্ষে এর মধ্যে প্রবেশও দুঃসাধ্য, অনেককিছু তার 'রুচির' সঙ্গেও মেলে না। শেকড়ের সঙ্গে-প্রকৃতির সঙ্গে উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে যারা অবিচ্ছেদ্য তাদের ভাষার অলঙ্কার বোঝার সাধ্য তরল শেকড় বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের কী করে থাকবে? তাছাড়া মধ্যবিত্তের তো আবার শ্লীল-অশ্লীল বোধ প্রখর। কিন্তু এর মধ্যেও নানা ভণিতা। সেজন্যই

> ‘টিভি ও সিনেমার অভিনয়ের নামে স্বদেশি বিদেশি মেয়ে পুরুষদের চোখমুখ ও কণ্ঠের ন্যাকামি ও ছ্যাবলামি দেখে এরা অভিভূত, আর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মুখের ভাষা শুনে এঁদের কান একেবারে লাল হয়ে ওঠে।’

জনগণের মুখের ভাষা, প্রকাশ শক্তি, জনগণের জীবন ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে ইলিয়াসের পর্যবেক্ষণ তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে কীভাবে শক্তিশালী এক জমিনকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে তা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। মহিবুল আজিজকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এমনকি ‘বামপন্থী শুচি বায়ুগ্রস্ত’দের চাপের মধ্যে ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি ব্যাখ্যা করছেন ভাষার কিছু নির্দিষ্ট ব্যবহারের কারণ।

তিনি লিখেছেন—

> ‘উপন্যাসে স্ল্যাং ব্যবহারে তোমার অনুমোদন পাচ্ছি। মানুষ খিস্তি দিয়ে কথা বলে নানা কারণে। এক, আঞ্চলিক হোক আর মিষ্টি হোক—প্রচলিত ভালো কথার মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে ধরতে পারে না। দুই, নিজের কোনো শক্ত সংকল্প কিংবা বুক-পিঠ তোলপাড় করা উপলব্ধি প্রকাশ করতে নিরক্ষর নিম্নবিত্তের বাধো-বাধো ঠেকে। শহরের প্রলেতারিয়েতের ব্যাপারে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। একদিকে বহুকালের শোষণ ও অন্যদিকে ভদ্দরলোকদের স্বচ্ছন্দ ও ছিমছামে জীবনযান প্রলেতারিয়েতের স্বভাবে প্রচ্ছন্ন গ্লানি ও তিক্ততা তৈরি করে। শোষণের চাপে তাদের ভেতরটা এমনভাবে কুঁকড়ে গেছে যে সেই গ্লানি বা তিক্ততা কখনো প্রতিরোধে ফুঁসে উঠতে পারে না। বড়জোর ক্ষোভে পরিণত হয়। এই তিক্ততা, ক্ষোভ ও গ্লানি বের করার নালা হলো তাদের খিস্তি খেউড়ের চর্চা।’

স্বভাবতই এর সঙ্গে মধ্যবিত্তের ‘রুচি’ মেলে না। মধ্যবিত্ত থেকে আগত রাজনৈতিক কর্মীও এসবের মধ্যে অস্বস্তিতে পড়েন। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের শেকড় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবার ফলেই বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও এরকম বোধ তৈরি হয় যে, তারা সবকিছু জানেন, আর অজ্ঞতা-অশিক্ষা-কুসংস্কারে ডুবে থাকা মানুষদের সেই জানা দিয়ে সচেতন করাই তাঁর মহান দায়িত্ব। তার ভূমিকা দাঁড়ায় উপদেষ্টার, কিন্তু কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারে না।

এই দূরত্বকেই ইলিয়াস বলেছেন, ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’। যে ভাঙন মধ্যবিত্ত কর্মীর কল্পিত আদর্শায়িত শ্রমিকের সন্ধানে আরও গভীর হয়। কল্পনার শ্রমিক পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় যে শ্রমিক, তার মধ্যে এই সমাজের নানা প্রভাব যেমন কাজ করে তেমনি তার ভেতরে সুপ্ত থাকে প্রবল শক্তি। সেখানে ভাঙা সেতু দিয়ে পৌঁছানো যায় না। অতীত থেকে ভবিষ্যতে প্রবাহিত মানুষের ভেতরের সেই প্রবল শক্তির অনুসন্ধান এবং তাকে স্পষ্ট করাই তাই ইলিয়াসের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অনুসন্ধানে তিনি একজন অসাধারণ শিল্পস্রষ্টাই কেবল নন, একই সঙ্গে একজন বিপ্লবী তাত্ত্বিক এবং কর্মীও বটে।

ফেব্রুয়ারি ২০০০

ইলিয়াসের প্রাঙ্গণ

ভক্তি বা নিন্দা কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বাইরে এসে মানুষ, সমাজ এবং জগৎকে দেখার এবং বিশ্লেষণের অতি প্রয়োজনীয় কিছু দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন ইলিয়াস। সেটাই তাঁর লেখা—তা রচনা, প্রবন্ধ, গল্প বা উপন্যাস যাই হোক না কেন তাকে বিশেষ মাত্রা দান করেছে।
'টুটাফাটা কাগজি নবাব' বাংলাদেশের নবাবদের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ। তিনি নবাব, নবাববাড়ী, তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বিনোদন, খেলাধুলা এমনকি স্থাপত্য সব বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। এক সময়ের দাপুটে, বর্তমানে পরিত্যক্ত নবাব পরিবার ও নবাববাড়ি বর্তমান সময়ে উপস্থিত করেছেন। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তুলে এনেছেন অনেক অজানা তথ্য। এবং ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের দাবিও জানিয়েছেন।

'বাঙালির ইতিহাস চেতনা বড় ক্ষীণ' বলে আক্ষেপ করেছেন ইলিয়াসও। অনেক পরে তাঁর এই আক্ষেপ মহাস্থানগড় নিয়ে ব্যবস্থাপক-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। মহাস্থানগড়ে হাজার বছরের পুরনো পুণ্ড্রনগরী, তার সঙ্গে বিশাল সভ্যতা, মানুষ-শিক্ষা-রাজনীতির হারিয়ে যাওয়া পর্ব, যে রকম উপেক্ষা ও অযত্নের শিকার হয়েছে তার ভয়াবহতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের খুব উদ্বেগ দেখা যায় না। মৃত্যুর কিছু আগে ইলিয়াস মহাস্থানগড়ের এই অবস্থা নিয়ে একটি বিবৃতি খসড়া করেছিলেন লেখক শিবির থেকে সেটি নিয়ে আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহের পরিকল্পনাও করেছিলাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই বিবৃতির কপিটি আর পাওয়া যায়নি।

শাসকশ্রেণির নানা অংশের নানা রূপ, কিন্তু তার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকবেই। এখানে বলা দরকার যে, এই যোগসূত্র, আপাতদৃষ্টিতে যাকে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী মনে হয়, সেগুলোকে এক অভিন্ন শ্রেণি কাঠামোয় গ্রথিত করে। শাসকশ্রেণি বলতে শুধু ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকেই বোঝায় না, বোঝায় এমন সব সামাজিক শক্তি যেগুলো শাসন শোষণ ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার ওপর টিকে থাকে, স্ফীত হয় এবং সুবিধাভোগী হিসেবে যে শক্তিগুলো দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যসূত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকে এই ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার জন্য, তাদের চোখ-বুদ্ধি-জ্ঞান-দক্ষতা-দেশপ্রেম সবই নিয়োজিত থাকে এই বৃত্তের মধ্যে। এই গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে বড় ব্যবসায়ী, মালিক, লুটেরা টাউট লম্পটরা তো আছেই, আছে 'ভদ্রলোকেরা' ও সামরিক-বেসামরিক আমলা লেখক বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞ এবং ফাঁপাফোলা উচ্চ ও মধ্যবিত্তের নানা অংশ। এই শ্রেণির নানা অংশকে নির্মম বিশ্লেষণে উন্মোচন করা ইলিয়াস যেন একটি বিশেষ কাজ বলেই ধরেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি চিঠিপত্রেও এই নির্মম বিশ্লেষণ কারও মনোযোগ বা গাত্র এড়িয়ে যেতে পারে না।

এই উন্মোচন নির্মম মনে হবার কারণ—এসব শ্রেণিগোষ্ঠী বিশেষত তার 'ভদ্রলোক' অংশ এতসব পোশাকে আবৃত এবং এতসব আড়াল দ্বারা নানাবর্ণের অধিকারী যে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখতে গেলে তাদের ওপর সাটানো অনেকগুলো পর্দা কিংবা মুখোশ সরাতে হয়—টেনে হিঁচড়ে সেগুলো না সরালে ঝুঁকি থাকে আবারও সেগুলো সেঁটে যাবার। এদের যাবতীয় মিথ্যাচার, প্রতারণা, ভণিতা-ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ এমনকি মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। আর এই সবকিছু সব রকম হিংস্র শক্তি নিয়ে কেন্দ্রীভূত থাকে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে।

পাকিস্তানসহ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় স্বৈরশাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন আকারে উপস্থিত থেকেছে। ইলিয়াস তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালে, পেছনে, বর্তমানে এই স্বৈরশাসনের চাপে পিষ্ট-অনুভূতি নিয়ে হাঁসফাঁস করেছেন। 'আমি ও আমার সময়' বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> 'কৈশোর পার হচ্ছি তখন, সদ্য কলেজে ঢুকেছি, ঐ যে সেনাবাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম, সারাটা যৌবনকাল চলে গেল তারই সাঁড়াশির ভেতর, আজও তা থেকে রেহাই মিলল না। মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে, যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ যে পক্বকেশ প্রৌঢ়, তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা দেশের মানুষের মতো হতে পারে?'

কিন্তু এই সাঁড়াশিই তো জগতের শেষ কথা নয়। সাঁড়াশির চাপে আটকে থাকা সেই মানুষই তো এই সাঁড়াশি ভেঙেচুরে দাঁড়িয়েছে। এই দিকটা না দেখলে, দেখার ক্ষমতা অর্জন না করলে ইলিয়াস *চিলেকোঠার সেপাই* লিখতে পারতেন না নিশ্চিত। বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নির্যাতনই যদি সেই সময়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করি তবে ১৯৬৯ সালের বিদ্রোহকে ঠাঁই দিই কোথায়?' কিন্তু আবার এটাও তো প্রশ্ন যে, এসবের মধ্য দিয়ে যাদের নেতৃত্ব বহাল হয়েছিল তারা কারা? 'ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে, রক্ত দিয়ে কার্ফু ধুয়ে মানুষ যাদের ছিনিয়ে আনে; বেরিয়ে এসে তারা তৎপর হয় আন্দোলনকে নেতিয়ে দেওয়ার কাজে...।' '১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ দিয়ে আঁকা' সময় পেরিয়ে যে বাংলাদেশ আসে সেখানেও দুর্ভিক্ষ তুমুল। প্রশ্ন থাকে: 'কোনটা ঠিক? স্বাধীনতা? না দুর্ভিক্ষ ও রাজ-রাজড়ার বিয়ে সোনার মুকুট দিয়ে?' এরপরও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এবং এর অংশ হিসেবেই তো আসে সামরিক শাসন। আবারও, বারবার।

সামরিক শাসন তো শুধু সামরিক বাহিনীর ব্যাপার নয়। সমগ্র সুবিধাভোগী অধিপতি শ্রেণির স্বার্থের ব্যাপার। সামরিক বাহিনী সামনে থাকলে তাদের পুরো কাজকর্মে সুবিধা। এরমধ্যে বাণিজ্যচক্রের মতো দফায় দফায় 'গণতন্ত্রী এমনকি কতিপয় বিপ্লবীর মুখ খুলে পড়ে, তারা ডিগবাজি খায় এবং সামরিক শাসকদের পদধূলি নিয়ে ধন্য হয়। সামরিক শাসন যখন আসে তখন প্রথমে শুরু হয় মানুষের ওপর তাদের চোটপাট; তারপর একসময় মালিক হুজুরের আরেক হুকুম হয়—'ঠ্যাঙাড়েরা তখন ট্যাঙ্কের ওপর বসে গণতন্ত্র বিলি করে'। আর সেই সময়ে,

'আমার প্রথম যৌবনে সমাজকাঠামো বদলে দেয়ার জন্য যাদের হাঁকডাক শুনে মহামানব বলে গণ্য করেছি, আজ মালপানি আর ডাণ্ডার ভাগ নেওয়ার লোভে তারাই আবার নিজেদের মুণ্ডু থেকে ল্যাজ পর্যন্ত বিক্রি করে দিলো ঠ্যাঙাড়েদের কাছে। তাদের যে জিভ আগুনের শিখা হয়ে ধকধক করে জ্বলত আজ তাই আবার লোমচাঁছা ল্যাজ হয়ে নড়াচড়া করে মালিক-হুজুরের স্তুতিতে।'

এই অবস্থায় এই বিশ্বাসঘাতকতা আর নিপীড়নের মধ্যে থেকেই আকার বিন্দু তৈরি হয়, মানুষের লড়াইয়ের মধ্যে। সেই আশাই 'তোতলা কলম' দিয়ে 'তাই একটু' আধটু লিখতে অনুপ্রাণিত করে ইলিয়াসকে। ইলিয়াস সেই প্রেরণা তাঁর লেখার সর্বত্র ছড়িয়ে দেন, নির্মম বিশ্লেষণের ছোঁয়ায়।

১৯৮৯ সালে ইলিয়াস লিখেছিলেন 'সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকার'-এর 'রাষ্টপ্রভুর সচিবালয়' থেকে প্রেরিত 'একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি'। এটি হচ্ছে চোখে দেখা আপাতবাস্তবতাকে ধুয়ে মুছে, আড়াল সরিয়ে, প্রকৃত বাস্তবতাকে পরিষ্কার চিত্রে উপস্থিত করা। এটি শক্তিশালী বিশ্লেষণ, অসাধারণ ব্যঙ্গ এবং সজোর চপেটাঘাতসমৃদ্ধ একটি লেখা।

ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ইত্যাদি সম্পর্কে সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকর্ম প্রত্যক্ষ সেনাশাসন শেষ হবার পরও যে কোনো অংশে পরিবর্তন হয়নি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাষ্ট্রপ্রভু তাঁর প্রজ্ঞাপনে জানাচ্ছেন,

'আমাদের মতো অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশের যথাযথ উন্নয়ন ও কল্যাণে শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার হলো ধর্ম। ধর্মমাত্রেই অত্যন্ত টেকসই অস্ত্র এবং ধারাবাহিক, বিচিত্র ও বহু ব্যবহারে এর ধার বাড়ে বই কমে না।... মানুষকে সকল জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি, প্রতিবাদের স্পৃহা থেকে মুক্তি এবং প্রতিরোধের সাহস থেকে মুক্তি দিয়ে মানবজীবন থেকে তার পরম মুক্তিলাভের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হলো ধর্ম। নব্বই দশকের স্লোগান স্থির করা হয়েছে ধর্মেই মুক্তি, আর নয় যুক্তি।

'বিজ্ঞান বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রভু' বিরক্তি প্রকাশ করছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো,

যেগুলো 'দাতাদেশ' বলে পরিচিত, তাদের পদাঘাত সেবনে কারও কারও অরুচি—দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, এমনকি নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' সেজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতি রাষ্ট্রপ্রভু আদেশ দিচ্ছেন যেন 'সহজবশ্য ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা অত্যন্ত জরুরিভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রভুর কাছে জমা দেয়া হয়। তাছাড়া এদেশে মেরুদণ্ড সোজা করে রাখা উন্নয়ন বা চলাফেরা সকল কাজেই অসুবিধাজনক বলে রাষ্ট্রপ্রভু জানিয়েছেন। সুতরাং মেরুদণ্ড যাতে ঋজু না হতে পারে সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রভু এটা দেখে সন্তুষ্ট যে, 'শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনিক তৎপরতায় লিপ্ত কয়েকজন যথার্থই বক্রমেরুদণ্ডী প্রাণী। মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু থেকে শুরু করে মাননীয় মন্ত্রী, উপ-মাননীয় নিম্নমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের পদলেহনে নিয়োজিত এই নধর মনীষীগণ মেরুদণ্ডের উৎপাতমুক্ত হওয়ায় নানা অঙ্গে নানা ভঙ্গিতে এই কর্ম সমাপনে দক্ষ।'

এই ধাঁচের শিক্ষাবিদরাই তো, বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্র প্রশাসনের জন্য এখনো আদর্শ। এই অবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ স্বাধীনচেতা বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর বিলোপসাধনের ব্যবস্থাও নিয়েছেন রাষ্ট্রপ্রভু। এবং 'স্বাধীনচেতা' 'বেয়াদব' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহী' শব্দাবলী সমার্থক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই লেখাটি যখন লিখছি তার কিছুদিন আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, যিনি কয়েক মাস আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ, একটি অধ্যাদেশে সই করেছেন। অধ্যাদেশটির নাম 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ'। এর মূল কথা হলো গত ১৭ অক্টোবর, ২০০২ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত বিভিন্ন বাহিনী সন্ত্রাস দমনের জন্য নির্যাতন, হয়রানি এমনকি হত্যা যা কিছু করেছে, তার জন্য কোনো প্রশ্ন কেউ তুলতে পারবে না, এসবের কোনো তদন্ত বা বিচার হবে না। অচিন্তনীয় হলেও এটা গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের নামেই হয়েছে। খুন নির্যাতন যথেচ্ছাচারের বিচার না হবার আইনে যিনি স্বাক্ষর করতে পারেন তেমন মেরুদণ্ডের উৎপাতমুক্ত শিক্ষাবিদদেরই তো এই রাষ্ট্রের দরকার!

খুনিদের রক্ষার জন্য এ রকম ইনডেমনিটি আইন এটাই প্রথম নয়। সাধারণভাবে বলা যায় এটি দ্বিতীয়, প্রথম ধরা হয় ১৯৭৫-এর শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের পর যে ইনডেমনিটি আইন করা হয়েছিল সেটিকে। আসলে বর্তমান দায়মুক্তি অধ্যাদেশটিকে তৃতীয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যদি আমরা সাধারণ ক্ষমা আইনকে এই কাতারে উপস্থিত করি। ১৯৭৩ সালে ঘোষিত এই সাধারণ ক্ষমা আসলে ১৯৭১-এ লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যার পথ ধরে এই যুদ্ধাপরাধীরা এখন, ইলিয়াসের ভাষায়, যে শুধু 'বিস্তৃত প্রজাতন্ত্রে সলাঙ্গুল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে' তাই নয়, ক্ষমতারও অংশীদার হয়েছে। 'এই শাসকদের' 'আইনের শাসন', 'ইসলামি মূল্যবোধ', 'গণতন্ত্র' এবং 'উচ্চ নৈতিকতার' ফসল হলো খুনি অপরাধীদের রক্ষার জন্য প্রকাশ্যে আইন ঘোষণা করা। ইলিয়াস এ সময় উপস্থিত থাকলে কী বলতেন অনুমান করতে পারি। কেননা, শেখ মুজিব হত্যার বিচারের ওপর যে ইনডেমনিটি ছিল সে সম্পর্কে ইলিয়াস বলেছিলেন, যতদিন এ ধরনের আইন একটি দেশে থাকে ততদিন সে দেশের পতাকায় থাকা উচিত কঙ্কালের ছবি। কেননা নরখাদকদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে খুনিদের দায়মুক্তি আইন থাকতে পারে না।

ইলিয়াসের সাংগঠনিক-সামাজিক তৎপরতা ছিল প্রধানত বাঙলাদেশ লেখক শিবির-এর মাধ্যমে। ১৯৮৪ সালে তিনি এই সংগঠনের সদস্য হন। প্রথম প্রস্তাবেই তিনি যেভাবে এর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে রাজি হয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এ রকম একটি সংগঠনের সদস্য হবার জন্য সবদিক থেকে তখন প্রস্তুত শুধু নন, উন্মুখও বটে।

ইলিয়াস সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিল, তিনি কোনো সংগঠনের সদস্য হবার মতো মানুষ নন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্রকে দেখে, ব্যবচ্ছেদ করে, একটি হাসি ঠাট্টার ভঙ্গিতে এর গভীর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে এবং দেখতে না পেয়ে, মানুষের ওপর অমানুষের প্রভুত্বের নানারূপ দেখে এবং এর থেকে মুক্ত হবার

আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, মানুষের ভেতরকার অসীম ক্ষমতার সন্ধান পেয়ে তিনি ততদিনে সামষ্টিক, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী কাজে নিয়োজিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সে কারণেই লেখক শিবিরের সদস্য হওয়া ছিল তার জন্য নিছক আনুষ্ঠানিকতা। সে সময় কয়েক দফা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক থাকার কারণে আমি এরপর থেকে তাঁর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

সাংগঠনিক তৎপরতায় তিনি পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন ১৯৮৭ সাল থেকে। সে সময় সংগঠনের সভাপতি ছিলেন হাসান আজিজুল হক। তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি।

সভাপতি রাজশাহীতে অবস্থান করার কারণে ইলিয়াস সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে নিজেই অনেক দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন। সমাজের একটি বিপ্লবী রূপান্তরের কাজ যে শুধু স্লোগান দিয়ে সম্ভব নয়, তার দৃঢ় পাটাতন তৈরির জন্য দরকার সাহিত্য এই ব্যাপারে তিনি খুব পরিষ্কার ছিলেন বলেই লেখক শিবির সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে মনোযোগ, গুরুত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি নতুন নতুন চিন্তা ও সক্রিয়তা যোগ করেছেন। এক হিসেবে বহু বিষয় কিংবা অন্য বিবেচনায় একই বিষয়ের বহু দিক নিয়ে আমরা একই সঙ্গে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হই। এর মধ্যে মার্কসবাদ ও সাহিত্য, বাংলাদেশের শিক্ষা, নারী ও সমাজতন্ত্র, নিউটন-ডারউইন-আইনস্টাইন, মুকুন্দ দাস-রমেশ শীল-গোবিন্দ দাস, নজরুল-জীবনানন্দ-লালন, সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বহু বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্কে, প্রকাশনায় আমরা হাত দিই। এ ছাড়া বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রান্তস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শেকড়-বাকড় অনুসন্ধান, মধ্যবিত্তের উদ্ভব বিকাশ ইত্যাদি বিষয়েও আমাদের কাজ চলতে থাকে।

সামরিক স্বৈরাচার পতনের পর লেখক-শিল্পীদের দিক থেকে সরব উচ্চারণের বিষয়গুলো সমন্বিত করা, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পীদের নিয়ে প্রতিরোধ তৈরির উদ্যোগও ছিল আমাদের। এই ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন *তৃণমূল*

প্রকাশনা ছিল এই কাজগুলো থেকে উদ্ভূত তাগিদেরই ফল। সাহিত্য সম্মেলনের ঘোষণা, তৃণমূল-এর সম্পাদকীয়সহ অন্যান্য সাংগঠনিক রচনাগুলোতে আমাদের এবং বিশেষত ইলিয়াসের চিন্তা, উদ্বেগ, আগ্রহ ও উদ্দীপনার দিকগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। বস্তুত এসব কাজের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা জগতের, ঔপনিবেশিক শ্রেণিগত-সাংস্কৃতিক দাসত্ববৃদ্ধির বিরুদ্ধে নতুন নির্মাণের জন্য এক সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'শিল্প সাহিত্য বিপ্লবকে দিক ভাষা আর বিপ্লব দেবে শিল্প সাহিত্যকে মুক্তি' এই বক্তব্যই ছিল ইলিয়াসের সক্রিয়, সৃজনশীল ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কাজের সার কথা।

মধ্যবিত্ত থেকে যে কর্মীরা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন তাদের সাধ এবং সাধ্য, আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেণিগত টানাপোড়েন, অঙ্গীকার এবং দোদুল্যমানতা, সাহস এবং ভয় ইত্যাদিকে জলজ্যান্ত মানুষের ভেতর দিয়ে দেখা ইলিয়াসের বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত কর্মীদের সংযুক্তি এবং সম্পৃক্তি একদিকে যেমনি অপরিহার্য, অন্যদিকে তেমনি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। শ্রেণিচ্যুতির একটি আওয়াজ আমাদের বিপ্লবী মহলে সবসময়ই শোনা যায় কিন্তু এর অর্থ আর আসল তাৎপর্য এখনো সম্ভবত অনেকের কাছে অস্পষ্ট। ফলে শ্রেণিচ্যুতির রোমান্টিক বাসনায় অনেকে নিজের অনেক ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো তাকে সেই জায়গায় আনতে পারেনি যা তাকে বিপ্লবী আন্দোলনে 'মহৎ' হিসেবে নয়, স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে যুক্ত করতে পারে। মেহনতি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বা আন্দোলন যে কোনো দয়ামায়ার ব্যাপার নয়, সমাজতন্ত্র বা একটি শোষণ-নিপীড়নমুক্ত সমাজ যে একটি কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার, খুব আড়ম্বরপূর্ণ আরোপিত নৈতিকতার প্রলেপ দেয়া বহিঃস্থ কিছু নয় সেটা নিশ্চিত না হওয়ায় সেই 'ত্যাগীরাই' এক সময়ে 'অনেক করেছি' বলে ফিরে আসে নিজ বৃত্তে।

ইলিয়াস এসব নিয়ে সমালোচনা উপস্থিত করেছেন বিভিন্নভাবে। তাঁর দুটো উপন্যাসেই এই সমালোচনা আছে। তা আছে মধ্যবিত্ত বামপন্থী কর্মী চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সেই পর্যবেক্ষণ ও

সমালোচনাই আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে। এসব সমালোচনায় মধ্যবিত্ত কর্মীর সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের দূরত্বের জায়গা এবং মধ্যবিত্ত কর্মীর ভনিতার কৃত্রিম জগৎ শনাক্ত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। এরমধ্যে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

প্রথমত, তিনি বলছেন যে, শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিচর্চা যেহেতু তাদের জীবন জীবিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, সেজন্য এগুলো আলাদা করে প্রথা অনুযায়ী উপরি কাঠামোতে নিয়ে আসা কঠিন। কৃষক বা মজুরের হাল-কাস্তে-বৈঠা-যন্ত্র-গলুই-ফলা-ঢেঁকি-নকশা ইত্যাদি সবই তাঁর উৎপাদন উপকরণ, একই সঙ্গে সংস্কৃতি। সুতরাং তার 'সংস্কৃতিহীনতা' সম্পর্কে মধ্যবিত্তের ধারণা কিংবা বানানো বাইরের সংস্কৃতি দিয়ে তাঁকে সচেতন বা উন্নত করবার চেষ্টা নিরর্থক এবং অপরাধ। এই নিরর্থক এবং অপমানজনক কাজেই অনেক মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কর্মী এখনো নিয়োজিত।

দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাষা, উচ্চ বা মধ্যবিত্তের মুখের ভাষা থেকে অনেক ভিন্ন। এই ভিন্নতা আঞ্চলিক ভাষা এবং শুদ্ধ ভাষায় বলা থেকে হয় না। এখন মধ্যবিত্তের বড় অংশ আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলেন বেশি। আসল পার্থক্য সৃষ্টি হয় দুই ভাষার অন্তর্গত শেকড় জীবনবোধ-জীবিকা তার সাহিত্য সংস্কৃতির যুক্ততার কারণে। এই দূরত্ব অতিক্রম করা নিছক ভাষায় কারিগরি পরিবর্তন করে বা কিছু চমক লাগানো আঞ্চলিক বা ধর্মীয় শব্দ যোগ করে সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার সেই ভাষা যে জীবন-সংস্কৃতি-ক্ষমতা-অক্ষমতা-ইতিহাসনির্ভর তাকে জানা। সে দূরত্ব মোচন তাই মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক।

তৃতীয়ত, রাজনীতিবিদদের কাছে শ্রমজীবী নারী পুরুষের অবস্থান কী? মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের কাছে তাদের পরিচয় কী? ইলিয়াস বলছেন, পার্লামেন্টারি রাজনীতি যারা করেন, তাদের কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় ভোটার হিসেবে। ছলে-বলে কৌশলে ভোটটি আদায় করতে পারলে পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ চূড়ান্তভাবে সফল। আর বামপন্থী রাজনীতিবিদদের কাছে, মানে যাদের রাজনীতি সংসদীয় পথ থেকে ভিন্ন,

জনগণের পরিচয় কী? তাদের কাছে শ্রমজীবী মানুষ হলো 'আন্দোলনের হাতিয়ার'।

ইলিয়াস এই কথা বলে আমাদের সামনে হাজির করেন এক অতিকায় প্রশ্ন। এই কথা তো লেখক-শিল্পীদের বেলাতেও বলা চলে-একাংশের কাছে জনগণ ভোক্তা বা বাজারের উপাদান, আরেক দলের কাছে তার নির্মাণের উপাদান। তবে ইলিয়াস কীভাবে দেখতে চান জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক বা সংস্কৃতিক কর্মী বা এমনকি লেখক-শিল্পীদের সম্পর্ককে? জনগণ কী হবে তবে? ইলিয়াস বলেন, 'মানুষ কেবল উপাদান নয়, শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের নির্মাতা।' সেই মানুষের নির্মাণের কিংবা সৃজনশীলতার যথাযথ উপলব্ধিই কেবল বদ+লে দিতে পারে মধ্যবিত্ত কর্মীকে, লেখক-শিল্পীকে; তাঁকে নিয়ে যেতে পারে অসাধারণ ক্ষমতার প্রাঙ্গণে। সেই প্রাঙ্গণ থেকেই আমরা ইলিয়াসের কণ্ঠ শুনি।

২১ জানুয়ারি ২০০৩

আক্রান্ত লেখক ও জরুরি কিছু প্রশ্ন

হুমায়ূন আজাদের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করায়। সরলরৈখিক উত্তর কারণও খুঁজতে দেয়না, পথ অনুসন্ধানও কঠিন হয়ে পড়ে। সুবিধা হয় আক্রমণকারীদের দুর্বৃত্ত ক্ষমতারই। এখানে তাই এগুলো নিয়েই জরুরি কিছু বিষয় উত্থাপন করছি।

কারা আক্রমণকারী?

দশ বছর আগে ব্লাসফেমি আইন প্রচলনের চেষ্টা ও সারা দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী উন্মাদনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ঢাকায় যখন আমরা লেখক শিল্পীদের সভা-সমাবেশ করছি সেবছরই এদেশ থেকে বেশ দূরে কিন্তু অনেক দিক থেকে কাছে মিশরে, নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী, মিশরীয় লেখক নগীব মাহফুজ শারীরিক আক্রমণের শিকার হন। তার ওপর একজন হামলা করেছিল ছোরা দিয়ে, আঘাত করেছিল ঘাড়ে। সেই আঘাত তাঁর জীবননাশ করতে পারেনি বটে কিন্তু তিনি আর হাতে লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি পরাজিত হতে রাজি হননি। এখন অনুলিখনের মাধ্যমে তাঁর লেখা তৈরি হয়। আক্রমণকারী ধরা পড়েছিল। পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছিল, এক ইসলামী গ্রুপের সদস্য। আক্রমণকারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন এই আক্রমণ? কেন তার এই ক্রোধ? মাহফুজের কোনো লেখা পড়ে তার এই হিংস্রতা? উত্তর ছিল সে কোনো লেখা পড়েনি। ধর্মীয় নেতাদের ওয়াজ শুনে শুনে সে এই লেখককে আক্রমণের চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হুমায়ুন আজাদকে কে আক্রমণ করেছে? এরকম কেউ যে শুনেই হিংস্র হয়ে উঠেছে না কি আরও কোন বড় খেলার গুটি কেউ?

হুমায়ূন আজাদ যখন আক্রান্ত হন তখন তিনি বইমেলা থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। বইমেলা লেখক-পাঠকদের যোগাযোগের একটি বিশাল কেন্দ্র। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার, মতের ভিন্নতার, বিভিন্ন মতের সম্মিলনের বার্ষিক আয়োজন। এরকম একটি জায়গা উন্মুক্ত একটা বোধ আনে, সৃজনশীলতার বিশাল আয়োজনে নানা শ্রমনিষ্ঠ উদ্যোগের সামনে অন্য অনেক ক্ষুদ্রতা নীচতা মুখ লুকিয়ে থাকে। এই মেলা থেকে বেরুবার সময় নানাসৃষ্টির খবর কিংবা নতুন সৃষ্টির চিন্তাতেই একজন লেখক বা পাঠকের মন ভরে থাকে। হুমায়ূন আজাদ সক্রিয়-মস্তিষ্কের ব্যক্তি। সক্রিয় একজন লেখক। বইমেলা থেকে ফিরবার সময় তাঁর চিন্তাতেও তাই চিন্তার বই আকারে প্রকাশের আনন্দ কিংবা নতুন চিন্তার আনাগোনা থাকবার কথা। এসময়ই নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক কতিপয় দুর্বৃত্তের ভয়ংকর আঘাত পড়ে হুমায়ুনের ওপর। এই আঘাত অপরিচিত নয়। এই আঘাত অসহিষ্ণুতার, আধিপত্যের, ফ্যাসিবাদের। এটা কি শুরু এটা কি শেষ? না, এটা শুরুও নয়, শেষও নয়। কারা তারা? রাষ্ট্র কি তাদের ধরবে, বিচার করবে? করবে না। কেন, সেটাই জরুরি প্রশ্ন।

অনেকে বলেন, কেন তিনি ঐদিন রাতে একা একা হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন? তাঁর বাড়ি বইমেলা থেকে বেশি দূরে নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর আবাস। লেখকের জন্য বইমেলার চাইতে নিরাপদ জায়গা আর কী হতে পারে? শিক্ষকের জন্য তাঁর শিক্ষাঙ্গনের চাইতে ভরসার আর কী হতে পারে? আর তাই লেখক-শিক্ষক বইমেলা আর শিক্ষাঙ্গনকে নিজের জন্য নিরাপদ না ভাবলে আর কোন জায়গাকে ভাববেন? লেখক-শিক্ষকেরা তো ব্যাংকডাকাত কোটিপতি, গডফাদার মন্ত্রী এমপিদের মতো মাস্তান-পাহারাদার নিয়ে ঘুরতে পারেন না, যারা অপকর্ম করে করে দুনিয়ার সকলকে নিরাপত্তাহীন করে নিজেরাও এক এক চলমান দুর্গের মধ্যে বসবাস করেন।

হুমায়ূন আজাদ তাই স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে হেঁটে ফিরছিলেন। তাঁর হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি কাউকে চাপাতি বা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কখনো আঘাতও করেননি। তিনি লিখেছেন, বলেছেন। নিজের ভাবনা, উদ্বেগ, চিন্তা, বিশ্লেষণ তিনি প্রকাশ করেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প

উপন্যাসে। কোন গোপন তৎপরতা, ভনিতা কিংবা কপটতার অভিযোগ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে তুলতে পারবে না। তাঁর মত স্পষ্ট ছিল, প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা বা জনপ্রিয় মত ইত্যাদির সঙ্গে তাল মেলানোর কিংবা নানাভাবে ক্ষমতার কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণের প্রবণতা তাঁর কখনোই দেখা যায়নি। সেকারণে হুমায়ুনকে বোঝা সহজ। তাঁর আড়াল কম। তাই তাঁর সঙ্গে কোথায় আমাদের অমিল তা আমরা সনাক্ত করতে পারি।

আমি নিজে তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত নই। ধর্ম, মৌলবাদ, নারী ইত্যাদি তিনি যেভাবে দেখেন, যেভাবে বলেন, আমার বিবেচনায় তার মধ্যে সমস্যা আছে, অনেক বিতর্কের সুযোগ আছে। কদিন আগে তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে তাঁর এবং সমরেশ মজুমদারের মন্তব্য নিয়ে আমি কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলাম। শুনেছি, তিনি তসলিমা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের ভুল স্বীকার করেছিলেন। আফগানিস্তান নিয়ে তাঁর অবস্থানের সঙ্গেও আমি একমত নই। তাঁর তালিবান পাঠে তালিবান শাসনের ঐতিহাসিকতা ও জন্মকাহিনি, তার নাড়ির যোগ পাওয়া যায়না। কিন্তু গোড়া বুঝতে গেলে এই যোগসূত্র চিহ্নিত করাই জরুরি কাজ।

বাংলাদেশ যখন গুপ্তঘাতকদের রাজ্য

বিভিন্ন ধরনে বিভিন্ন লড়াই হয়। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রই যুৎসই, এটা নিয়ে কেউ আপত্তি করবে না। আবার মতের বিরুদ্ধে মত, লেখার বিরুদ্ধে লেখা, চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তা, বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে বিশ্লেষণই কেবল তৈরি করতে পারে এক সমৃদ্ধ জগৎ। কিন্তু ক্ষমতাবানদের জন্য এসব যুক্তি চলে না। কেননা আমাদের মতো সমাজে যারা ক্ষমতাবান, মানুষের স্বপ্ন ও সম্পদ লুণ্ঠন করে যারা বীভৎস ধনী ও কর্তৃত্ববান, যারা ধর্মের বর্ম দিয়ে জগতে একটি চিন্তার একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে চায় কিংবা যারা একক জাতি বা বর্ণ বা ধর্ম-এর বাইরে কোন কিছু স্বীকার করতে নারাজ তারা যুক্তি আর বিশ্লেষণের সামনে এসে কুঁচকে যায়। যুক্তির আলো, বিতর্কের সৌর্য, প্রশ্নের শক্তি তাদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তাই এদের সকলের দরকার হয় বলপ্রয়োগ। নিবর্তনমূলক আইন, রাষ্ট্রীয় নানা বাহিনী, সামরিক শাসনসহ নানাবর্ণের স্বৈরশাসন, লাঠিয়াল বাহিনী, তথ্য

বিকৃতি বা গায়েব, মাস্তান, ফতোয়া, অস্ত্র-চাপাতি-বোমা, হামলা, দমন, পীড়ন, শৃঙ্খল এসব তাই তাদের ভাষা, তাদের 'গণমুখী' বা 'গণতান্ত্রিক' বা 'ধর্মীয়' শাসনের বা কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট। ফ্যাসিবাদী দর্শন তাই এদের ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের অপরিহার্য সহযোগী। এদের জন্যই বাংলাদেশ আজ গুপ্তঘাতকদের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এখন ভাড়াটিয়া বা শূন্যমস্তিষ্ক হিংস্র সৈনিকদের দখলে। খুন ও সন্ত্রাস হয়ে উঠেছে লাভজনক পেশা। পেশাদার খুনী কিংবা হিংস্রতার মতাদর্শে দীক্ষিত লোকজন এখন সদম্ভে বিরাজ করছে চারদিকে।

হুমায়ুন আজাদকে এদের মধ্যে কারা আঘাত করেছে? কাদের জন্য হুমায়ুন হুমকি হয়ে উঠেছিলেন? কারা তাঁর যুক্তির সামনে দাঁড়াতে না পেরে তাঁর মাথাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হিংস্র হয়ে উঠেছিল? কিংবা কারা হুমায়ুনকে আঘাত করে বাংলাদেশে ক্ষমতার খেলা খেলছে? যারা তাঁকে আঘাত করেছে, খুবই সম্ভব যে তারা ভাড়াটিয়া কিংবা গুটি। কারা এর পেছনে? কোনো দিন কি জানা যাবে তাদের পরিচয়? ঘটনার পর পরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন এর পেছনে আছে আওয়ামী লীগ। তাঁর দায়িত্ব নিতে হবে এই বিবৃতির। কোন তদন্ত ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী যখন এই কথা বলে দিয়েছেন তখন আমরা এটা আশা করতে পারি যে, তাঁর কাছে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। তাই জনগণের জানার অধিকার আছে পূর্ণ তথ্য। আমরা শাসকদের গতিপ্রকৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারি এর সপক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ আমরা পাবো না। জনগণ তাদের কাছে গরু গাধার চাইতে বেশি কিছু নয়, যারা যা বলা হবে তাই শুনবে কিংবা যাদের চোখেমুখে ঠুলি পরিয়ে যে কোন কাজ করা সম্ভব।

আক্রান্ত লেখক শিল্পী

গত কয়েক বছরে অনেকগুলো বোমা হামলা হয়েছে। কিছুই বাদ যায়নি— যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান, ঢাকায় সিপিবির জমায়েত, রমনা বটমূলের ১লা বৈশাখ, বানিয়ারচরে গীর্জার প্রার্থনা, খুলনা ও ঢাকায় আহমদিয়া মসজিদের জামাত, সাতক্ষীরায় গুড়পুকুরের মেলা, সিলেটে মাজারের ওরশ, ময়মনসিংহে সিনেমা হলের প্রদর্শনী। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঘটনার পরপরই আমরা শুনেছি এগুলো ঘটিয়েছে 'মৌলবাদী'

গোষ্ঠী কিংবা বিএনপি। আর বিএনপি-জামাত আমলে তৎক্ষণাৎ শুনছি এগুলো ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু সবগুলোতেই তদন্ত, সেই সেই অপরাধীদের সনাক্ত ও বিচার করবার ব্যাপারে সরকারের নিস্পৃহতাও দেখেছি একইরকম। এবারেও ঘটনা ভিন্ন নয়। তাহলে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে কারা? যারা ঘটাচ্ছে তারা কি সরকারের এত চেনা, যে তাদের স্পর্শ করা সম্ভব নয়? নাকি এই ঘটনা যারা ঘটায় তাদের জিইয়ে রাখাটাই ক্ষমতার জন্য আবশ্যক?

হুমায়ুন আজাদের লেখা নিয়ে ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী গত কিছুদিন ধরেই হিংস্র হাঁকডাক দিচ্ছিলো। মুরতাদ ঘোষণা, লেখা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। এরকম হাঁকডাক নতুন নয়। আহমদ শরীফ, শামসুর রাহমান, তসলিমা নাসরিনসহ অনেকেই এই সারিতে আছেন। তসলিমার লেখা নিয়ে কোন বিতর্কে না গিয়ে এরাই সারা দেশে যে উন্মাদনা তৈরি করেছিল তাতে তসলিমাও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আরও আক্রান্ত হতে পারতেন। বইমেলায় তাঁর ওপর হামলা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল, এখন তিনি দেশছাড়া। তসলিমার লেখা বন্ধ হয়নি। কিন্তু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা দমবন্ধ পরিবেশ। হুমায়ুনের লেখা নিয়েও এরা কোন বিতর্কে বা আলোচনায় যেতে রাজি নয়। লেখার বিরুদ্ধে তাদের লেখা নিয়ে তারা এগুতে পারে না, মতের বিরুদ্ধে মত নিয়েও তারা দাঁড়াতে পারে না। আছে তলোয়ার আর ধর্ম নিয়ে হিংস্র উন্মাদনা, ব্লাসফেমি আইনের হুংকার, রাষ্ট্রের দমনপীড়নের যন্ত্রপাতি আইনকানুন।

দমনপীড়নের পক্ষে যে চিন্তা ও রাজনীতি

এই গোষ্ঠীগুলি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়েছে গত তিনদশকে শাসকগোষ্ঠীর নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য বর্ম হিসেবে ধর্ম ব্যবহারের নানা কৌশলে। এখন এরা নিজেরা এজেন্ডা হাজির করা এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা রাখে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এসব গোষ্ঠীর নিজ নিজ ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। সে অনুযায়ী শাসন নিশ্চিত করবার জন্য তারা অন্যকোন ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। তাদরে ব্যাখ্যাই আল্লাহ্‌র আইন আর সব মানুষের। মানুষের আইন, চিন্তা, দর্শন, বিশ্লেষণ ও বিধিব্যবস্থার তারা বিরোধী,

আল্লাহ্‌র নামে তারা সেইসব বিধিব্যবস্থার পক্ষে যা মানুষের জন্য ভয়ংকর। অন্য ধর্মাবলম্বী, ধর্মে অবিশ্বাসী, সংশয়ী এমনকি উদারপন্থী ধ্যান ধারণার জন্য অনেকেই এদের দ্বারা বিভিন্নভাবে দেশের বিভিন্নস্থানে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ধর্মে ঘোর বিশ্বাসী হয়েও ভিন্ন তরিকার কারণে কিংবা স্বার্থগত কারণে কতজনে আক্রান্ত তার হিসেব নেই। এসব গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত সংঘাতও এখন ক্রমবর্ধমান। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করা এখন অধিকাংশ ধর্মীয় দল ও গোষ্ঠীর প্রধান মনোযোগের বিষয়। এদের অধিকাংশের ওয়াজ, প্রকাশনা ও ধর্মীয় প্রচারে নারীবিদ্বেষ প্রবল, অন্যধর্ম ও মতের প্রতি তারা মারমুখী, বামপন্থী ও প্রগতিশীল নানা চেষ্টার বিনাশকামী।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে এরকম ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, হুমায়ুন আজাদকে এই গোষ্ঠীগুলোর কোনো একটি হামলা চালিয়েছে। নিজেদের হিংস্রতার তাগিদে হতে পারে কিংবা হতে পারে আরও বড় কোনো দুর্বৃত্তের হাতেরগুটি হিসেবে। দুই-এর সম্মিলিত রূপ হবার সম্ভাবনাই বেশি। এই হামলা থেকে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের কথা, যখন আল বদরসহ যুদ্ধাপরাধীরা লেখক-শিল্পী শিক্ষকদের বেছে বেছে হত্যা করেছিল। আরও মনে পড়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের দুই বছরের মাথায় এই যুদ্ধাপরাধীরা সাধারণ ক্ষমা পেয়েছিল, চার বছরের মাথায় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছিল এবং ক্রমান্বয় পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে মূলধারার রাজনীতির প্রভাবশালী অংশে পরিণত হয়েছে এবং আজ যুদ্ধাপরাধীরা রাষ্ট্রক্ষমতার অন্যতম প্রধান শরীক।

যেসব ধর্মীয় শক্তি (ধর্মীয় রাজনৈতিক দল, পীর, গোষ্ঠী) পাকিস্তান আমল থেকে এদেশে সামরিক শাসনসহ সবরকমের স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছে, এবং এদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে যারা সবরকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও চিন্তা চেতনা বিরোধী কাজ করেছে ধর্মকে ঝাণ্ডা হিসেবে ব্যবহার করে, তারা এখন অনেক শক্তিশালী এবং বিস্তৃত। এখন মাদ্রাসা মসজিদ শুধু নয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজ এবং পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

এনজিও ক্লিনিক ব্যাংক মন্ত্রণালয় সর্বত্রই তাদের প্রভাব ও বিস্তার ঘটেছে। ইসলামের এই ব্যাখ্যাকাররাই বাংলাদেশে দাপটে ইসলামের চেহারা নির্মাণ করেছে। জুলুম, বৈষম্য বা শোষণ বিরোধী সংগ্রামে সমর্থনদাতা হিসেবে ইসলামের ব্যাখ্যা এদেশে একটি রাজনৈতিক ধারা হিসেবে কখনোই স্থায়ীত্ব পায়নি, দাঁড়াতে পারেনি। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বিশাল ব্যতিক্রম মওলানা ভাসানী যিনি বামপন্থীদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন; শোষণ, পীড়ন, বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দেশের প্রধান ধর্মীয় নেতাদের কাছে তিনি খেতাব পেয়েছিলেন মুরতাদ ও ভারতের দালাল। দুঃখের বিষয়, তিনি একককই ছিলেন, কোন ধারা দাঁড় করাতে পারেননি।

মার্কিনী ধর্মযুদ্ধ ও বাংলাদেশে তার 'বিরোধী' দোস্ত

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন দখল অভিযানের বহুমাত্রা আছে। তার একটি হলো ইসলাম বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুংকার, মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টীয়-ইহুদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সহিংসতার বিস্তার। এই বিস্তার মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তো বটেই অন্যত্রও মুসলমানদের মধ্যে তার ধর্মীয় পরিচয়কেই প্রধান করে তুলেছে। মুসলিম জগতকে হীন করে দেখানোর ইহুদি-খ্রিষ্টীয় সাম্প্রদায়িক অভিযানের উত্তরে মুসলিম অহংকে চাঙ্গা করবার, মুসলিম ঐক্যের নিশান তোলার চেষ্টাও জোরদার হচ্ছে। এই চেষ্টায় তারাই নেতা যারা ইহুদি-খ্রিস্টান বিরোধী কিন্তু শেষবিচারে মানুষকে সামগ্রিকভাবে দেখতে অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক। মানুষের এবং অমানুষের পার্থক্য করতে অপারগ কিংবা অনিচ্ছুক বলে নিজ নিজ ধর্মের ধ্বনি তুলে সেই সেই ধর্মের প্রভু অমানুষদের আধিপত্যকেই তারা নিশ্চিত করে। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করবার এই বয়ান কিংবা এই বয়ানের আড়ালে শয়তানদের সম্মিলিত নৃত্যকে রক্ষা করবার দৃষ্টিভঙ্গী সারাবিশ্বের শাসক হিসেবে যারা আছে, মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদি-হিন্দু সবার জন্যই, বলাবাহুল্য, খুবই সুবিধাজনক হয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির ভয়ংকর চেহারা আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালে। তখনও এটা স্বাধীন সার্বভৌম কোন শক্তি ছিল না। এটি ক্রিয়াশীল ছিল

পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতি, সামরিক জান্তা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জালের একটি অংশ হিসেবে। এই রাজনীতি পরে বাংলাদেশে একইভাবে টিকে থেকেছে এবং বেড়ে উঠেছে শাসকদেরই প্রয়োজনে। ধর্মীয় রাজনীতির হুংকার তাই আমরা এখনও দেখছি নারীর বিরুদ্ধে, সকল গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে, মুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধে, ভিন্ন মত ও পথের বিরুদ্ধে। দেখছি এই রাজনীতি শুধু যে ধর্মের কাঠামোর বাইরের চিন্তাকে আক্রমণ করছে তাই নয়, আক্রমণ করছে এমনকি ধর্মের কাঠামোর ভেতরের ভিন্ন মত বা পথ বা তরিকাকেও। মারকাট এই রাজনীতিকে মৌলবাদ বললে ঠিকমতো বোঝানো যায় না। জামাতে ইসলামীসহ এই ঘরানার রাজনীতি আক্ষরিক অর্থে মৌলবাদীও নয়। এটা বুর্জোয়া রাজনীতিরই এক একটি ফ্যাসিবাদী রূপ। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজনে অনেক ধরনের পরিবর্তনই গ্রহণ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, বেতার-টিভিসহ প্রচার মাধ্যম, পোষাক সর্বত্রই তাদের অবস্থান উৎপত্তিকালীন ইসলাম ধর্মের কিংবা এমনকি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধর্মীয় নেতাদের স্বীকৃত অনেককিছু থেকে সরে এসেছে। অধিকাংশ ধর্মীয় নেতার চোখেই এখন ছবি তোলা জায়েজ, মাইক জায়েজ, টিভিতে যাওয়া জায়েজ, টিভি দেখা জায়েজ, কোন নির্দিষ্ট নারী নেতৃত্বে রাজনীতি জায়েজ, চিকিৎসকের চিকিৎসা জায়েজ, শেয়ারকেনা, ব্যাংক, বিনিয়োগ...। এসব পরিবর্তন অপরিহার্য। পুঁজিবাদের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতি কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বাংলাদেশে তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে। ধর্মীয় হুংকার তার অসহিষ্ণুতা তাই এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামন্তবাদী স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে না। ধর্মীয় নেতাদের অনেকের জীবনযাপন এখন লুটেরা কোটিপতিদের সাথেই তুল্য, গরীব মাদ্রাসা ছাত্র শিক্ষক ও হুজুরেরা তাদের জন্য সুলভে প্রাপ্য আরামদায়ক গুটি।

মৌলবাদ নয়, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ

'মৌলবাদ' শব্দটি এখন বিশ্বব্যাপী বিশেষ প্রচার পেয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব দখল অভিযানে মুসলিম-বিদ্বেষী সংস্কৃতি ব্যবহারের সর্বাত্মক আয়োজনে। 'ফান্ডামেন্টালিজম' বা 'মৌলবাদ' শব্দটি যদিও খ্রিস্টান গোঁড়া গোষ্ঠীকে নির্দেশ করবার জন্যই চালু হয়েছিল এখন বিশ্ব মিডিয়ার বদৌলতে 'মৌলবাদ' বলতে দাড়ি টুপী ও পাঞ্জাবি/আলখাল্লা

পরিহিত পুরুষ বা বোরখা পরিহিত নারীকে বোঝায়। চলতি কথায় 'মৌলবাদী' বলতে অসহিষ্ণু ধর্মীয় সন্ত্রাসী বোঝায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো মুসলিমপ্রধান দেশে দাড়ি টুপী খুবই সুলভ চেহারা, ধর্মবিশ্বাস বা চর্চা যে মাত্রাতেই থাকুক। নারীর বোরখা দিয়ে কোন একক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বোরখা গ্রহণ করবার বহু কারণ থাকতে পারে। কেউ বিশ্বাস থেকে, কেউ জোরজবরদস্তি থেকে, কেউ অভ্যাসে, কেউ আবার নিজেকে আড়াল করবার জন্য কিংবা আত্মরক্ষার জন্য, কেউ বা গ্রহণ করেন পোষাক হিসেবেই। তাছাড়া গোঁড়া ধার্মিক, যে ধর্মেরই হোক, মানেই অসহিষ্ণু সন্ত্রাসী নয়। অসহিষ্ণু সন্ত্রাসী কিংবা অন্য সকল মতের ওপর খড়গহস্ত যারা তারা আক্ষরিক অর্থে 'মৌলবাদী' নাও হতে পারেন।

মৌলবাদী বলতে বোঝায় যিনি ধর্মের উৎপত্তিকালীন বিধিব্যবস্থা এখনও প্রযোজ্য বলে মনে করেন। সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তন তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এরকম একজন ব্যক্তি তাঁর বিশ্বাস নিয়ে নিজে চর্চা করতে পারেন, এরকম সবাই যে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য সারাক্ষণ তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন তাও ঠিক নয়। সেকারণে ধর্মকে ভিত্তি করে যে রাজনীতি, যে হিংস্র অসহিষ্ণু মতাদর্শ এখন বিস্তার লাভ করেছে তাকে আমি মৌলবাদ বলার চাইতে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। আর এখানে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ বা রাজনীতি নিজে নিজে দাঁড়িয়ে নেই, এটি দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃহত্তর ফ্যাসিবাদী আধিপত্যের জমিনে। সারাবিশ্বে যা এখন খুবই বাড়ন্ত, যা ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-জাতি বৈষম্যের দর্শন ধারণ করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ যার বিশ্ব প্রতিপালক। সেকারণে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে উৎপাটন করবার উপায় নেই। পুরো জমিন না দেখতে পেলে এই চেষ্টা একটি চক্রাকার অবস্থার মধ্যে আটকে ফেলতে পারেই। বাংলাদেশই তার দৃষ্টান্ত।

তালিবানদের পুরোনো ও নতুন আশ্রয়

বিশ্বজুড়ে এখন এক তুমুল উত্তর আধুনিক 'চলুন ভাবি' 'আসুন বাহাস করি' 'চলুন নিজেরে হারায়ে খুঁজি' হৈ হট্টগোল-এর মধ্যে সবদেশে সব ধর্মীয় শক্তিগুলোই 'ঐতিহ্য' 'শেকড়' ইত্যাদির আড়ালে ভালোই

জায়গা পাচ্ছে। তথাকথিত 'পশ্চিম বিরোধী' অনেক বাহাসকারী ধর্মীয় রাজনীতিকে মহিমান্বিত করছেন আধুনিকতা বিরোধী বা পশ্চিমা বিরোধী বলে। এদের কাছে পশ্চিম মানে কিছু পোষাক, কিছু ভাষা, কিছু অঞ্চল। সংস্কৃতি তাদের কাছে স্বাধীন সার্বভৌম কিছু, যা অনড় এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এরা পশ্চিম বলে, বলতে ভয় পায় সাম্রাজ্যবাদ; আধুনিকতা বলে—পুঁজিবাদ বলতে ভয় পায়। শ্রেণি শব্দ তাদের কাছে ভয়ংকর, আঁতকে উঠার মতো। তার বদলে নানা পরিচয় দিয়ে ভেঙে ভেঙে কোথাও কিছু দাঁড়ায় না। সামগ্রিকতা তাদের কাছে দোষের। শত্রুর পরিচয় যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে মানুষই বা কী পরিচয়ে দাঁড়ায়? এদের কাছে সবাই শত্রু সবাই মিত্র। সংলাপ গোলটেবিল কনসালটেশন নেগোশিয়েশন। বর্তমান আর উত্তর আধুনিকতা একই জায়গায় এসে ধাক্কা খায় কিংবা কোলাকুলি করে। পুরোনো এবং নতুন আশ্রয় একাকার হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ শব্দগুলো এই ফ্যাশন জগতে অস্বস্তিকর কেননা তা এমন অনেক কিছু টানে যা তাদের বাহারের কথাগুলোকে ফাঁকা করে দেয়, এমনকি তাদের গোড়া ধরেও টান দেয়। তাদের পশ্চিম ব্যাখ্যা ভারতে বিজেপি-শিবসেনা, বাংলাদেশ-পাকিস্তানে জামাত ইত্যাদি, ইউরোপে খ্রিস্টান আর ইহুদিতন্ত্রকে বেশ জায়গা দেয়। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যবস্থা তাই এইরকম আরামদায়ক পশ্চিমবিরোধীদের পিঠ চাপড়ায়। তাই এদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাঙ্গন আর উন্নয়ন-অঙ্গনে এসবের নিত্যচাষ। এদের হট্টগোল আড়াল করে পশ্চিমের স্যুটপড়া সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বেদুইন আলখাল্লা পড়া সৌদ রাজতন্ত্রের অঙ্গে অঙ্গে খাতির। এই সর্বাঙ্গ খাতির আজকের নয়। জন্মই খাতিরের মধ্যে। এই ধারা ব্যাখ্যা করতে পারে না পশ্চিমে-অপশ্চিমের মুসলমান-অমুসলমান শাসকদের একীভূত দিলের কথা। ব্যাখ্যা করতে পারে না পশ্চিমে-অপশ্চিমের মুসলমান-অমুসলমান মানুষদের সম্মিলিত স্বপ্ন ও প্রতিরোধের কথা।

আফগানিস্তানে আজ মার্কিনীরা দখলের ছুতো হিসেবে তালিবান শাসনের ভয়াবহ রূপকে সামনে আনছে বারবার। মার্কিনীদের এই ভূমিকার

কারণেই আবার তালিবানদের পক্ষে কাছা মেরে লেগে যাওয়া দায়িত্বহীন নাবালকী ছাড়া কিছু নয়। এরকম লোকজনের কাছে, এই ইসলাম (ভারতে এই চিন্তার মানুষদের কাছে হিন্দুত্ব) পশ্চিমা আধুনিকতার সমালোচনা। কাজেই তালিবানদের তারা পশ্চিমা আধিপত্য বিরোধী লড়াই-এর সৈনিক হিসেবে ভাবেন। খুবই বিপদের কথা। তালিবানদের চিন্তা ও জগৎ ছোট করে দেখা উচিৎ নয়। তালিবানরা অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত এক মডেল, নারী এই জগতে কেবলই দাসী, শিক্ষা কাজ বাইরের জীবন তো প্রশ্নই উঠে না; সঙ্গীত-শিল্পকলা-চলচ্চিত্রসহ সৃজনশীলতা এখানে অচ্ছুৎ; হাজার বছরের পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়; ভাস্কর্য কেবলই মূর্তি; বিদ্যাচর্চার প্রশ্ন নেই, কেননা সৃষ্টিকর্তার নামে বিদ্যা সম্পূর্ণ, ক্ষমতা নিরঙ্কুশ; তাই মতভেদ মানে ভয়ংকর মৃত্যু ।

এগুলো দেখে আতংকিত না হবার কারণ নেই, কেননা বাংলাদেশ এরকম শক্তি এখন অনেক সংগঠিত যারা বাংলাদেশকেও এরকম একটি রাজ্যে পরিণত করবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এটাও উদ্বেগের বিষয় হয় যখন, হুমায়ুনের মতো পণ্ডিত সৃজনশীল লেখকও ভাবতে পারেন যে, এই তালিবানদের হাত থেকে মার্কিনীরা আফগানিস্তানকে মুক্ত করছে। এই ভাবনা ভুলেই যায় যে, তালিবানদের এই শাসন জারি হয়েছিল মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ মদদে এবং কোলেপিঠে করে বড় করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে মার্কিনীরাই। বাংলাদেশে তা ঘটবে না, ঘটছে না, কে বলতে পারে? আফগান জনগণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার যখন চেষ্টা করছিলেন তখন প্রথমে মুজাহিদীন আর পরে তালিবানদের দিয়ে সেই চেষ্টাকে গুড়িয়ে দিয়েছে মার্কিনীরাই। উপরের দুই দৃষ্টিভঙ্গীই সমগ্রের জাল দেখে না, তাই শেষবিচারে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী খেলার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

নাড়ির যোগ ঐতিহাসিকতা যারা খেয়াল করেননা তাঁদের কাছে মনে হয় মার্কিনী বোমা হামলা দিয়ে তালিবান ভয়ংকর শাসনের অবসান সম্ভব। কিংবা তালিবানদের দিয়ে মার্কিনী বর্বরতা রোখা সম্ভব। এগুলো এমন ভয়াবহ ভ্রান্তি যে, ভ্রান্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মনে করে 'মৌলবাদ' বা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে লড়াই করবার জন্য সামরিক শাসন ঠিক আছে,

'রাষ্ট্রধর্ম' করা ঠিক আছে; কিংবা মনে করে এর জন্য সেসব রাজনৈতিক ব্যক্তি বা শক্তিই ভরসা যারা এদের গণরোষ থেকে রক্ষা করেছে, তাদের আড়াল দিয়ে অভয় দিয়ে রাজনীতির মাঠে এনেছে, এদের সঙ্গে ঐক্য করে ক্ষমতায় বসেছে। কিংবা মনে করে পশ্চিমা আধিপত্যের অবসানের জন্য তালিবানী শক্তির সাথে ঐক্য দরকার।

সারা বিশ্বে এখন সেইসব শক্তির জয়জয়কার যারা মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদি-হিন্দু নির্বিশেষে অভিন্ন রাজনীতির প্রতিনিধি, যাকে এক কথায় বলা যায় ফ্যাসিবাদী। শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী, বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সকল সৃজনশীল মতের সামনে দেয়াল তোলে, শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ বৈষম্য ও নিপীড়ন বিরোধী যেকোন মত চেষ্টার বিরুদ্ধে এরা খড়গহস্ত। সেজন্য 'গণতান্ত্রিক' যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এখন পুলিশ রাষ্ট্র, সারাবিশ্ব মার্কিনী সামিরিক ঘাঁটি, বিশ্বের সকল মানুষের জীবন ও সম্পদ দখল নিশ্চিত করবার জন্য দেশে দেশে নানা কায়দার অভিযান: মতাদর্শিক, সামরিক। দেশে দেশে ফ্যাসিবাদীদের নানারূপে উত্থান।

সম্মিলিত আওয়াজ

মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ-এর স্বপ্ন তো নিজের ভেতরে মুক্ত লেখক শিল্পীর মাধ্যমেই সম্মিলিত সংগঠিত হয়ে ওঠে। এর জন্য তৈরি করতে হয় জায়গা। এমান্বয়ে তাকে সম্প্রসারণ করতে হয়। দরকার হয় মতের ভিন্নতা বা বিতর্ক গড়ে তোলার পরিবেশ। আর এটাই মানুষের গতিশীল সমাজের বৈশিষ্ট। কোন সমাজ গতিশীল থাকতে পারে না যদি সেখানে মত প্রকাশিত হতে না পারে, মত প্রকাশিত হতে কুণ্ঠিত থাকে কিংবা বিতর্কের জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও থাকে বা অস্ত্রের নিচে কম্পমান থাকে। প্রতিষ্ঠিত মতই যে কেবল মত নয়, ক্ষমতাবান দেশি বিদেশি প্রভুদের চিন্তাই যে শেষ নয়, এই নারকীয়তাই যে শেষ কথা নয় সেটা প্রকাশ করাটা এর জন্যই একটা জরুরি কাজ। তারপর বিতর্ক হোক আলোচনা হোক তথ্য উন্মুক্ত থাকুক সকলের সামনে সুযোগ অবারিত থাকুক। বেরিয়ে আসবে সত্য, সৃজনশীলতা অর্গলমুক্ত হবে, মানুষের ভেতরের অসীম ক্ষমতায় মানুষ নির্মাণ করবে মানুষের বাসযোগ্য দুনিয়া, বিকাশে নিয়োজিত থাকবে তার ভেতর-বাইরের জগত।

হুমায়ুন আজাদের ওপর চাপাতির আঘাত এইখানটাতেই হামলা করেছে। সেইজন্য মাথা বন্ধ চোখ বন্ধ ছাড়া সকলেই এর দ্বারা আক্রান্ত বোধ করতে বাধ্য। আর এর দ্বারা আবারও বোঝা গেছে মানুষের জীবন এখানে কত নিরাপত্তাহীন, মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতা কত বড় অচলায়তনের সামনে। এর প্রতিবিধান কি তাদের কাছে চাইতে পারি যারা এর কারণ? এই দুর্বৃত্তরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাজসরঞ্জামে হাঁকডাকে ভয় পায় না, কারণ তারা জানে এসব কিসের গান। তারা আইনকে ভয় পায় না, কারণ তাদের পকেটই তার জন্য যথেষ্ট। তারা সিভিল সোসাইটি পাত্তা দেয় না কারণ এসব তাদের দড়ি দিয়ে বাঁধা। তারা দেশি-বিদেশী শাসক দখলদার লুটেরাদের জোরেই হাঁটে। অন্ধকারের এসব জীব একমাত্র ভয় পায় মানুষের সম্মিলিত আওয়াজকেই। আর সেখানেই আমাদের আশ্রয়, সেখানেই আমাদের নিরাপত্তা, সেটাই আমাদের শক্তি। আবার সেই সম্মিলিত আওয়াজকে ঠিকঠাক মতো ভাষা দেওয়ায়, যারা আক্রান্ত সেই, মুক্ত লেখক শিল্পীদের ভূমিকাই তো প্রধান।

মার্চ ২০০৪

কারণ আমরা এই বাংলাদেশ চাই না

এই লেখাটা লিখছি কারণ আমরা এই বাংলাদেশ চাই না। আক্রান্ত হবার একবছর আগে হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) লিখেছিলেন—

> '...আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম? এমন দুস্থ, দুর্নীতিকবলিত, মানুষের অধিকারহীন, পঙ্কিল, বিপদসঙ্কুল, সন্ত্রাসীশাসিত, অতীতমুখি, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, সৃষ্টিশীলতাহীন, বর্বর, স্বৈরাচারী বাঙলাদেশ যেখানে প্রতিমুহূর্তে দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়?'

তিনি নিজে হামলার শিকার হয়েই প্রমাণ করেছিলেন তাঁর এই বোধ বাস্তবতার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ।

হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন এক বছর হয়ে গেলো। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তাও প্রায় দেড় বছর।

হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা হবার পর প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের অনেকেই জোর শপথ করেছিলেন দুর্বৃত্তদের শাসন করবেন, বিভিন্ন সংস্থা অনেক তৎপরতা দেখিয়েছিল। কিন্তু কদিন পরই, যে কদিন পত্রিকার পাতায় থাকে তারপর, সব থেমে গিয়েছিল। সব সরকারের এ এক পরিচিত চেহারা। হুমায়ুন হামলা থেকে শুরু করে বোমা হামলা—কোনো সন্ত্রাসী ধরবার ব্যাপারে সরকারের মাথাব্যথা নেই, কিন্তু লোকজন ধরে ধরে গুলি করে মেরে সন্ত্রাস দমনের প্রহসন করায় বিপুল উন্মাদনা আছে। যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রীকে প্রায়ই বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে যুক্তিবিন্যাস ও উল্লাস প্রকাশ করতে দেখি। বিচার দীর্ঘ এই অজুহাতে গুলি করে 'সন্ত্রাসী' হত্যার গল্প আর খুনের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে মওকুফ করা

একসঙ্গেই চলে। হুমায়ুন হামলাকারী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের প্রতি সরকারের স্পষ্ট পক্ষপাত তাই প্রমাণ করে যে এধরনের হামলায় তাদের অনুমোদন আছে।

হুমায়ুন আজাদ আক্রান্ত হয়ে যখন ক্ষত-বিক্ষত, সে সময় তাঁর অবস্থা জানতে সিএমএইচ-এ গিয়েছিলাম। কথা বলার অবস্থায় তিনি তখন ছিলেন না। তিনি তখন ছিলেন মৃত্যু থেকে মাত্র 'কয়েক সেকেন্ড দূরে'। ঘাতকেরা হত্যা করতে চাইলেও তিনি তখন বেঁচে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এরপর এবং শেষবার কথা হয় ব্যাংককে। আমি এক সেমিনারে যোগদানের জন্য যখন ব্যাংকক গিয়েছিলাম তিনি তখন চিকিৎসাধীন ছিলেন সেখানকার বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে। অনেক উপরের একটি ঘরে ছিলেন তিনি। আমি যখন সেই ঘরে তাঁর মুখোমুখি হই, খুবই আনন্দিত হন তিনি, কিন্তু বিস্ময়ও ছিল চোখেমুখে। বললেন, 'আমি জানি আপনি ব্যাংকক আসছেন। কিন্তু ভাবিনি যে আপনি আমাকে দেখতে আসবেন। আমার ধারণা ছিল আপনি আসবেন না।' তাঁর এরকম ভাবনার ধরন আমি জানতাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন এরকম মনে হলো আপনার?' তিনি বললেন, 'আপনি তো আমার কঠোর সমালোচক। আমার সমালোচনা করে লিখেছেনও।' 'সমালোচনার সাথে আমার না আসার কী সম্পর্ক?' আমি আরও বললাম, 'আপনি আক্রান্ত হবার পর কী কী ঘটেছে কারা এসবের প্রতিবাদে ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে নেমেছে জানেন সে সব?' বললেন, 'আমি জানি না এখনো সব। সব পত্রিকা দেখব এবং লিখব। আমি তো আসলে এক্সটেনশনে বেঁচে আছি।' বললাম, 'আমরা অনেকেই সেসময়ে প্রতিবাদে নেমেছিলাম। অনেক ছাত্র সংগঠন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরে হামলাকারিদের বিচারের দাবিতে দিনের পর দিন রাস্তায় ছিল, ছিলেন অনেক মানুষ। অনেক ছাত্রছাত্রী এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ভয়ংকরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানলে দেখবেন এঁদের অনেকেই আপনার অনেক মতের সঙ্গে একমত নন। এদের অনেকে আপনার কঠোর সমালোচকও। কিন্তু তাঁরা এখন জখম হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন।' বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো একা। আমি তো কোনো সংগঠনের নই।' বললাম, 'আপনি

চাইলেও কখনোই একা নন। আপনার মত, আপনার লেখা সবকিছুরই একটা সামাজিক চরিত্র আছে। সেজন্য আপনি আক্রান্ত হলে আমরা আক্রান্ত বোধ করেছি। কারণ এই আক্রমণও ব্যক্তিগত নয়। সংগঠন দিয়েই কেবল যৌথতা হয় না। মানুষ আসলে চাক বা না চাক সে যৌথতারই অংশ। যারা হামলা করেছে তারা যেমন এক সমষ্টির ক্ষমতা দর্শনের অংশ, যারা প্রতিবাদ করেছে তারাও আরেক সমষ্টি আর দর্শনের প্রতিনিধি। সেজন্য আমরা সমালোচনা করি কিন্তু আবার একত্রিত হই। একত্রিত হওয়া মানে সমালোচনার শেষ নয়, আর সমালোচনা মানে ভিন্ন ভিন্ন একক নয়।' নিজেকে একক ভাবার একটা প্রবণতা হুমায়ুনের বরাবর ছিল। নিজে আক্রান্ত হয়ে এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাঁর সেই বোধ হয়তো নড়ে গিয়েছিল। সেজন্য তিনি আর আপত্তি করলেন না। তাঁকে হামলার সময়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। মনে করতে পারলেন না কিছুই। সেই ভয়ংকর কয়েক মিনিট তাঁর স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। কিন্তু শুনেছেন, সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে জামায়াত এমপি সাঈদীর দম্ভোক্তি, ওয়াজে হুমকির কথা। সেগুলো স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। দেশে আসবার পর আরও কথা হবে বলেই সেদিনের সাক্ষাৎপর্ব শেষ হয়েছিল। কিন্তু আর কথা হয়নি। চট্টগ্রামে ছিলাম তখন, যখন ঢাকার উদ্বিগ্ন বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম।

তিনি কীভাবে মারা গেলেন সেটা নিয়ে এরপর অনেক লেখালেখি হয়েছে। অনেক মত আছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট কী বলে তা আজও আমাদের জানা হয়নি। কিন্তু ভয়ংকর আঘাতের চিহ্ন নিয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসবার পর তিনি নিজেও তাঁর পরিবার নিয়ে মোটেই মানসিকভাবে সুস্থির হতে পারেননি। টেলিফোনে হুমকি, উড়ো চিঠি চলছিল। তাঁর সন্তানের উপরও হামলা হয়েছিল। এ সময়কার নিত্য অস্থিরতা আর উদ্বেগের অনুভূতির কথা তিনি পত্রিকার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়েছিলেন। এর ফলে নিত্য আতঙ্কের মধ্যে ছিল তাঁর বসবাস। আর যে কোন সংবেদনশীল মানুষের জন্য এই অবস্থা আরও ভয়ংকর। সেজন্য মেডিক্যাল রিপোর্ট যাই বলুক সামাজিক পোস্টমর্টেম অনুযায়ী তিনি খুন হয়েছেন।

মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে লেখা এক খোলা চিঠিতে হুমায়ুন লিখেছিলেন—

> '...আতঙ্কে আমি জ্ঞান ও সাহিত্যকে ভুলে যাচ্ছি। এটা কি বাংলাদেশের জন্য গৌরব যে তার একজন প্রধান অধ্যাপক ও লেখককে মৃত্যুর আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে?....আমি একজন লেখক ও অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ, যার কাছে ঘরে বন্দী হয়ে থাকাটাই মৃত্যুর থেকেও শোচনীয়। মনে পড়ে একদিন আমি একা একা হাঁটতাম, একা গ্রামে যেতাম, চাঁদ পাখি নদী দেখতাম; আজ আমার একা হাঁটার অধিকার নেই, আজ আমার চাঁদ পাখি দেখার অধিকার নেই, অথচ অধিকার আছে তাদের যারা আমাকে হত্যা করতে চায়, যারা কখনো চাঁদ ভালো করে দেখেনি।'

হুমায়ুন ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক, কবি, শিক্ষক। নিজে যা ভাবতেন এবং বিশ্বাস করতেন তা অকপটে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর শক্তিশালী ভাষা, ক্ষুরধার শব্দচয়ন অনেকের ক্রোধ ও ক্ষোভ ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে একক ভাবতেই ভালোবাসতেন। তবে সমাজের দুষ্ট ক্ষমতার কোনো না কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে 'দাস, দালাল কিংবা ভাঁড়' তিনি হতে চাননি কোনোক্রমেই। সে কারণেই একজন বিচ্ছিন্ন ভাববিলাসী থেকে ক্রমে তিনি সমাজ সমালোচকে পরিণত হয়েছিলেন। যেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল সমাজের ক্ষমতাবান কপট ভণ্ড প্রতারকদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং সমাজ আর মানুষ নিয়ে তাঁর গভীর উদ্বেগ। এভাবেই তাঁর কাছ থেকে আমরা পাই সমাজ, ধর্ম, নারী বিষয়ক নানা লেখা। এসব লেখা নিয়েই তিনি আলোচিত হয়েছিলেন, বিতর্কিত হয়েছিলেন।

সমাজে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের ক্রমাগত শক্তি ও দাপটবৃদ্ধিতে তাঁর যে উদ্বেগ ও অস্থিরতা তার অংশীদার বিবেচনা ও অনুভূতিবোধসম্পন্ন সকলেই। কিন্তু যেখানে আমাদের বিরোধ সেটা হলো এর ক্ষমতার নানা যোগসূত্র এবং পরিপুষ্টির নানা উৎস সম্পর্কে তাঁর একটানা অমনোযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছেই যেন প্রত্যাশা করেছেন দুষ্টকীটের দমন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমকে তিনি যখন তালিবান দমনের উপায় বিবেচনা করেন তখন তা করুণ এবং

বিপজ্জনক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এখানে তিনি ইতিহাস দেখেন না, দেখেন না কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে আফগানিস্তানে সব প্রগতিশীল সংস্কার চেষ্টাকে চুরমার করেছে এবং বারবার সামনে এনেছে সামন্তপ্রভু, ধর্মোন্মাদ এবং সবরকম গণশত্রুদের। ইরাকে মুক্তির কথা বলে দেশ দখল ও বিধ্বস্ত করছে মার্কিন শয়তান অক্ষ, তারা একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' শাসন উচ্ছেদ করে এখন সেখানে শরীয়া আইন প্রচলন করছে, সেসব শক্তিগুলোই এখন মার্কিন মিত্র। আরবে সৌদী রাজতন্ত্রের স্থায়ী আধিপত্য নিশ্চিত করেছে এই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই, তাদের লুণ্ঠন ও আধিপত্যের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ এখন ইহুদি ও মুসলিম ফ্যাসিবাদীদের দাপটে ক্ষত-বিক্ষত।

ধর্ম সম্পর্কে হুমায়ুনের ভাবনা নিয়ে তাই তাঁর সাথে অনেক বিতর্ক করবার ছিল। তিনি ধর্মকে দেখতেন সকল প্রতিক্রিয়াশীলতার উৎস হিসেবে, ধর্ম তাঁর কাছে ছিল পশ্চাদপদতার কেন্দ্র। আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি না যে, ধর্মই সব সমস্যা, নিপীড়ন ও বদ্ধতার কারণ। এটা বললে ইতিহাস পাঠে, সমাজ পাঠে, সমাজের ক্ষমতা বিন্যাস উপলব্ধিতে গুরুতর সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা। আমি মনে করি, ক্ষমতাবানদের হাতে ধর্ম হলো নিপীড়ন ও বদ্ধতার যাবতীয় ব্যবস্থা যৌক্তিকীকরণের আবরণ, প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা ভাষা। ধর্মের একরৈখিক, স্থির বিশ্বাসের কাঠামো ক্ষমতাবান নিপীড়কদের জন্য খুবই সুবিধাজনক। 'ঈশ্বরের আদেশ' বলে তারা তাদের অনেক কর্মই জায়েজ করতে সক্ষম। এই ক্ষমতাবানদের বিরোধিতা সবই ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বৈরশাসকদের জন্য ধর্ম ও ধর্মকেন্দ্র দুটোই সে কারণে নিরাপদ বাহন। বাংলাদেশ পাকিস্তানে এই কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষক ছাত্রদের ইচ্ছামতো ব্যবহারে এবং তাদেরকে মজুত বাহিনী হিসেবে বিবেচনার প্রবণতা সব শাসকদের মধ্যেই দেখা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষার হায়ারার্কি এবং বিশ্বাস ব্যবস্থা এজন্য খুব সুবিধাজনক। এটা বিস্ময়কর নয় যে, অস্ত্র নিজেও কখনো কখনো চালিত হতে চায়।

তাই দেখা দরকার ধর্মের জমিন ও তার পেছনের শক্তিকে। ধর্ম স্বয়ম্ভু নয়, নিজে নিজে তা কোনো রূপ বা ক্ষমতা ধারণ করে না, করলে স্থান কাল গোষ্ঠীভেদে এর রূপের তারতম্য ঘটত না। মানুষের সমাজের বিভিন্ন

পর্বে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব। আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও কালে একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এমনকি এক কালেই এক ধর্মের বিভিন্ন ভাষা তৈরি হয়, সমাজের ভেতর নানা দ্বন্দ্ব তার মধ্যে প্রতিফলিত হবার কারণে। নিপীড়িত নারীপুরুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অবলম্বনও অনেক সময় হয়ে ওঠে ধর্ম। ভিয়েতনাম যুদ্ধে, ল্যাটিন আমেরিকায় মানুষের লড়াইয়ে 'মুক্তির ধর্মতত্ত্বে' এর অনেক প্রমাণ আছে। দিনে রাতে আমাদের চারপাশেই আমরা ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তৈরি হতে দেখি। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ তাই সমরূপ নয়, সমরূপ নয় ধর্মে অবিশ্বাসীরাও।

পাক সার জমিন সাদ বাদ গ্রন্থটি লিখে হুমায়ুন আজাদ সবচাইতে আলোচিত হয়েছেন। তাঁর দুর্ভাগ্য! এর চাইতে তাঁর অনেক বড় কাজের নামও শোনেনি মানুষ। অনেকদিন বইটি পড়িনি ভয়ে, যা শুনেছি তার মুখোমুখি হবার ভয়ে। একপর্যায়ে বইটি একরকম বাধ্য হয়েই পড়ি। পড়তে থাকি এবং বিষণ্নবোধ করি, কোনো কোনো জায়গায় বিরক্ত হই, অধৈর্য্য হই। আমি অনুভব করি, যেভাবে এক জামায়াতি চরিত্র এখানে চিত্রণ করা হয়েছে এবং যেভাবে তার নিকৃষ্ট অধপতিত মনোজগত উন্মুক্ত করা হয়েছে তার ধরন হুমায়ুনের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যকেই ব্যঙ্গ করছে। পড়ি, হিন্দু জনগোষ্ঠী এখানে আবার যেন পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে, দেখি অপমানিত ধর্ষিত নারী এখানে আরেকবার যেন অপমানিত ধর্ষিত হচ্ছেন।

ধর্ষকদের জন্য যেন এ এক আহ্বান। হুমায়ুন ধর্মোন্মাদ হিংস্র লোভী বিকৃতমনস্ক ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বীভৎসতা দেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু যেভাবে তার বিন্যাস ঘটিয়েছেন তাতে সেই বীভৎসতার ফাঁদে যেন বারবার আটকে গেছে তাঁর সৃষ্টি। এসব ফ্যাসিবাদী রাজনীতির অন্তর্গত চরিত্র আর তার বিচরণভূমি সেখানে নেই। সেখানে কতিপয় দুর্বৃত্ত ভয়ংকরভাবে উপস্থিত, চলতি বাংলা চলচ্চিত্রের মতো, যা মানুষকে হয় আতঙ্কিত অসুস্থ করে নয়তো সেই পথেই টানে।

দাড়িটুপি ছাড়াও ধর্মের নাম বা না নামে নৃশংসতা হতে পারে। ২০০১ সালের কিংবা আরও আগের কথা যদি বলি, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর

বর্বর হামলা আর নারী ধর্ষণে শুধু দাড়িটুপি পরা লোকজন ছিল না, দাড়িটুপি ছাড়া শার্ট-প্যান্ট পরা সাম্প্রদায়িক দখলদার দুর্বৃত্তরাও ছিল। '৭১ এ রাজাকার আল-বদররা পাক দখলদার সামরিক বাহিনীর বর্বরতায় শরীক ছিল, আল-বদর বাহিনী জামায়াতি, তাদের অনেকের দাড়িটুপি ছিল কিন্তু তাদের পরিচালক ইয়াহিয়া-টিক্কা-ফরমান-নিয়াজী কারুরই দাড়িটুপি জোব্বা ছিল না। এদের ক্রীড়নক হয়ে বদর-শামস বাহিনী বরঞ্চ বাংলাদেশের দাড়িটুপি পরা অজস্র মানুষকে হত্যা করেছে। পীর, নামাজরত নারীপুরুষকেও তারা ছাড়েনি। এই যুদ্ধাপরাধিরা এখন বাংলাদেশ শাসনের অংশীদার, কোট প্যান্টের সাথে। এই বর্বরদের প্রধান পিতা ছিল সাহেব, 'খ্রিষ্টান-ইহুদি-নাসারা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখনো নানাভাবে তারা যুক্ত। এই যোগাযোগ না দেখে কি কোনো সত্যিকারের প্রতিরোধ বা পরিবর্তনের পথনির্দেশ সম্ভব?

পাক সার জমিন সাদ বাদ বইটা আমি কষ্ট করেই শেষ করেছি। শেষ করেছি বলেই পেয়েছি হুমায়ুনের ক্ষমতার সন্ধান। শেষে কুৎসিত ভয়ংকর চরিত্র জামায়াতি নেতা সবকিছু ধ্বংস করবার মুখে এসে বহুদিন পর নিজের ভেতর মানুষের টান অনুভব করে। তার চোখে প্রকৃতি প্রাণ ফিরে পায়, আনন্দ আর সৃষ্টি খেলা করে সেখানে; দিগন্ত জোড়া আকাশ, অমর শৈশব, এমনকি ছোট্ট পাখি এতদিন পরে এসে তার ভেতরের মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়। মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবন হিংস্র জীবকে মানুষ করে তুলতে থাকে। অমানুষের মানুষে রূপান্তরের এই পর্ব অসাধারণ। শেষ কয় পৃষ্ঠাতেই তাই অসাধারণ হুমায়ুনকে পাওয়া যায়।

হুমায়ুনের সাথে আমরা বিতর্ক করতে পারতাম এগুলো নিয়ে। তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পেতাম এক উচ্চতর তল। কিন্তু এই সমাজ বিতর্ক করতে দেবে না। এখানকার ক্ষমতা কোনো ফুল ফুটতে দেবে না, পাখি উড়তে দেবে না। এখানে ঢাকা সৌন্দর্যকরণের মতোই প্লাস্টিকের বৃক্ষ, প্লাস্টিকের ফুল, বানানো পাখি একভাবে ম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এর বাইরে যেতে মানুষকে কত মূল্য দিতে হয়, দিতে হয় রক্ত। নানাভাবে। কিন্তু তাছাড়া বেঁচে থাকারই বা উপায় কী?

খুন বা ভীতি দিয়ে বাকরুদ্ধ করে দিলেই মতের মৃত্যু হয় না। কিন্তু ভীতি, স্থবিরতা গ্রাস করতে থাকে সমাজকে। অস্ত্র হুমকি শাসন মানুষকে স্থায়ীভাবে অবনত করতে চায় কিংবা স্থায়ীভাবে নষ্ট করে ঢোকাতে চায় ভোগ আর লোভে। আমরা তখন কী করি?

এই ত্রাস, শাসন, এই ভীতি, স্থবিরতা আর স্তব্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া শিল্প কোথায় হয়? সৃজন কীভাবে হতে পারে? আমাদের তাই দাঁড়াতে হয় জীবন আর সৃষ্টির জন্য। মানুষ আর প্রকৃতির নতুন প্রাণ পাবার জন্য। নৃশংসতা আর দমবন্ধ করা সময়ে এর বিরোধী যৌথতা স্পষ্ট করতে হয়।

হুমায়ুনের হত্যাকাণ্ড একটা প্রতীক। আমরা কোথায় আছি তার রক্তাক্ত ভাষা। এই সমাজ ক্ষমতা এসবের মধ্য দিয়েই স্তব্ধতাকে স্থায়ী করতে উদ্যত। হুমায়ুনের রক্তস্মৃতি স্তব্ধতার এই ভয়াল সংস্কৃতিকে ভেঙে খানখান করুক।

কারণ,

আমরা প্রাণহীন দুর্বৃত্ত শাসিত ক্লেদাক্ত ত্রস্ত এই বাংলাদেশ চাই না।

আগস্ট ২০০৫

অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি এবং তসলিমা নাসরিন

বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত তসলিমা নাসরিন-এর বেশ কয়েকটি বই নিষিদ্ধ করেছে। সবগুলো বই নিষিদ্ধ করবার পেছনে প্রধান যুক্তি দেয়া হয়েছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। এই নিষেধাজ্ঞা সিরিজ-এ সর্বশেষ বই 'ক'। এবারের নিষেধাজ্ঞা আগেরগুলোর থেকে ভিন্ন। এবারের বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার নয়, আদালত। আদালত এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আরেকজন বিখ্যাত লেখক সৈয়দ শামসুল হক-এর আবেদনক্রমে। কোনো লেখক কোনো বই নিষেধ করার জন্য আবেদন করছেন এরকম ঘটনা সারা বিশ্বেই বিরল।

প্রায় বছর দশেক আগে ব্লাসফেমি আইন করবার চক্রান্তের প্রতিবাদে আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নেতৃত্বে লেখকদের একটি প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করেছিলাম। এ ধরনের আইন পাকিস্তানে আছে এবং বাংলাদেশে এর ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ এখনো আছে। এটাকে আরও পোক্ত করে বসানোর জন্য জামায়াতে ইসলামী সংসদে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ ধরনের আইনের মোদ্দা কথা হল কেউ যদি ধর্ম (এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম) সম্পর্কে কিংবা নবী সম্পর্কে কটূক্তি করে তাহলে তা হবে কঠোর দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর জন্য তাকে কঠোর সাজা পেতে হবে।

কাকে বলা যাবে কটূক্তি? কোন কথা দিয়ে বোঝা যাবে যে কেউ মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করেছেন? ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বলতে আসলে কী বোঝায়? এসবের সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারণ কঠিন। আরও কঠিন তাতে সকলের একমত হওয়া। তাছাড়া সমালোচনা, পর্যালোচনা, বিরোধিতা আর কটূক্তি এক কথা নয়। ধর্ম সম্পর্কে কেন কোনো বিষয়েই কটূক্তি

কোনো রুচির পরিচয় দেয় না। আবার সকল মত-পথ-নিয়ম-বিধি অনুশাসন এমনকি ধর্মেরও সমালোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ তো বটেই এসবের বিরোধিতার অধিকারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সমাজে এই অধিকার অস্বীকৃত থাকে, যে সমাজে মানুষ এই নিষেধাজ্ঞা মাথা পেতে নেয় সেই সমাজে চিন্তা অগ্রসর হতে পারে না, সেই সমাজ নতুন কিছু সৃজন করতে পারে না, সেই সমাজ একই বৃত্তে শুধু যে ঘোরে তাই নয় সেখানে ক্ষয় হয়, পচন ধরে।

ব্লাসফেমি ধরনের আইনের সমস্যা হলো এধরনের আইন কটূক্তি, অশ্রদ্ধা কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বিরোধিতা করবার কথা বলেই আসে কিন্তু তার মূল লক্ষ্য থাকে সমাজে রাষ্ট্র বা ক্ষমতা অনুমোদিত মত বা পথ-এর বিরোধিতা এমনকি সব রকম সমালোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ দূর করবার ব্যবস্থা করা। ধর্মের নাম করে সবরকম নতুন চিন্তা-ভাবনা এমনকি ধর্মীয় কাঠামোয় নতুন চিন্তার পথও রুদ্ধ করা। এ ধরনের আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ তাই নতুন চিন্তা আর সৃজনশীলতার ব্যাপারে আগ্রহী সকলকে আঘাত করে। বাংলাদেশে এই আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে জামায়াতের অপচেষ্টার প্রতিবাদে আয়োজিত আমাদের সমাবেশে তাই শরিক হন বিভিন্ন দল-মতের লেখক-শিল্পীরা। সৈয়দ শামসুল হকও সেই সমাবেশ-এ ছিলেন! সমাবেশে তিনিও আরও অনেকের মতোই জোর গলায় ধর্মকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে ভিন্নমত রুদ্ধ করবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বলেছিলেন।

তসলিমা নাসরিন-এর 'ক' গ্রন্থ নিষিদ্ধ করবার জন্য আদালতের কাছে সৈয়দ হক যে আবেদন জানিয়েছেন, সেখানে তিনি এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে হাজির করেছেন তিনটি বিষয়। প্রথমত তিনি আর্জি করেছেন যে, তসলিমা তাঁর সম্পর্কে এই গ্রন্থে যা লিখেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা এবং এতে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এতে মানহানির বিষয় দাঁড়ায়, কিন্তু গ্রন্থ নিষিদ্ধ করবার জন্য এটা যথেষ্ট যুক্তি নয়। সুতরাং তিনিও ধর্ম ব্যবহারের রাস্তা ধরেন। আর্জিতে তিনি বলেন, এই গ্রন্থে তসলিমা ধর্মের প্রতি কটূক্তি করেছেন! কোনটা কটূক্তি, কোনটা বর্ণনা; কোনটা কটূক্তি, কোনটা অভিজ্ঞতার বয়ান? আর্জিতে ব্যাখ্যারও দরকার হয়নি। মোক্ষম পয়েন্ট।

আদালত নিষিদ্ধ না করে যায় কোথায়? নিষিদ্ধ করবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কোথায় এসে দাঁড়ালেন হক? কাদের সাথে? তারপরও এখানেই শেষ নয়। এরপর বোধহয় ক্ষমতাবানদের সমর্থন নিশ্চিত করা দরকার। হক সাহেব আর্জিতে তাই তাঁর তৃতীয় দফা যুক্তি টানলেন। বললেন, এই গ্রন্থে তসলিমা প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। তার মানে কি, সৈয়দ হকের আর্জি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে কোনো সমালোচনামূলক মন্তব্য করা গর্হিত কাজ? তসলিমা যেসব 'কটূক্তি' করেছেন তা কি এই দুই নেত্রীর লোকজন অন্য নেত্রীর উদ্দেশ্যে যে সব মন্তব্য করেন, এমনকি সংসদে যেসব গালি-গালাজ হয় তার থেকেও খারাপ?

এটা বুঝতে তাই অসুবিধা হবার কথা নয় যে, সৈয়দ হক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আদালতে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন, যেমন ব্যবহার করে থাকেন আমাদের শাসকেরা, ক্ষমতার চর্চাকারী সমাজপ্রভুরা। তিনি আরও ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর ক্ষমতাকে, যেমন ব্যবহার করে উপ-শাসকেরা।

তসলিমা সৈয়দ হক সম্পর্কে 'ক' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা ঠিক কি বেঠিক সেটা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। বেঠিক হলে সৈয়দ হক তা পরিষ্কার করে আরেকটা লিখতে পারতেন, বিবৃতি দিতে পারতেন, সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারতেন। তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ এটা আমরা জানি। তসলিমার গ্রন্থেও তার স্বীকৃতি আছে। তিনি চাইলে তাঁর বক্তব্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর সেই সাহস ছিল না। তাই তাঁর দরকার হল এমন হাতিয়ার ব্যবহার করা, যার বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি।

তসলিমার লেখা নিয়ে এযাবৎকালে পত্রপত্রিকায় সবচাইতে বেশি আলোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব আলোচনা শুরুই হয় প্রবল বিদ্বেষ দিয়ে। এবারের 'ক' গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এটি একটি 'পর্নোগ্রাফী', 'অশ্লীলতায় ভরা', 'আলোচনার অযোগ্য' ইত্যাদি বলেই অনেকে তাঁদের আলোচনা উপস্থিত করেছেন!

অশ্লীলতার অভিযোগ এ পর্যন্ত বাংলাদেশের আর কোন লেখকের বিরুদ্ধে এভাবে ওঠেনি। কারও লেখা পর্নোগ্রাফি এরকম কথা এইভাবে আর কারও বেলায় শোনা যায়নি। তসলিমার লেখায় পর্নোগ্রাফির কথা উঠছে লেখায় যৌনতার প্রসঙ্গে। তাহলে কি আর কারও লেখায় যৌন আচরণের বিবরণ আসেনি? যৌন আচরণ এবং পর্নোগ্রাফির সীমারেখা কোথায়? যৌনতার কথা থাকলেই কি তা অশ্লীল হয়? তাহলে শুধু তসলিমা কেন আরও অনেক লেখকই একই অভিযোগে অভিযুক্ত হবার কথা। হননি কেন? আর যদি যৌনতার বিষয় থাকলেই তা পর্নোগ্রাফি হয় কিংবা হয় অশ্লীল তাহলে জীবন নিয়ে লেখা কীভাবে সম্ভব? ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলেও যৌনতা জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যৌনতার সঙ্গেও জড়িত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমাজ-স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বিন্যাস। তাই এই ক্ষেত্রটিও ধারণ করে মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, ভালোবাসা, শরীর-মনের বোঝাপড়ার নানা দিক, আবার একই বিষয় তুলে ধরে নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং শোষণের নানা জাল। তসলিমা নারীকে কেন্দ্রে রেখে যে সব বিষয় লিখেছেন সেগুলো যৌনতা সম্পর্কে নীরব থেকে কীভাবে লেখা সম্ভব?

এসব বিষয় লেখকেরা খুব ভালো বোঝেন, বোঝার কথা। কিন্তু বোঝা আর মানা তো এক কথা নয়। কোন বোঝা জিনিস একজন মানবেন তা তো শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তার নিজের সামাজিক মতাদর্শিক অবস্থানের উপর। তাতে তফাৎ হলে ভূমিকারও পার্থক্য হয়। সেজন্য লেখক মানেই সকলে এক নন, সেজন্য 'বুদ্ধিজীবী' কোনো একক জনগোষ্ঠী নয়। তসলিমার লেখায় লেখকেরা তাই অনেকে আক্রান্ত বোধ করেছেন, কেউ নিজের জন্য, কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বড়ভাই-এর জন্য। ক্ষমতার জাল তো অনেকভাবেই কাজ করে। লেখকদের মধ্য থেকেই তসলিমার বিরুদ্ধে এবারে তাই প্রবল সমালোচনা হচ্ছে। এই লেখকেরাই অভিযোগ তুলছেন অশ্লীলতার, পর্নোগ্রাফির। এই অভিযোগ কতদূর গেছে তা বোঝা যায় বাংলাদেশ ও ভারতের দুজন খ্যাতনামা লেখকের কথা থেকে। বাংলাদেশের হুমায়ুন আজাদ বলেছেন—

'...এটি "ক" একটি পতিতার নগ্ন আত্মকথন অথবা একজন নিকৃষ্টতম জীবের কুরুচিপূর্ণ বর্ণনা।' ভারতের সমরেশ মজুমদার বলেছেন—

> 'প্রায় ৯০ বছর আগে কলকাতার সোনাগাছিতে একজন খ্যাতনামা বেশ্যা থাকতেন। তার নাম ছিল নন্দরাণী। কলকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল তার কাছে। অবশ্যই খদ্দের হিসেবে। তিনি যদি এদের নিয়ে উপন্যাস রচনার কথা ভাবতেন তাহলে তিনি তা অনেক আগেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে চুপচাপ থাকার ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, তসলিমা নাসরিন নন্দরাণীর সেই আত্মসম্মানবোধের অংশীদারও হতে পারেননি।'

লক্ষ্যণীয় যে, দুজনের বক্তব্যেই তসলিমাকে নিকৃষ্টতম প্রাণী বলতে গিয়ে তুলনা করা হয়েছে পতিতার সঙ্গে। এবং সমরেশ তাঁকে নিক্ষেপ করেছেন পতিতার চাইতেও অধম স্থানে। তাঁদের কাছে পতিতার মতো ঘৃণ্য কিছু হতে পারে না। তাঁদের কাছে তবে ধর্ষিতা নারীই বোধহয় ঘৃণ্য, ধর্ষক নয়। কেননা পতিতা অবস্থায় একজন নারী যে 'বৈধ' ধর্ষণের শিকার হন ক্রমাগত তাই নয়, ধর্ষণ একজন নারীকে সমাজস্বীকৃত পতিতায় রূপান্তরিত করবার জন্য অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

দৃষ্টি থাকলে এই কথাটা কারও জন্য বোঝা কঠিন নয় যে, একজন নারীর 'পতিতা' হবার পেছনে সাধারণভাবে থাকে আমাদের সমাজের ভয়ংকর প্রতারণা, জালিয়াতি ও নারকীয় নিপীড়ন এর ইতিহাস। বাংলাদেশে, আরও অনেক দেশের মতোই, 'যৌন বাণিজ্য' উচ্চ মুনাফার একটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র। যে বিনিয়োগ সাধারণভাবে বিনোদন শিল্প কিংবা সেবাখাত হিসেবে বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পেয়ে থাকে। এতে মুনাফার হার, অস্ত্র আর মাদকদ্রব্যের মতোই, অনেক উঁচু বলে অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে কমলেও এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। এই বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনি এমনি মুনাফা তৈরি করে না। তার জন্য দরকার হয় শিকার নারী আর শিকারী পুরুষ। তাই এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী পাচার, ধর্ষণ, পর্নোগ্রাফি তৈরি, পতিতাবৃত্তিতে নারী যোগান এর তৎপরতাও বাড়তে

থাকে। যেসব দুর্বৃত্ত রথী মহারথী এসব কাজে বা এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োজিত তারাই সমরেশ-এর ভাষায় 'খ্যাতনামা' ব্যক্তি। অর্থনীতি-সমাজের চাপ ও প্রতারণা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের রং যেসব মেয়েকে 'স্বেচ্ছায়' এই পেশায় নিয়ে আসে সেই 'স্বেচ্ছা'ও তৈরি হয় নানা মাত্রার বলপ্রয়োগ, জালিয়াতি ও আচ্ছন্নতা থেকে। কিন্তু নারীকে নিন্দা করবার জন্য নিকৃষ্ট-পুরুষতন্ত্র নিপীড়িত নারীর এই পরিচয়কেই মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কেননা নারীকে আক্রমণ করবার, তাকে নাস্তানাবুদ করবার, তাকে ধরাশায়ী করবার জন্য এর চাইতে কার্যকর কিছু নাই।

তসলিমা প্রসঙ্গে সমরেশ আরও খোলাসা করেছেন নিজেকে। তিনি এরকমভাবে বিষয়টা উপস্থিত করেছেন যেন তাঁর খ্যাতনামা মানুষদের, যারা বেশ্যালয়ের নিয়মিত খদ্দের, সম্মান রক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষের উচিৎ কাজ। সেজন্য এই মহাশয়রা যা করবেন তা গোপন রাখা সকলের অবশ্য কর্তব্য। বটেই তো, এই ভিআইপিরা যা করবেন তাকে ঢেকে, যা করবেন না সেটাই তাদের নামের সাথে জড়িয়ে, পদসেবা করাই তো জনগণের কাজ! নন্দরাণী সেই কাজটি করে সমরেশ-এর প্রশংসা পেয়েছেন। সমরেশ তসলিমার নিন্দা করেছেন এই কারণে যে তসলিমা নন্দরাণীর 'চুপচাপ থাকার' আত্মসম্মানবোধ দেখাতে পারেননি!

যারা ক্ষমতাবান তারা কেবল কথা বলবে, ক্ষমতাবান পুরুষ নারীকে নন্দরাণী হিসেবে ভোগ করবে। আবার কাউকে গাল দিতে হলে তাকে পতিতা বলবে, খানকি বলবে, নষ্ট মেয়ে বলবে, এটাই সমাজের প্রচলিত নিয়ম। সমাজের নিয়ম এটাই যে, ক্ষমতাহীন চুপ থাকবে, তারা প্রতিবাদ তো দূরের কথা কথাই তুলবে না। নারী উত্যক্ত হোক, মার খাক, বিতাড়িত হোক তার সম্পদ থেকে; অপমানিত হোক, প্রতারিত হোক, যৌন হয়রানি এমনকি ধর্ষণের শিকার হোক—সমাজ চায় আত্মসম্মানবোধ রক্ষার জন্য সে চুপ থাকবে, চাপ মানবে, কান্না আর্তনাদ চিৎকার সবই করবে নিঃশব্দে, প্রতিবাদ কোনমতেই নয়। সরবতা কিংবা প্রতিবাদ নারীর ভূষণ—*লজ্জা* দূর করে, সম্মানীর মানহানি করে। সিমি, মহিমা, রুমীর মতো মেয়েরা তাই বেঁচে থেকে প্রতিবাদ করতে পারে না, মরে গিয়ে প্রতিবাদ করে।

ভদ্রলোকেরা চায়, সমাজপ্রভুরা চায়, ক্ষমতাবানরা চায় মানুষ চুপ থাকুক, মেনে নিক সবকিছু। নীরবতা আর প্রশ্নহীনতার মৃত সমাজের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলুক শেয়াল শকুনের রাজত্ব। তাদের চাই, শ্রমিক কথা বলবে না—দাসের মতো কাজ করানো হবে কিন্তু পয়সা দেয়া হবে না, তবু তারা কথা বলতে পারবে না কেননা কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরাই প্রতিবাদ করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা জাতিগত ভাষাগত সংখ্যালঘুরা কথা বলবে না—তাদের সম্পদ দখল হবে, তাদের ভিটে ছাড়া করা হবে, তাদের নারী আরও একদফা বেশি হুমকির মধ্যে থাকবে, উচ্ছেদ করবার জন্য দখল করবার জন্য চারমাসের শিশুসহ তাদের পুড়িয়ে মারা হবে তারপরও তাদের চুপ থাকতে হবে, কেননা হইচই করে কেবলমাত্র দেশদ্রোহীরা। নারী কথা বলবে না—তাদের শরীর মন পদদলিত হবে, যুদ্ধ-শান্তি-অভাব-প্রাচুর্য্য সবকিছুতে সে হবে ছিন্নভিন্ন, সৌন্দর্য্য থাকা না থাকা, পণ্যসামগ্রী-অলঙ্কার এসবকিছুর মতো বা এসবকিছুর জন্য বেঁচে থাকবে বা মরবে, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনো বলে কখনো ছলে অধীনস্ত হবে পুঁজি-পুরুষ-প্রতাপের; তবু তারা কথা বলবে না, কেননা এসব নিয়ে কথা বলে কেবল খারাপ মেয়েরা।

'*ক*' প্রকাশের অনেক আগে থেকেই এমনকি *লজ্জা* প্রকাশেরও আগে থেকে তসলিমা 'খারাপ মেয়ে' হিসেবে অনেকের কাছে চিহ্নিত কেননা তসলিমা যেসব বিষয়ে কথা বলেছেন সেগুলো নারীর বলার কথা নয়। তসলিমা 'খারাপ মেয়ে' কেননা তার দায় নীরবতা ভাঙার। নারী কেন প্রশ্ন তুলবে সমাজের অনুশাসন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে কিংবা কেন কথা বলবে তার যৌনতা নিয়ে? নারীর কলমে নারীর শরীর ও মনের ক্ষোভ-যাতনা-বঞ্চনা-ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা যাদের কাছে পর্নোগ্রাফি তাদের কাছেই তসলিমা বেশ্যা। এদেশে অশ্লীল পত্রিকার অভাব নেই, অভাব নেই অশ্লীল চলচ্চিত্রের, এদেশে আন্তর্জাতিক পর্নোগ্রাফি সুলভ কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে এই ধর্ম-জাতীয়তাবাদ-দেশ-সমাজ রক্ষাকারীদের তেমন শোরগোল উত্তেজনা মারদাঙ্গা ভাব দেখা যায় না কারণ আসলেই যেগুলো পর্নোগ্রাফি সেখানে নারী হল পুরুষের-পুঁজির-প্রতাপের অধীনস্ত জড় মাংসপিণ্ড। তাই তা গ্রহণযোগ্য, গ্রহণযোগ্য পতিতাবৃত্তিও কেননা তা পুরুষদের চরিত্র ঠিক

রাখার জন্য দরকার! যে নারী সমাজে ধর্ষকদের রাজত্ব, নিপীড়কদের শাসন, পর্নোগ্রাফির বান, পতিতাবৃত্তির বাণিজ্য স্বীকার করে নেবে, মেনে নেবে সবকিছু সেই নারী গ্রহণযোগ্য, তাকে নিয়ে সমাজপ্রভুদের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা সেখানেই যেখানে নারী এই কাঠামোকে প্রশ্ন করবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দাঁড় করাবে।

'ক' প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হুলস্থুল করে বই-এর কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করেছে। প্রকাশ করেছে সেই সব অংশ যেখানে যৌনতার গন্ধ আছে। হুমড়ি খেয়ে অনেকে বই কিনে সেগুলো খুঁজে খুঁজে পড়েছেন এবং আরও খুঁজেছেন। পর্নো খুঁজে হয়রান এসব অনেক পাঠক বাকি বই ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার শুরু করেছেন এই বই অশ্লীল। তারা অশ্লীলতাই কিনতে চান।

বস্তুত এই বইটি তসলিমার নিজের জীবন নিয়ে লেখা। এখানে একজন নারী স্বচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিমান হয়েও যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান তার সহজ-কঠিন-নিষ্ঠুর অধ্যায়ের সরল অকপট বর্ণনা আছে। আছে একজন না মেনে নেওয়া নারীর নিজের জীবন নিজের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টার-সাফল্যের-ব্যর্থতার বর্ণনা। সেখানে পুরুষের ভালোবাসা, প্রতারণা, ছল, নির্যাতন আছে আবার আছে নারীর হাল ছেড়ে না দেবার যন্ত্রণাদায়ক আনন্দ, আছে নিষ্ঠুর উন্মোচন। আবার আছে পুঁজির কাছে একজন লেখকের আত্মসমর্পণের বর্ণনা। আছে খ্যাতির মোহে পরিশ্রমের বদলে তাড়াহুড়া, শর্টকাট রাস্তা খোঁজার গ্লানি। আছে দায়িত্বহীন অবিবেচক আচরণের আত্মস্বীকৃতি। পাশাপাশি এই বই শুধু তসলিমার 'ব্যক্তিগত' জীবন নয়, উপস্থিত করেছে সমসাময়িক আরও অনেক বিষয় যা মানুষকে স্পর্শ করে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্গতি, সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা, প্রতাপশালীদের নিষ্ঠুর দাপট, মুখোশধারীদের প্রতারণা, স্বৈরশাসন, বিদ্যমান রাজনীতির শূন্যতা ইত্যাদি। বকুলির নীরবতা, তার মার আকুতি।

তসলিমার লেখা থেকে এটা বোঝা যায় এখানে ভনিতা নেই। আবার এটাও বোঝা যায় যে, এগুলো আগের অনেক লেখার মতোই অনেকখানি স্বতঃস্ফূর্ততার ফসল। স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেও তার একটা ধারাবাহিকতা আছে। এর কারণেই তার মধ্যে একটা শক্তি আছে আবার এর বিপদও আছে। স্বতঃস্ফূর্ততায় হারিয়ে যায় অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়, মুখ্য হয়ে ওঠে গৌণ, বাজার যাকে চাটি মেরে নিজের করে নেয়। অগভীরতা ভ্রান্তি আনে। তসলিমা নিজেও স্বীকার করেছেন কীভাবে প্রকাশকদের চাপ, আগাম টাকা তাকে দিয়ে তাড়াহুড়ায় লেখা লিখিয়ে নেয়। তসলিমা যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন, তার লেখা থেকে এদেশের নারী যে ভাষা খুঁজছিলেন সেখানে এই অর্থ-খ্যাতির মোহ সবসময় দায়িত্বশীল ভূমিকা উপস্থিত করেনি। তিনি নিজেই বলেছেন খুব ভেবেচিন্তে তিনি কিছু করেন না কিছু লেখেন না। ঠিকই, এর স্বাক্ষর আমরা স্পষ্টই পাই। কিন্তু একটা বড় অচলায়তন সরাবার কাজে হাত দিলে, আরও অনেকের কথা বলতে গেলে, নারীর নীরবতা ভেঙে এগুতে গেলে ভেবেচিন্তেই বলতে হয়। নইলে শত্রুর বিরুদ্ধে ছোড়া অস্ত্র অজান্তে শত্রুর জন্যই সুবিধাজনক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তাঁর লেখা ব্যবহার করে তাই বাংলাদেশ, ভারত ও পশ্চিমের জনশত্রুরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে উদ্যত হয়েছে বারবার।

লেখার জন্য, নিজের মতামতের জন্য তসলিমার ভোগান্তি কম হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা তো বটেই, শারীরিকভাবে হামলা হয়েছে তাঁর উপর। ঘরছাড়া হয়েছেন। ফাঁসির হুমকি নিয়ে ঘুরেছেন, শেষমেষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তারপরও তাঁর লেখা, শত ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সত্ত্বেও, অব্যাহত থেকেছে এবং বকুলির নীরবতা ভাঙায় শক্তি যুগিয়েছে, যোগাচ্ছে।

১৭ ডিসেম্বর ২০০৩

অসাধারণ তরুণ, আজীবন বিপ্লবী

সইফ-উদ্-দাহার (১৯২১-১৯৯৭) যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। কিন্তু বয়স, জরা, ক্লান্তি তাকে কখনই কাবু করেনি। এক অসাধারণ তারুণ্য তাকে এমন এক ব্যক্তিত্ব দান করেছিল, যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করতো। গভীর আত্মবিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত বহাল রাখতে পেরেছেন। জরাগ্রস্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজের মধ্যেই ছিলেন, বিপ্লবী চিন্তার জগত তাঁর শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

তাঁর প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা দুটি। কিন্তু তার অগ্রন্থিত লেখার সংখ্যা অনেক। এর বেশিরভাগই নির্দিষ্ট সময়ের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শিক লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে লেখা।

(ডাক্তার) সইফ-উদ-দাহার এর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগে। তাঁর লেখা আমি প্রথম পড়ি *সংস্কৃতি* পত্রিকায় ১৯৭৪ সালে। লেখার শিরোনাম ছিল 'দুর্বৃত্তপুঁজি ক্ষেপে গেছে'। সইফ-উদ্-দাহার বা ডাক্তারদার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৮/৭৯ সালে। সে সময় আমি ক্রমে যেসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং কমবেশি সক্রিয় হতে থাকি তিনি ছিলেন সেগুলোরই সংগঠক ও নেতা : বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাঙলাদেশ লেখক শিবির ইত্যাদি কয়েকটি সেরূপ সংগঠন।

এরপর তাঁর সঙ্গে একসাথে অনেক কাজ করেছি, কথা বলেছি, শুনেছি, তর্ক-বিতর্কও করেছি। এসবের ভেতর দিয়ে তাঁকে গভীরভাবে দেখেছি।

তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কঠোর ও নরম, জটিল ও সরল। সংগঠনের সভা বা সম্মেলনে মতাদর্শিক বিতর্কের তিক্ত আলোচনায় যারা তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন রাজনৈতিক মতাদর্শিক সাংগঠনিক প্রশ্নে তিনি কতটা কঠোর অনমনীয় হতে পারেন। অনুনয়, বিনয়, কান্না, কাকুতি-মিনতি দিয়ে এসব প্রশ্নে তাঁকে নমনীয় বা প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না। তাঁর পুরোনো সহযোদ্ধারা তাঁকে সেজন্য ঠাট্টা করে বলতেন, 'ডাক্তারদার কখনো হার্টের অসুখ হবে না, কেননা তাঁর হার্টই নেই।' কিন্তু এই একই মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতেন তখন প্রকাশিত হতো তাঁর আরেক রূপ। সেখানে তিনি খুবই নমনীয়, খুবই স্নেহপ্রবণ, আন্তরিক এবং সংবেদনশীল মানুষ।

সরলতা তাঁর পোশাক-আশাক, জীবন-যাপন, মেলামেশা সব কিছুর মধ্যে খুব স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হতো। শিশুদের সঙ্গে মিশতে সেজন্যই তাঁর কোন অসুবিধা হতো না।'শিশুর মতো সরল' কথাটি আক্ষরিকভাবে বুঝতে গেলে ডাক্তারদাকেই দেখতে হয়। কিন্তু এই সরল মানুষের চিন্তার জগৎ খুলে দেখলে দেখা যাবে সেই জগৎ এত সহজ সরল নয়। মানুষ ও জগৎ নিয়ে সেখানে গভীর চিন্তার সমাবেশ। জগৎ ও মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রবাহ এবং ওঠানামার জটিল গ্রন্থি খোলার সেখানে অবিরাম চেষ্টা। এই চেষ্টায়, এই জটিল থেকে জটিলতর জগতে দিনরাত্র নিমগ্ন থাকার কারণ কী? উদ্দেশ্য কী? জ্ঞানের জন্য তো জ্ঞান নয়, সাধনার জন্য সাধনা নয়। প্রশ্নের গিট খোলার তাগিদ আসে অবস্থার পরিবর্তনের মানসিক চাপ থেকে।

ডাক্তারদার সঙ্গে যাদেরই চলা, কথা বলা, কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, ডাক্তারদাকে দেখলে মনে হত যেন একজন ধ্যানমগ্ন মানুষ। যখন তিনি কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিংবা কোন বই পড়ছেন কিংবা ভাবতে ভাবতে পথ চলছেন তখন তার অন্যসব জগৎ অনুপস্থিত হয়ে যেত। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি হয়তো নিজেই নিজের সঙ্গে কিংবা দুই মতের মধ্যে বাদানুবাদ করছেন। সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করছেন। অনেক সময় গভীরে ডুবে আছেন কোথাও। সময় যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ডাক্তারদার হুঁশ নেই।

সইফ-উদ-দাহার কিশোর বয়স থেকেই বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার যে চিন্তা-উদ্বেগ গড়পড়তা মানুষকে অস্থির করে রাখে, তার শৃঙ্খল থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন শুরুতেই। পশু চিকিৎসায় পড়াশোনা করেছিলেন কৃষকদের মধ্যে সংগঠনের কাজের সুবিধার জন্য। সাংগঠনিক কাজ ও ব্যক্তিগত কাজকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। দেখেননি বলে কমিউনিস্ট আন্দোলন বারবার যেসব গর্তে পড়েছে সেসব গর্ত তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার পর পার্টি যখন একদিকে বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে ঢুকে কাজ করা, অন্য দিকে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে প্রস্তুতিহীন মারদাঙ্গা আন্দোলনে আবর্তিত হতে থাকল সে সময় তিনি এগুলোর প্রতি প্রশ্ন রেখেই কাজ করেছেন। নিজে পরে আরও পরিষ্কার হয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যকার বাদুড়পন্থী প্রবণতার বিরুদ্ধে একটানা দীর্ঘ লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন।

১৯৬০-এর দশকে মস্কোপন্থী পিকিংপন্থী যে বিভাজন সৃষ্টি হয় তার ভেতর ছিল আসলে দুটো মতাদর্শিক অবস্থান। একদিকে চীন-পাকিস্তান অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত পক্ষ, একদিকে গণসংগঠন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে শ্রেণিশত্রু নিধনের রাজনীতি অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গা ভাসিয়ে দেয়া, এগুলোর প্রতিও তিনি সব সময় পর্যালোচনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। এগুলোকে তিনি গ্রহণ করেননি, কিন্তু নিজে আন্দোলন থেকে সরেও যাননি। শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব কাজ এগিয়ে নিয়েছেন, পাশাপাশি তাত্ত্বিক সাংগঠনিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নেতৃত্ব যে বিবিধ চেহারায় ভয়াবহ বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তার দায় আমাদের আজও টানতে হচ্ছে। ডাক্তার সইফ-উদ্-দাহার সে সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং মুক্তিযুদ্ধে যে বিপ্লবী মাত্রা যোগ করা কমিউনিস্টদের দ্বারাই সম্ভব ছিল, তার দায়িত্ব নিজের সীমিত পরিসরে তিনি পালন করেছিলেন।

১৯৭২-এর পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন যে বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিকভাবে তার থেকে এখনো তা মুক্ত হতে পারেনি। ডাক্তারদা ছিলেন সেই সীমিত সংখ্যক কমিউনিস্ট সংগঠকের একজন যারা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব, তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ধারাবাহিকতাতেই, সেই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এবং সে কারণেই নতুনভাবে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন গঠনে মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ডাক্তারদার মনোযোগ সে সময় থেকে আরও বেড়ে যায়। ক্রমে তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় অর্থশাস্ত্র।

অর্থশাস্ত্র বা রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে জ্ঞানের এমন শাখা বোঝায় না যেটি সমরূপ, যার বক্তব্য মতাদর্শমুক্ত, যার বিশ্লেষণ কাঠামো সার্বজনীন। বর্তমানে যে অর্থশাস্ত্রের আধিপত্যের মধ্যে আমরা বসবাস করছি সেটি হল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি মতাদর্শিক সরঞ্জাম। কিন্তু এই অর্থশাস্ত্র নিজেকে সার্বজনীন হিসেবে উপস্থিত করে, এই অর্থশাস্ত্র যেসব অনুমিতি, চলক কিংবা কাঠামোকে আদর্শ হিসেবে ধরে, সেগুলোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ না করে সমাজের চিন্তার কাঠামোর পরিবর্তন করা যাবে না। মূল অর্থশাস্ত্রীয় কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে, 'প্রগতিশীল' হতে গেলে বড়জোর দারিদ্র্য বিমোচন নামের চরম প্রতারণামূলক কর্মসূচির নামতা পড়া যাবে, এর বেশি অগ্রসর হওয়া যাবে না।

সইফ-উদ্-দাহার অর্থশাস্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। বেঁচে গিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যে যত শিক্ষিত সে তত জ্ঞানী। বাস্তব জগতে এর প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। সইফ-উদ-দাহার নিজের মতো করে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভালোলাগা অনুযায়ী, অর্থশাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। অর্থশাস্ত্রীয় প্রাধান্য বিস্তারকারী খাঁচাটিকেও তিনি শনাক্ত করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত কিছু কিছু প্রশ্ন অনেক প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদকে বিভিন্ন সময়ে বেকায়দায় ফেলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, বিশ্বব্যাংক ও তার অনুচর অর্থনীতিবিদেরা একঘেয়ে সুরে সব সময় বলতে থাকেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য সংকট হচ্ছে। 'বিদেশী সাহায্য' হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিক থেকে বিদেশে অনুন্নত

দেশগুলোর জন্য সাহায্য বিশেষ। এগুলো যে কত বড় ভুল সেটা তথ্য যুক্তি দিয়েই তিনি প্রমাণ করেছিলেন। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সর্বশেষ রূপ নিয়ে, এর ভেতরের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ধরন নিয়ে তিনি যে চিন্তাগুলো করছিলেন, তাঁর যে পর্যবেক্ষণগুলো ছিল সেগুলো অর্থশাস্ত্রকে নতুনভাবে উপস্থিত করে।

জীবনের শেষ দিকে এসে সইফ-উদ্-দাহার প্রত্যক্ষ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের বড় বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের শেষ দিকের প্রধান মনোযোগের বিষয়।

বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের রাষ্ট্র, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও তার ব্যবহার, এসব উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ ও তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নতুন শ্রেণির উদ্ভব ইত্যাদি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া বিপ্লবী রাজনীতির বিপ্লবী সংগঠনের ভূমিকা, তার বর্তমান যে ধরন তার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়েও তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

তবে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে, অর্থশাস্ত্র চর্চা করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো অর্থশাস্ত্রের সীমায় আটকে গেছেন; মানুষের সচেতন ভূমিকা, ইতিহাসের উঠানামা, বিভিন্ন ধাপ-অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করায় জটিল বাধারও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্বকে খর্ব করে না।

বিশ্বব্যাপী মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যে পর্বে এসে প্রবেশ করেছে সেখানে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আরও অনেক মৌলিক কাজের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এসব বিষয়ে আমাদের অনেক কিছুকেই পর্যালোচনা করতে হবে, সৃজনশীলভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বর্তমান সময়ে এই কাজগুলো সমাজ রূপান্তরের বিপ্লবী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ডাক্তার সইফ-উদ-দাহার উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের সঙ্গে, এই কাজগুলোর মধ্য দিয়েই, আমাদের সাক্ষাৎ ঘটতে থাকবে।

১০ এপ্রিল ১৯৯৯

শামসুর রাহমান

মৃত্যুর আগে গত কয়েক বছরে শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) কবিতায় কি একটু বেশি হতাশার সুর ছিল? কিংবা ছিল কি চারপাশের জগতে বীভৎস নিষ্ঠুরের উল্লাস দেখার ক্লান্তি? কবিতায় কি পরাজিতের বেদনা কিংবা হুতাশ ছাপিয়ে ওঠেছিল? না হবার কি কারণ আছে কোনো? যে জগতে আমরা বসবাস করি সেখানে কোন সংবেদনশীল মানুষের সৃষ্টিতে এসব কী করে অনুপস্থিত থাকবে? এসব কি শামসুর রাহমানের একান্তই ব্যক্তিগত বোধ না তার মধ্যে আমরা আমাদের আরও অনেকের শ্বাসের শব্দ পাই? একান্ত ব্যক্তিগত বলে আসলে কি কিছু আছে?

শামসুর রাহমানের এই কবিতার সঙ্গে অনেকের মতো আমার পরিচয়ও দীর্ঘদিনের। কৈশোরে নিজের কবিতা লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও কাব্যজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরিতে তা কোনো বাধা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ তো পাঠ্য বইতেই হয়েছে, তাছাড়া রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী কোথাও কোথাও রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত জয়ন্তী দেখেছি—করেছি কৈশোর থেকেই। এ সবের সূত্রে তাদের সঙ্গে কার না টুকরা টাকরা পরিচয় ঘটে? আমার যে সেখানেই শেষ হয়নি সেটাই স্বস্তির কথা।

এক পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমার কবিতা পাঠ, উপলব্ধি আর কবিতার লৌকিক-অলৌকিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল নন, কবিতার প্রতি আমার আকর্ষণ দানা বাঁধে বস্তুত জীবনানন্দের কারণে। সেটা স্কুল উত্তর এবং তারপর কলেজ জীবনে। এ সময়েই ক্রমে পরিচয় হতে থাকে নবীনতর কবিদের সাথে। দুজন তখন বিশেষ, একজন আল মাহমুদ অন্যজন শামসুর রাহমান। সে

সময় বাংলাদেশে তোলপাড় সময়। এই দেশের কবি নাট্যকর্মী শিল্পীরা তখন অনেক উচ্চকণ্ঠ। ক্ষোভ, ক্রোধ, আশাভঙ্গের বেদনা, ভালোবাসার তীব্রতা, নতুন নতুন ভাবনা সক্রিয়তায় মাতাল সবাই। এই টানে আমাদের মতো অনেকেই তখন ছোটাছুটি করি।

কবি শামসুর রাহমানকে সতর্ক সম্পাদক হিসেবে আবিষ্কার করি এর কিছুদিন পরে। ১৯৭৩/৭৪ থেকেই আমি তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা *বিচিত্রা*য় নিয়মিত লিখি। সেখানেই এক পর্যায়ে শামসুর রাহমান দায়িত্ব নেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির। তিনি তখন গদ্যও লেখা শুরু করেছিলেন। কবির গদ্য অন্যরকম এক আনন্দের খোরাক ছিল। আরও পরে তিনি যখন রাজনীতি সমাজ নিয়ে লিখতে থাকেন সেটা অবশ্য ধরিয়ে দেয় অনুভূতির তীব্রতা সমাজ রাষ্ট্র নিয়ে উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়।

শামসুর রাহমানের কবিতায় আমরা পেয়েছি নানা স্ববিরোধিতা আর জটিলতার নগর, পেয়েছি ব্যক্তির খোঁজ। অন্তর্গত বোধ দুঃখ আনন্দ বেদনা ক্ষোভ ভয় আর পেয়েছি প্রবল ভালোবাসার টান। কিন্তু এগুলোর বাইরে যেখানে তিনি বিশিষ্ট সেটি হলো কবিতার রূপকল্পে, তার মায়াময়তা আর ছন্দময়তার মধ্যে সমষ্টির আবেগ ক্রোধ ভালোবাসা আর রক্তের ডাক; যা তিনি শৈল্পিক শক্তিমত্তা দিয়ে ঠিকই ধারণ করতে পেরেছিলেন।

শামসুর রাহমানের গুরুত্ব তো শুধু কবি হিসেবে নয়, আবার সেই কবি হিসেবেও যিনি নিজেকে অতিক্রম করতে সক্ষম তাঁর কবিতায়। শামসুর রাহমানের সঙ্গে যারা মিশেছেন তারা বোধকরি এমন একজন মানুষকেই দেখেছেন যিনি সরল, দ্বিধাগ্রস্ত, বিনয়ী, সংশয়ী এবং নিশ্চিতভাবে দুঃসাহসী নন। কিন্তু এই দেশের প্রতিটি উথাল-পাথাল সময়ে, যখন মানুষ আক্রান্ত কিংবা মানুষ যখন কঠিন দুঃসাহসে প্রতিরোধে শামিল, আমরা তার স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় ঠিকই পেয়েছি। 'আসাদের শার্ট' কবিতা বাদ দিয়ে কি এখন আমরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান-এ প্রাণ খোঁজার চিন্তা করতে পারি? ১৯৭১-এ তিনি তৎকালীন *দৈনিক পাকিস্তান*-এ কর্মরত ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে দেশের ভেতরে মৃত্যুর মধ্যে বেঁচে থাকা মানুষের রক্তক্ষরণের শব্দাবলী আমরা পাই তাঁর *বন্দী শিবির থেকেই*। এরপর দুর্ভিক্ষ, বাকশাল

সামরিক শাসন প্রতিটি পর্বেই শামসুর রাহমান আছেন। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি যে বাংলাদেশকে প্রবলভাবে উপস্থিত করেছেন সেখানে আছে এই অঞ্চলের বিশিষ্টতা, শব্দে প্রতীকে আর লড়াইয়ে।

শুধু কবিতাতেই নয় দুর্বল একটি আপাত চেহারা থাকলেও যখন সবচাইতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবার দরকার ঠিকই নিয়েছেন তিনি। ১৯৭৫-এ সব দল বাতিল করে বাকশাল হলো, দলে দলে সবাই বাকশালের সদস্যপদ নেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো, রাজনৈতিক একাত্মতা থেকে নয়, ভয়ে আর সুবিধাবাদিতায়। তখন অনেক 'বিপ্লবী'ও একই কারণে সেই স্রোতে শামিল হয়েছিলেন। হাতেগোনা যে কয়জন নিজের মত ও পথকে এক করে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে শামসুর রাহমান একজন। শাহাদৎ ভাইয়ের কাছে শুনেছি, শামসুর রাহমান শূন্য পকেটের কাপড় বের করে তখন বলেছিলেন, 'কী আছে আমাদের, এক আত্মমর্যাদা ছাড়া? সেটাও যদি ভয়ে সমর্পণ করি তাহলে আর অবশিষ্ট কী থাকে?' এই আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর কবিতাকেও ঋজু রেখেছে সারাপথ।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যতক্ষণ শরীর অনুমোদন করেছে ততদিন তিনি সক্রিয় থেকেছেন চিন্তায়, লেখায় এমনকি সামষ্টিক উদ্যোগে। তাঁর সঙ্গে সর্বশেষ যে অনুষ্ঠান একসঙ্গে করেছি সেটা ছিল হুমায়ুন আজাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর। তখনও তার শরীর কাজ করছে না ভালো। কিন্তু তিনি ঠিকই এসেছিলেন, দীর্ঘসময় অনুষ্ঠানে ছিলেন। এরকম আরও অনেক সমাবেশ তাঁকে ঠিকই পেয়েছে।

কবির বিশাল হৃদয় কজন কবির থাকে? তাঁর ছিল। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, নিপীড়ন আর আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে তার সংশয় দেখিনি কখনো। এই কারণেই সব হতাশা আর ক্লান্তির বোধের মধ্যে তাঁর কবিতায় সেই মানুষকে পাওয়া যায় যে স্বপ্ন দেখে এবং দেখে মানুষেরই সবলতাকে।

২১ আগস্ট ২০০৬

সেলিম আল দীনের সৃষ্টিকথা

সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৬ সালে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তখন নতুন ছাত্র আর উনি তরুণ শিক্ষক। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দাঁড়াতে সময় লাগেনি। আমি তখন ফজল, ফরীদি, মঞ্জুসহ 'শিরোনাম' 'লেখক শিবির' 'প্রগতিশীল পাঠচক্র' 'কলিমুল্লাহ গ্রন্থাগার' ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন বের করছি। আর তখন বিচিত্রার নিয়মিত লেখক হিসেবে নানা বিষয় নিয়ে পড়ি, লিখি, কথা বলি। সেলিম আল দীন, মোহাম্মদ রফিক ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ক্যাম্পাসে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কথা, আড্ডা এমনকি বিতর্ক প্রায় নিয়মিত।

১৯৭৭ সালে প্রধানত সেলিম ভাই এর উদ্যোগেই জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসে একটি নাট্য সপ্তাহ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রথম তো বটেই সারা বাংলাদেশেই এ ধরনের উদ্যোগ ছিল প্রথম। এই নাট্য সপ্তাহ কেন্দ্র করে প্রায় দেড় মাস ধরে যে কী প্রাণোচ্ছল তৎপরতা হলো তা এখনো অনুভব করতে পারি। নাট্য সপ্তাহ ঘিরেই তৈরি হলো অনেকগুলো নতুন নাটক। নতুন নাটক শুধু নয় নতুন নাট্যকার, নতুন অভিনয় শিল্পী, নতুন পরিচালক, নতুন মঞ্চ পরিকল্পনাকারী, নতুন অনেক শিল্পী, সব নতুন! কী যে উৎসাহ উদ্দীপনা। সব জায়গায় নাটক নিয়ে উদ্দীপ্ত আলোচনা। নাটক লেখা হচ্ছে, রিহার্সেল হচ্ছে, পরিকল্পনার শেষ নাই। দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ হল নাটক লেখায়। সেই নাটক কতবার ঠিক ঠাক হল তার সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। ফরীদি তো ছিলই, মেহেদী, বাচ্চু, রঞ্জু, হাসিসহ উৎসাহী নতুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এইসব কিছু করিয়ে নেয়ায় সেলিম আল দীনের ক্লান্তি নেই। হলো ঠিকই সবগুলো নাটক।

প্রত্যক্ষ করলাম, ক্যাম্পাসে আমাদের চারপাশের মানুষেরা মাসেরও বেশি সময় ধরে সৃজনশীলতার এক অদ্ভুত নেশা আর আনন্দে ফুলে ফেঁপে উঠলো, নতুন পরিচয়ে শক্ত পায়ে দাঁড়ালো। এদের মধ্যেই ফরীদি ছিল। অভিনয়ে প্রবল নেশা ওর অনেক আগে থেকেই। কিন্তু এই নাট্য সপ্তাহের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের নতুন পর্বের মঞ্চ নাটকের সঙ্গে ওর যোগ তৈরি হল, বাড়তি হল নাট্য নির্দেশক পরিচয়। ইমদাদ বাচ্চুর লেখা আর ফরীদির নির্দেশিত নাটকটিই সে সময় শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, নাটকটির নাম ছিল 'আত্মস্থ আগুন ও হিরন্ময়ীদের বৃত্তান্ত'। এই নাট্য উৎসবে সেলিম আল দীনের সূত্রে ঢাকা থিয়েটারের অনেকেই আসা যাওয়া করতেন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফও। এখান থেকেই ঢাকা থিয়েটারের মাধ্যমে হুমায়ুন ফরীদির নতুন যাত্রা শুরু, মঞ্চ-টিভি। আর ক্যাম্পাস ঘিরে সেলিম আল দীনের নাট্যচিন্তার ভিতও এখানেই তৈরি হয়। তখন থেকেই তাঁর এ বিষয়ে পূর্ণ বিভাগ খোলার চিন্তা, যা পরে 'নাটক ও নাট্যতত্ত্ব' বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ততদিনে আমি সেলিম আল দীনের লেখা *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী* দেখেছি (পরে যার নাম হয়েছে *মুনতাসীর*)। এটি রচিত হয়েছিল ১৯৭৪/৭৫ সালে। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এই জনপদের মানুষকে যা দেবার কথা ছিল তা দিতে পারেনি। কিন্তু যা দিয়েছে তার মধ্যে আছে সাহস, স্বপ্ন আর প্রত্যাশার শক্তি। এই সাহস সৃজনশীলতার জগতকেও প্রবল ঝাঁকি দিয়েছিল। এতদিনের প্রথাগত অনেক কিছুই তখনকার তরুণ প্রজন্মের কাছে পানসে। তাদের মধ্যে নতুন সৃষ্টির অদম্য শক্তি।

সেলিম আল দীনের বেড়ে ওঠা তো বটেই শুরুটাও এই পাটাতনের উপরেই। ঢাকা থিয়েটারসহ নাটকের জগতে যে হুলস্থুল শুরু হয় সেটা সেই পরিবেশেরই ফসল। মুক্তিযুদ্ধের অন্য অনেক স্বপ্নই ভেঙে পড়ল। নাটক সেই ভেঙে পড়ার প্রতিবাদের সৃজনশীলতার মধ্যেই প্রবলভাবে দাঁড়াল।

১৯৭৪-৭৫ এ লেখা এই নাটকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাই বাংলাদেশের সেই শ্রেণির উদ্দেশ্যে যারা সব কিছু খেয়ে অসম্ভব রকম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই নাটক সম্ভবত সবচাইতে বেশি মঞ্চস্থ নাটক। যতদিন গেছে ততই এই নাটকটি

আরও বেশি বেশি প্রাসঙ্গিক হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ভেঙেচুরে বহু হাজার কোটিপতি তৈরি হয়েছে যে প্রক্রিয়ায় সেই প্রক্রিয়াতেই আন্তর্জাতিক পুঁজির দখল আধিপত্য আর হজমের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। এই অভিজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের। *মুনতাসীর* দিয়ে যে সেলিম আল দীনের শুরু তাঁর শেষ হল নিমজ্জন দিয়ে, যা বিশ্বকে হাজির করেছে এক সূত্রে গেঁথে, এক বিশাল ক্যানভাসে।

এরপর যে নাটক মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম সেটি *শকুন্তলা*। এখানেই সেলিম আল দীনের আরেক অধ্যায় শুরু বলে আমার ধারণা। এই জনপদের মিথগুলোকে ভেঙে তার মধ্যে মানুষের জয় পরাজয় আর অবিরাম লড়াই-এর ভাষা আবিষ্কার করা। মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য রূপের মধ্যে টানাপোড়েন, মানুষের অসীম আকাঙ্ক্ষা আর তার শরীরী সীমার সংঘাত। নাটকের বিষয়বস্তুই দাবি করে নাটক উপস্থাপনের পুরনো সব রীতি ভেঙে ফেলার। সেটা সম্ভব হলো নাসিরউদ্দিন ইউসুফের নেতৃত্বে এক দল কর্মীর নিষ্ঠা মেধা আর সর্বোপরি আত্ম-উপলব্ধির শক্তির কারণে।

সেদিক থেকে *কিত্তনখোলা* অন্য আরেক অধ্যায়ের সূচনা করে। সেলিম আল দীন ঠিকই অনুভব করেছিলেন যে এটা এক মহাকাব্যের কাঠামোতে দাঁড়িয়ে গেছে। মহাকাব্যকে মঞ্চে আনা যাবে কী করে? এই মহাকাব্যে দেব-দেবী নয়, চরিত্র সব মানুষ, গ্রামগঞ্জের মাটি ও নদীর খুব চেনা মানুষ। কিন্তু সেই চেনা মানুষদের ভেতর একদিকে অচেনা বিশ্বাস, রীতি, প্রথা, ভালোবাসা, শিল্প সৃষ্টির অব্যাহত তাড়না;আবার অন্যদিকে সমাজের নির্মম ক্ষমতার সম্পর্ক—বঞ্চনা, প্রতারণার উপর টিকে থাকা ক্ষমতার সৌধ। প্রচলিত গতানুগতিক আমদানি করা পোশাকি নাটকের রীতি থেকে বহুদূর চলে গেল *কিত্তনখোলা*।

শুধু মানুষই এখানে নতুনভাবে হাজির হল তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশের এদেশীয় ভঙ্গি গল্প বলা, কবি গান, মিথকেন্দ্রিকতা, ভাষা। মেলাকে কেন্দ্র করে পুরো নাটকটি সাজানো। আসলে নাটক বলা ঠিক নয়, এই অঞ্চলের মানুষকে হাজার বছরের শিল্পমাধ্যমগুলোর নবায়নের মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড প্রকাশভঙ্গী তৈরি করার দুঃসাহস।

আমরা প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, নাচ এগুলোকে আলাদা আলাদা প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে জানি। মানুষ এসব ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে—তার নিজ নিজ প্রকাশভঙ্গী, ক্ষমতা কিংবা বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে। এই বিভাজন খুব বেশি দিনের নয়। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এখানেও জ্ঞানের বিশেষীকরণ ঘটাতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে মানুষের ভাব কিংবা সৃজন। আমি নিজেও নিজের অনুভূতি বা বিশ্লেষণ বা প্রতিবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে মাধ্যমের সীমাবদ্ধতায় বারবার আক্রান্ত হই। সেলিম আল দীনের সবচেয়ে বড় অর্জন একটি অখণ্ড প্রকাশ মাধ্যম উপস্থাপন।

সেলিম আল দীন নিজেই বলেছেন—

> '*কিত্তনখোলা* ও *কেরামত মঙ্গল* লেখার সময় নাটককে আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয়েছে। আমাদের নাটক লিখিয়েদের উচিৎ নাটকের সঙ্গে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি বুঝে নেয়া। রবীন্দ্রনাথের পর্বত তো বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায়। নাটকের আঙ্গিক-চেতনা সংকীর্ণ হলে এ মাধ্যমে মানুষ ভাস্কর্যের আনন্দ তার সঙ্গীতের দ্যোতনা পাবে না। রঁদার ভাস্কর্য নির্মাণ পদ্ধতির পরোক্ষ উপস্থিতি কি রিলকের কবিতার নেই...?' আরেক জায়গায় বলছেন, ইউরোপীয় মানদণ্ডে আমাদের লোকজ আঙ্গিকে উপস্থাপিত শিল্প মাধ্যম উত্তীর্ণ হবে না। কারণ এখানে 'বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। এখানে ঘটনার তাড়া থাকে না, নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপক প্রয়োগে তা হয়ে ওঠে মঞ্চ অলঙ্কার।' রবীন্দ্রনাথে এর ধারাবাহিকতা দেখেন সেলিম, 'গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে, পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তাই দেখি গানের উজ্জ্বল ব্যবহার। সে গানে শুধু সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পাই না—সেখানে দেখতে পাই জাতীয় নাট্যআঙ্গিকের স্রষ্টার এক পিতৃপ্রতীম দার্শনিককে।'

সেলিম আল দীন তাঁর পূর্বসূরিদের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করে তাঁর থেকে দুই হাতে নিয়েছেন। যেমন বলা যায়, মঙ্গলকাব্য তাঁর অন্যতম মনোযোগের জায়গা, ঋণস্বীকারে তাঁর কুণ্ঠা নেই। তাঁর যে কৃতিত্ব তা এই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের মঞ্চকে

শক্ত শেকড় নিয়ে দাঁড় করানো। মানুষকে, সুলতানের ছবির মতো, কিন্তু অন্যরকম সাংস্কৃতিকভাবে শক্ত সমর্থ উজ্জল সৃষ্টিশীল হিসেবে উপস্থিত করা। সেলিমের এসব সৃষ্টিকর্মে তাই মানুষই উঠে এসেছে চেনা অচেনা মিশেল আর কখনো রহস্যময়তা নিয়ে। শক্তি, দুর্বলতা, লোভ, ভালোবাসা, যৌনতা, স্বপ্ন, বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস সব নিয়ে এই মানুষ, সেখানে তার আড়াল কম। দুই এক জায়গায় কিছু সংলাপ এমন হয়েছে যেগুলো দর্শককে মজা দিয়েছে, ভাবনা অনুযায়ী তাকে মনোযোগী করেনি। সেগুলো নিয়ে সেলিম আল দীন আক্ষেপও করেছেন।

পরপর *কেরামত মঙ্গল*, *হাত হদাই*, *যৈবতী কন্যার মন*, *বনপাংশুল*, *চাকা* ইত্যাদিতে এই ধারাতে সেলিম নিজেকেই বারবার অতিক্রম করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর অসম্ভব পরিশ্রম আর নিষ্ঠার ফসল। প্রতিটি চরিত্র, তার ভাষা রূপ গন্ধ তাঁকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে গেছে—পূর্বসূরিদের সৃষ্টি অনুসন্ধানে তাকে বাধ্য করেছে, ভাষা শিখতে প্ররোচিত করেছে, নতুনভাবে নির্মাণ করেছে সেলিম আল দীনকেও। গ্রাম থিয়েটার এই তাগিদেরই ফসল। আমি নিজেও সেলিম ভাই, বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে গ্রাম থিয়েটার এর কার্যক্রম দেখতে গেছি। গ্রাম থিয়েটার সেলিম আল দীনের কাজ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়েছে, আবার এই বিস্তৃত কার্যক্রম সেলিম আল দীনকে পুষ্টি দিয়েছে, মাটি পানি প্রকৃতির বৈচিত্রময় মানুষদের সাথে তাঁকে যুক্ত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, যন্ত্রণার্ত করেছে।

তারপরও বলতে হয়, সেলিম আল দীন, ব্যক্তি ও স্রষ্টা, এই দুই রূপে তাঁকে মেলানো অনেকের জন্যই কঠিন হতো। আমার কাছেও এ এক রহস্য। একটা কথা তাই আমার প্রায়ই মনে হত, ব্যক্তি থেকে তাঁর কাজ অনেক বড়। সেলিম ভাইয়ের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাঁদের পক্ষে বড় ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়া খুবই সম্ভব ছিল। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কথা, আচরণ মাঝে মধ্যে তাঁকে এমনভাবে উপস্থিত করতো যার সঙ্গে মেলানো যেত না তাঁর কাজের অন্তর্গত শক্তিকে।

সেলিমের কাজের অন্তর্গত শক্তি তৈরি হয়েছিল মানুষের ভেতরকার ক্ষরণ আর সেই সঙ্গে তার শক্তির অনুসন্ধানে তাঁর ক্লান্তিহীন যাত্রা থেকে। এক মানুষের মধ্যে কত মানুষ, কত জাতি, কত গোষ্ঠী, কত ভাষা, কত সুর;

নারী পুরুষ আর শ্রেণিস্বার্থ এগুলো তো আছেই। সেই মানুষের বর্তমান কীভাবে পরম্পরা থেকে শক্তি নেয় কিংবা বোঝা বহন করে তার অনুধাবন ছাড়া খণ্ডিত বর্তমানকেই বা কীভাবে বোঝা যাবে? সংকুচিত হয়ে থাকে লাউয়ারা কারণ তাদের কোনোকালের পূর্ব প্রজন্ম নমরুদের সহযোগী ছিল। তারা অভিশপ্ত, অতএব এখনো সেই বিশ্বাস তারা টেনে চলে। ক্ষুব্ধ হয়, কাঁদে কিন্তু এই বিশ্বাসের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু এর শেকড়ে হাত দিতে পারে না।

কিত্তনখোলা সৃষ্টিকর্মে সেলিম আল দীন বলেন—

> 'শবদাহের হরি-ধ্বনির সাথে আগুন দ্বিগুণ হয়। তারপর হুতাশে, গুঞ্জনে, শোকে স্তিমিত শ্বশানের আলো কাঁপে। দূরে পূর্ণিমার চাঁদ। নদীর ওপারে ক্ষেত, তারও পেছনে মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি। মাঘের রাত্রের অনড় বাতাসগুলি আগুনের ভাপে নড়েচড়ে উঠে। মানুষের এই বিশাল পরিবর্তনের ধারা সুগোল চাঁদ ও নদীর বুকে জমা হয় নাকি? চাঁদও রূপান্তরিত হয় কনায় কনায়, নদী নিরন্তর সঞ্চরণশীল। তারও আছে জোয়ার ভাটা, চর, ভাঙা কুলপ্লাবন ও শীর্ণতা। এই তেতো লবনাক্ত জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে রূপান্তর। কিন্তু সে কি এতই সহজ! তার জন্য আছে অশ্রুঘামরক্ত মৃত্যু দুয়ার। আছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।'

এই দীর্ঘ পথে যারা হাঁটে, হাঁটা শুধু নয়, পথ নির্মাণে প্রাণপণ লেগে থাকে, ভুল হয় ঠিক হয়, তাদেরই উজ্জল একজন সেলিম আল দীন। এখন সেলিম শারীরিকভাবে অনুপস্থিত। আমাদের সামনে উপস্থিত তাঁর সৃষ্টিসম্ভার। যার প্রতি আমাদের সময় ও সমাজ এখনো প্রাপ্য মনোযোগ দেয়নি।

১ মার্চ ২০০৮

প্রশ্নের শক্তি: আরজ আলি মাতুব্বর

> 'বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রি আছে, কিন্তু জ্ঞানের কোনো ডিগ্রি নাই। জ্ঞান ডিগ্রিবিহীন ও সীমাহীন।'

ধর্ম নিয়ে খোলা আলোচনা কিংবা বিশ্লেষণ বাংলাদেশের সমাজ ক্ষমতা অনুমোদন করে না। কিন্তু আবার সমাজ, মানুষ, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, বন্ধন-নিপীড়ন-শৃঙ্খল এবং সেগুলো থেকে মুক্তি পাবার লড়াইয়ের বিষয় আলোচনা করতে গেলে ধর্মের প্রসঙ্গ এসেই যায়। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, একটা পথ পেতে গেলে ধর্মের প্রসঙ্গ নীরবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না। এর কারণ কী? কারণ ধর্ম একটা বিশ্বাস হিসেবে যে রূপই ধারণ করুক না কেন এই ধর্মের মধ্যে আসলে বসবাস করে সমাজ। বসবাস করে সমাজের নানা বিধি, নিয়মনীতি, নৈতিকতা, অনুশাসন। সমাজের, রাষ্ট্রের বিধিই উপস্থিত হয় ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে, ধর্মরূপে। এই ধর্মের মধ্যেই আবার থাকে যেভাবে মার্কস বলেছিলেন—

> 'হৃদয়হীনের হৃদয়, নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস।'

ধর্ম নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের (১৯০০-১৯৮৫) ভাবনা বা গবেষণা সর্বোপরি প্রশ্ন উথাপন কোনো পরিকল্পিত কাজ নয়। বাস্তব জীবনে, শৈশবের একটা ধাক্কাই তাঁকে এই পথে নিয়ে আসে, প্রশ্নের মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করায়, প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তাঁকে ব্যস্ত রাখে আজীবন। তাঁর আলোচনা, প্রশ্ন, দার্শনিক বিশ্লেষণ আসলে শুধুইধর্ম গ্রন্থ নিয়ে নয়। ধর্মের গ্রন্থ বা শাস্ত্র আর জনগণের মধ্যে তার উপস্থিতি এক নাও হতে পারে। গ্রন্থ বা ধর্ম জনগণের মধ্যে কীভাবে উপস্থিত তাকে নিয়েই আরজ

আলী মাতুব্বরের বিশেষ মনোযোগ। বস্তুত জনগণ কীভাবে ধর্মকে গ্রহণ করেন তা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না। শাস্ত্রই যদি ধর্ম নির্ধারণ করত তাহলে একটি ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বকালে একই রকম হতো। শাস্ত্র আসলে মানুষের বাস্তব জগতে ধর্মের একটি দিক গঠন করে, সেটাকে আমরা কাঠামো বলতে পারি। কিন্তু তার রক্তমাংস, মাথা-মগজ, শরীর, চোখ ইত্যাদি তৈরি করে তার দাঁড়ানোর জায়গা-তার সমাজ ও তার সংস্কৃতি, তার সময়। এই সবকিছুই আরজ আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেননা তিনি এই সবকিছুর মধ্যে মানুষের শৃঙ্খল উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার থেকে বেরুবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। সেভাবেই তৈরি হলেন আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর।

শহুরে মধ্যবিত্ত কিংবা গ্রামীণ ক্ষমতাবান কারও কাছেই আরজ আলী মাতুব্বর গ্রহণযোগ্যতা পাননি। কারণ এদেশে মধ্যবিত্ত কিংবা বিদ্বৎসমাজ যেভাবে গড়ে উঠেছে সেখানে ভক্তি দিয়ে জগত সংসার দেখাতেই তার স্বস্তি, তাতেই তার আসক্তি। এই ভক্তি যেমন সৃষ্টিকর্তা কিংবা ধর্মের প্রচলিত বয়ানের প্রতি, তেমনি এই ভক্তি বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন দর্শনের প্রতিও। দুটোই তার আশ্রয়। এই আশ্রয়ের খোলসে নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য তার অস্থিরতা এখন আগের চাইতে বেশি। প্রশ্ন তাই তার জন্য বিপদের কারণ, অস্বস্তির কারণ। আরজ আলী মাতুব্বর তাই তাদের কাছে ভীতিকর। হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম বাদে 'বুদ্ধিজীবীদের' কাছে আরজ আলী গৃহীত হননি। কারণ প্রথমত: তিনি তাদের 'উঁচু নাকে' টোকা দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত: আরজ আলীর প্রশ্ন উত্থাপনের ভঙ্গী ও ক্ষেত্রকে তারা বিপজ্জনক বিবেচনা করেছেন।

পা ভাঁজ করে মহাবিশ্ব দেখা

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের এক কোণে বড় হয়েছেন। সেই গ্রাম কোনোদিক থেকেই বিশিষ্ট নয়। অন্য আর দশটা গ্রামের মতোই তার সবকিছু। সেখানে সুন্দর প্রকৃতি এবং নিষ্ঠুর সমাজ দুই-ই ছিল। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাও কোনো অনন্য কিছু নয়। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের জীবনে এইরকম কাহিনি পাওয়া যাবে।

তখন তো বটেই, এখনো। কী সেটা?

> ছোটবেলায় বাবা মারা যান। মাকে নিয়ে যখন তাঁর হাবুডুবু অবস্থা তখন মহাজনী চাপে তাঁর বাবার কৃষিজমি যায়। ঘর ছিল 'দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত ও প্রস্থে চার হাত। ঘরখানা তৈরির সরঞ্জাম ছিল ধৈঞ্চার চাল, গুয়াপাতার ছাউনী, মাদারের খাম, খেজুরপাতার বেড়া ও ঢেঁকিলতার বাঁধ। আর তারই মধ্যে ছিল ভাতের হাঁড়ি, পানির কলসী, পাকের চুলো, কাঁথা-বালিশ সবই। রাতে শুতে হতো পা গুটিয়ে। ঘুমের ঘোরে কখনো পা মেলে ফেললে হয়তো ভাতের হাঁড়ি কাত হয়ে পড়তো বা জলের কলসী পড়ে গিয়ে কাঁথা বালিশ ভিজে যেতো। একটি এঁটেকলা দ্বারা তখন আমরা মায়ে-পুতে পান্তাভাত খেতাম দুবেলা।'[*]

এরকম অবস্থায় যারা বসবাস করেন তাঁদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় এর থেকে খুব ভিন্ন হয় না। কেননা এটা হলো এক দুষ্টচক্রের মতো। এই অবস্থার কারণেই জগতের সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে তাঁদের বঞ্চিত থাকতে হয় আবার এই বঞ্চিত থাকার কারণেই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা সম্ভব হয় না। নিজেদের মেধা, সৃজনশীলতা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়, অপচয় হয়, বিনষ্ট হয়। এই দুষ্টচক্রের থেকে আরজ আলী যে খুব বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তা নয়। তবে এরকম পা ভাঁজ করে শোয়ার অবস্থা থেকে যে তিনি বিশ্বকে দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন সেখানেই আরজ আলী মাতুব্বর হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ।

আরজ আলী মাতুব্বরের গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। পরে এক মক্তব হয়। সেখানে তিনি কিছুদিন পড়েছেন কিন্তু বই খাতা কেনার পয়সা ছিল না। এরকম ভাঙাচোরা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে গেলেও পয়সা লাগে, পরিবারের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন হয়। সেটা ছিল না বলে 'মেধাবি ছাত্র' বলে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ তিনি পাননি। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকেই তাঁর বিদ্যাচর্চার প্রতি দুর্মর টান তৈরি হয়েছিল। সেজন্য তাঁর শৈশবের সবচাইতে আনন্দদায়ক, উত্তেজনাকর ঘটনা ছিল জ্ঞাতিচাচার কাছ থেকে (বাংলা ১৩২১ সাল) সীতানাথ বসাক কৃত

* *স্মরণিকা, আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র*, (১, ২১১-১২)

তৎকালীন ‘দুআনা দামের একখানা আদর্শলিপি বই’ পাওয়া। নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তা আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষের শৈশবের আনন্দ ও বেদনার স্মৃতি। তিনি বলছেন—

> ‘সেদিন আমি যে কতটুকু আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। সেদিনটি ছিলো আমার জীবনের সর্বপ্রথম বই হাতে ছোঁয়ার দিন। তাই আনন্দ-স্ফূর্তিতে আমার মনটা যেনো ফেটে যাচ্ছিলো। আমি বইখানা হাতে নিয়ে নৃত্য করতে করতে গিয়েছিলাম প্রতিবেশীর বাড়িতে সহপাঠীদের বইখানা দেখাতে।.. সারাক্ষণ পড়তাম ও সাথে সাথে রাখতাম।..কিন্তু আমার সে সাধের সম্পত্তিটুকু রক্ষা করতে বিষাদ দেখা দিলো বর্ষাকালে।... চালে বৃষ্টির পানি মানায় না।..অল্প বৃষ্টির সময় যেখানে রাখতাম, বৃষ্টি বেশী হলে সেখান থেকে সরাতে হতো, অত্যধিক বৃষ্টি হলে কোথাও স্থান পেতাম না, তখন উপুড় হয়ে বইখানা রাখতাম বুকের নীচে।..’[*]

আমাদের সমাজের অসংখ্য মানুষের এই অভিজ্ঞতা অভিন্ন হলেও এই লড়াইয়ের টিকে থাকার এবং ফলাফলের অভিজ্ঞতায় আরজ আলী ভিন্ন। ভয়াবহ কঠিন জীবন সংগ্রাম এবং অভাব অনটন তাঁর পুস্তকপ্রীতি আর কৌতূহল শেষ করতে পারে নি। আদর্শলিপি পাবার সাত বছরের মাথায় তিনি অনটনের মধ্যেও ‘পুঁথি-পুস্তক’ সংগ্রহ শুরু করেন। ১৮ বছরে তিনি বই সংগ্রহ করেছিলেন ৯০০। বই-এর আলমারি ছিল না, কেনার সাধ্যও ছিল না। সেজন্যই এক ঘূর্ণিঝড়ে দুর্বল ঘরের সঙ্গে বইগুলোও উড়ে চলে যায়। উন্মাদের মতো চেষ্টা করেছিলেন বহু বছরে বহু কষ্টের সংগ্রহ পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু লাভ হয়নি।

> ‘পরের দিন পথে-প্রান্তরে পেয়েছিলাম দুচারখানা ছেঁড়া পাতা। মাতৃশোকে আমি কাঁদিনি, কিন্তু বইগুলোর দুঃখে সেদিন আমার যে কান্নার বান ডেকেছিল, তা আমি রোধ করতে পারিনি।’[**]

হেরে না গিয়ে আবার বই সংগ্রহে নিয়োজিত হলেন। কিন্তু ঘরের উন্নতি না হওয়ায় বই পুস্তক নতুনভাবে সংগ্রহ করবার ১৭ বছর পর একই ঘটনা

* *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র*, (১, ২১২)

** ঐ (১, ২১৩)

তাঁর জীবনে আবারও ঘটলো। বলাই বাহুল্য, বই রাখতে গেলে শুধু ঘর থাকাই যথেষ্ট নয়, দরকার যথেষ্টই শক্তপোক্ত ঘর।

আরজ আলী গ্রামীণ জগতে মানুষের প্রয়োজন এবং দৈনন্দিন কাজ ও সমস্যা থেকে কখনো বিযুক্ত হননি, হবার অবসরও পাননি। এই যুক্ততা ছিল তাঁর জীবন, ছিল তাঁর জীবিকা। তিনি জমি-জমার আমিন-এর কাজ করতেন। গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন কাজের সুবিধার জন্য তিনি স্বল্প খরচের চুলাও তৈরি করেছিলেন। এর নকশা ও প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করেছিলেন। জমি-জমার পরিমাপের সামান্য ভুলত্রুটি কিংবা জালিয়াতির কারণে বাংলাদেশে কত পরিবার বিপর্যস্ত হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। পরিচিতজনেরা বলেছেন আমিন হিসেবে আরজ আলীর পরিমাপ এতটাই নিখুঁত ছিল এবং তা সকলের বিশ্বাস এমনভাবেই অর্জন করেছিল যে শুধুমাত্র তাঁর কাজের জন্যই বহু মানুষের জীবন বেঁচেছে, বহু সংঘাত আর খুনোখুনির হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে মানুষ। কাজের এই দক্ষতা ও নিষ্ঠার কারণে শুধু নিজ গ্রাম নয়, আশেপাশের একটি বড় অঞ্চল জুড়ে তাঁর একটি গণভিত্তি তৈরি হয়েছিল। এই গণভিত্তিই তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ও প্রথা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের। তাঁকে নাস্তিক বলে কেউ কেউ কোণঠাসা করতে চাইলেও তিনি খুব কদর নিয়ে সারাজীবন কাজ করেছেন। এমনকি আশেপাশের পীর, ধর্মীয় নেতারাও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো ফতোয়া জারি করতে পারেননি। আরজ আলী এই বিষয় নিয়ে সবার সঙ্গেই আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত ছিলেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলে তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এবং সেটাই, এবং প্রশ্ন উত্থাপনের ভঙ্গীই তাঁকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী করেনি, তাঁকে নিঃসঙ্গ করেনি, যদিও ‘স্থানীয় বিশেষ সমাজে’ তিনি দীর্ঘদিন ‘অবহেলিত ও তিরস্কৃত’ হয়েছেন।[*]

জ্ঞানের কি ডিগ্রি হয়?

নিজের নামে পাননি বলে অন্যের নামে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ওয়ারিশদের বুঝিয়ে দিয়ে কাজ করেছেন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি

* *সংক্ষিপ্ত জীবন বাণী*, ঐ, ২, ২৬২

নিজেই বলেছেন—

> 'দিনমজুরী করেছি মাঠে মাঠে আমিনগিরি রূপে। ...টাকা আমার নেই। আর জীবিকা নির্বাহের জন্য আমার টাকার প্রয়োজনও নেই।'[*]

নির্মাণের খরচ কমানোর জন্য লাইব্রেরি নির্মাণে শারীরিক অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি খুব পরিষ্কার ছিলেন এই বিষয়ে যে—

> 'বস্তুত: বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রি আছে, কিন্তু জ্ঞানের কোনো ডিগ্রি নেই। জ্ঞান ডিগ্রিবিহীন ও সীমাহীন। সেই অসীম জ্ঞানার্জনের মাধ্যম স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, তা হচ্ছে লাইব্রেরি।'[**]

এই লাইব্রেরি নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি বহু মানুষের কাছে হাত পেতেছেন, তাঁদের সহযোগিতা চেয়েছেন। কিন্তু সবার কাছ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা একরকম হয়নি। যাদের সঙ্গতি নেই তাঁদের কাছ থেকেই তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন সবচাইতে বেশি। সেজন্যই তিনি বলেন—

> 'লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে স্থানীয় বিত্তবানদের আমি সহানুভূতি পাইনি। তবে মজুরদের সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। ...তাঁরা তাঁদের মজুরীর অর্ধেক নিয়ে আমার লাইব্রেরির নির্মাণকাজ সমাধা করেছেন। কাজেই এ গ্রামের মজুরদের কাছে আমি ঋণী, হুজুরদের কাছে নয়।'[***]

এই লাইব্রেরি যাতে তাঁর মৃত্যুর পরও টিকে থাকে সেজন্য তাঁর উদ্বেগ ছিল এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেছেন। লিখিতভাবে তহবিল, লাইব্রেরি ও যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা জানিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পর নিজের অবশিষ্টাংশ যাতে মানুষের কাজে লাগে সে ব্যবস্থাও করেছেন। মৃতদেহ বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে দান করেন। চক্ষুদ্বয় চক্ষুব্যাংকে।

গ্রন্থের প্রতি আরজ আলীর যে এই অপ্রতিরোধ্য আগ্রহ—তার কারণ কী? ডিগ্রি লাভের তো তাঁর কোনো অবস্থাই ছিল না কারণ মক্তবের পর

* স্বরণিকা, ঐ, ১, ২০৫
** স্বরণিকা, ঐ, ১, ১৯৯
*** স্বরণিকা, ঐ, ১, ২০০

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এদেশের অধিকাংশ মানুষের মতোই, তাঁরও প্রবেশাধিকার কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। ছোটবেলা থেকেই কাজ করেই তাঁর বই সংগ্রহ এবং পড়া। ডিগ্রি লাভের জন্য অবশ্য বই খুব বেশি দরকারও হয় না, চারপাশে দেখি, অনেকসময় ডিগ্রি-পিপাসু ব্যক্তিদের বই-এর প্রতি, বিদ্যাচর্চার প্রতি এক সীমাহীন ঔদাসিন্য এমনকি বিকর্ষণও তৈরি হয়। এইসব মানুষের মনের মধ্যে ছোট-বড় ডিগ্রির অল্পশিক্ষা-কুশিক্ষা এমনই জমাট বেঁধে বসে যে, সব কৌতূহল, জগত-মানুষ-সমাজ সম্পর্কে সব প্রশ্নও বিলুপ্ত হয়। অচল মস্তিষ্ক এবং বড় বড় ডিগ্রি যে একসঙ্গেই চলতে পারে তার উদাহরণ পাবার জন্য আমাদের খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অন্যদিকে আরজ আলী মাতুব্বরের বই-এর প্রতি, বিদ্যাচর্চার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রধান কারণই হলো জগত মানুষ সংসার নিয়ে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে, অপার কৌতূহল এবং মাথায় অনেক প্রশ্ন। আসলে কৌতূহল আর প্রশ্ন এমনই যে তার কোনো সীমা বলে কিছু নেই। কৌতূহল পূরণ করবার জন্য যত প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা যায় ততই নতুন নতুন প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই কেউ যদি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে শুরু করেন সে এক অবিরাম যাত্রা। এই যাত্রা কঠিন কেননা তা প্রচলিত অনেক বোধ-বিশ্বাসকে আঘাত করে, এই যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ কেননা তা বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, এই যাত্রা গভীর আনন্দের কেননা তা ক্রমান্বয়ে সীমানা সম্প্রসারিত করতে থাকে, অসীমের দিকে তাকানোর ক্ষমতা বা আত্মবিশ্বাস দান করে এবং সীমার মধ্যে নিজেকেই যেন পূর্ণ করতে থাকে। আর এই প্রশ্নই আমাদের সামনে আরজ আলী মাতুব্বরকে উপস্থিত করেছে।

মাতুব্বর জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারণে তাঁর সমাজের সকল জ্ঞানচর্চার মাধ্যমকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুঁথি পাঠ করে করে তাঁর পাঠের ক্ষমতা যেমন বাড়ে তেমনি নতুন নতুন চিন্তার জগত উন্মোচিত হতে থাকে। তিনি লিখেছেন—

> 'স্থানীয় কতিপয় তরুণের আগ্রহে পুঁথি ও সারি গানের দল গঠনপূর্বক গান করিতে আরম্ভ করি এবং বিভিন্ন মৌলবি সাহেবদের

নিকট কোরান, হাদিস, কেয়াস, ফেকাহ ইত্যাদি মুসলিম ধর্মগ্রন্থগুলির ও পুরুত-ভট্টচাজ্জিদের নিকট বেদ, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ-মহাভারতাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ ও শ্রবণ করি—উক্ত গানের তর্কসমুদ্র পার হওয়ার জন্য।'[*]

কাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন আরজ আলী মাতুব্বর? তিনি নিজেই বলেন—

'প্রশ্নের কারণ কি? কারণ 'অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন' এবং 'এইরকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ'।[**]

আরজ আলী মাতুব্বর এই সৌধ নির্মাণে হাত দিয়েছেন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়াই।

প্রশ্ন নিয়ে যায় অকূল চিন্তা সাগরে

আমাদের সমাজ প্রশ্ন উত্থাপনকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে। বারবার বলে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। মানুষের মনোজগতে প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ক্ষেত্রে অস্বস্তি এবং ভয় কাজ করে। আরজ আলীর বিশিষ্টতা এখানে যে, তিনি এই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন—

'এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়ণের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকূল চিন্তা-সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।'[***]

যে প্রশ্নগুলি তিনি টুকে রাখছিলেন সেগুলো তাঁর আশেপাশে মানুষের জীবনযাপন, বিশ্বাস, প্রথা, অনুশাসনকে ঘিরেই। এর প্রায় সবগুলোই ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর সব ধর্মগ্রন্থে নাও থাকতে পারে। বাস্তবে

* সংক্ষিপ্ত জীবন বাণী, ২, ২৬০
** সত্যের সন্ধান, ১, ৫০
*** *সত্যের সন্ধান*, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১, ৪৭

ধর্ম যেভাবে উপস্থিত সেটাই আরজ আলীর বিবেচনার বিষয় হয়েছে। এই প্রশ্নগুলি নিয়ে শুধু যে তিনিই অকূল সাগরে ভেসে যাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর আশেপাশের মানুষদেরকেও তা নাড়া দিচ্ছিল ভয়ানকভাবে। আর কিছু নয় শুধুই প্রশ্ন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রচারিত হলো তিনি নাস্তিকতা প্রচার করছেন। এই প্রচার শুনে এলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—

'সমাজ-শাসন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত' সরকারি কর্মকর্তা। ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে (১৯৫১ সালে) ১৩৫৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ বরিশালের তৎকালীন 'ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তবলিগ জামাতের আমির' কে তিনি প্রশ্নের তালিকা দেন। জবাবে সন্তুষ্ট হলে তিনি জামাতভুক্ত হবেন এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। কিন্তু সেই 'করিম সাহেব চলিয়া যাইবার পরে আমি পাইয়াছিলাম কম্যুনিজমের অপরাধে আসামী হিসাবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেন্ট, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির জবাব আজও পাই নাই।'[*]

১৯৫১ সালের ১২ জুলাই কোর্টে জবানবন্দী দিতে গিয়ে আগের প্রশ্নগুলোই সুসংগঠিত আকারে 'সত্যের সন্ধানে' নামে তিনি উপস্থাপন করেন। তিনি বলছেন—

'সত্যের সন্ধান'-এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় আমি দৈহিক নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না ও ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে-বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম-কালাম বন্ধ করে আমাকে বসে থাকতে হলো ঘরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর। বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর

* ঐ

'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর।[*]

শুধু প্রশ্ন উত্থাপনের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে কলম কালাম চর্চা থেকে রাষ্ট্রের বল দিয়ে থামিয়ে রাখা হলো। প্রশ্নের প্রতি এত ভয় রাষ্ট্রের, কলম ও কালাম নিয়ে এত ভয়!

সেই ১৯৫১ সালের প্রশ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে নিভৃত গ্রামে একা, মৃদু কেরোসিনের বাতি নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর যেসব বিষয় অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করেছিল সেগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো—

১. দৈনন্দিন দুর্ভোগ এবং তার পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা।
২. লোভ এবং ভয় কেন্দ্রিক ধর্ম- ডিসকোর্স।
৩. জগতের উদ্ভব এবং তার নিয়ম।
৪. ঈশ্বর, শয়তান, রাম, রাবণ, ফেরেশতা, দেবতা সম্পর্কিত মিথ পর্যালোচনা।

আল্লাহর গজব কিংবা কপালের লেখা

আরজ আলী মাতুব্বরকে বিশেষভাবে ভাবিত করেছে মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগ এবং সে সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব ব্যাখ্যা, সমাজে অধিপতি চিন্তায় সেসব দুর্ভোগ আর অপমান যুক্তিযুক্ত করবার চেষ্টা। এসব বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়েই তিনি ক্রমশ আরও গভীর দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। দারিদ্র্য, অনাহার, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্গতি ইত্যাদি আরজ আলীকে বাইরে থেকে দেখতে হয়নি। তিনি এর মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু এসব ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে করতে তিনি সেই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন যা মনে করে বা মনে করতে শেখায় যে, এসব কিছুই কপালের লেখা, এর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে এযাবতকাল যত বড় দুর্যোগে মানুষ পড়েছেন তার সবগুলোতেই এর কারণ হিসেবে শোনা গেছে যে, এগুলো হলো 'আল্লাহর গজব'। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর কিংবা ১৯৯১ সালে প্রবল

* *অনুমান*, সমাপ্তি, ১, ১৯২

ঘূর্ণিঝড়ে যখন লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিলেন তখন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে ঘুরতে গিয়ে এরকম কথা আমি নিজেও অনেক শুনেছি। ১৯৯১ সালের সেই ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের পর গ্রাম সমান হয়ে গিয়েছিল। অক্ষত ঘর তখন সমগ্র এলাকায় খুঁজে পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো ঘর অক্ষত পাওয়া যাচ্ছিল যেগুলো পাকা। মসজিদও, যুক্তিসঙ্গত কারণেই, যেগুলো পাকা সেগুলো টিকেছিল, ধ্বসে পড়েছিল কাঁচাগুলো। যারা এসব কিছুকে আল্লাহর গজব বলছিলেন তাঁদের বক্তব্য ছিল, 'এগুলো হলো পাপের ফল'। কিন্তু পাপ কি তাদেরই বেশি যাদের ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় থ াকতে হয় এবং যাদের আশ্রয় খুবই ভঙ্গুর? যারা টেকসই বাড়িতে বসবাস করেন এবং নিরাপদ জায়গায় থাকেন হারাম পয়সায় তাদের পাপে গজব হয় কোথায়? এই বিষয়গুলি নিয়েই আরজ আলী প্রশ্ন তুলেছিলেন।

কোনো দেশে ধর্মবিশ্বাস অনেক থাকলেও যদি পানি দূষিত হয় কিংবা পুষ্টির অভাব থাকে সর্বোপরি যদি চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব থাকে তাহলে সেখানে অকাল মৃত্যুর হার অনেক বেশি। শাসকেরা এবং তাদের রক্ষা করতে নিয়োজিত থাকেন যেসব ধর্মপ্রচারক তাঁরা পানি, খাদ্য-পুষ্টি কিংবা চিকিৎসার বিষয়ে প্রশ্ন না তুলে অভিযুক্ত করতে থাকেন যারা গরিব, যারা ভুগছেন তাদেরই। বলেন, দেশের মানুষের ঈমান কম। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন তবে যেসব দেশে ধর্মবিশ্বাস কম সেসব দেশে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু কম? আবার ধর্মের মিথ ধরে প্রশ্ন করেন—

> '...আর যদি যাবতীয় জীবের খাদ্যই মেকাইল বন্টন করেন, তবে জগতের অন্য কোন প্রাণীকে নীরোগ দেহে শুধু উপবাসে মরিতে দেখা যায় না, অথচ মানুষ উপবাসে মরে কেন?' বৈষম্য কেন?[*]

এর সঙ্গেই প্রশ্ন, ভাগ্য, কপালের লেখা। তিনি বলেন—

> 'ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয়?... রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষকে শিক্ষা দিতেছে—কর্ম কর, ফল পাইবে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে ইহার বিপরীত। ধর্ম বলিতেছে— কর্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টে (তকদীরে) যাহা লিখিত আছে তাহাই পাইবে।...বিশেষত মানুষের কৃত 'কর্মের দ্বারা ফলোৎপন্ন' না হইয়া যদি ঈশ্বরের নির্ধারিত

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ৮৫

'ফলের দ্বারা কর্মোৎপত্তি' হয় তবে 'সৎ' বা 'অসৎ' কাজের জন্য মানুষ দায়ী হইবে কেন?'[*]

সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে উত্তরাধিকার প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে আসে। বর্তমান সকল প্রধান ধর্মেই যেহেতু সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাকে স্থায়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে সেহেতু সব ধর্মেই উত্তরাধিকার বিষয়েও নিয়মবিধি আছে। ইসলাম ধর্মে এ সংক্রান্ত যে বিধি সে সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তিনি বলেন—

'মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টনব্যবস্থাকে বলা হয় 'ফরায়েজ নীতি'। ইহা পবিত্র কোরানের বিধান। মুসলিম জগতে এই বিধানটি যে রূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, সেরূপ অন্য কোনটি নহে। এমনকি পবিত্র নামাজের বিধানও নহে। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, ফরায়েজ বিধানের সঙ্গে জাগতিক স্বার্থ জড়িত আছে।' তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বিধান অনুযায়ী সবাইকে সম্পত্তি বন্টন করলে মোট সম্পত্তি দিয়ে কুলায় না। 'দরকার হয় ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা। এই সমস্যার সমাধান করেন হজরত আলী। তিনি যে নিয়মের দ্বারা উহার সমাধান করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'আউল'।[**]

মানুষের কেন এই সংশোধনের দরকার হলো? তিনি প্রশ্ন করেন—

'পবিত্র কোরানের উক্ত বিধানটি ত্রুটিপূর্ণ কেন?'[***]

নারীর অবস্থান, নারীর অধিকার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের 'বৈধতা'- 'অবৈধতা', সন্তানের উপর অধিকার সম্পর্কে সকল ধর্মেই কড়া বিধি-বিধান আছে। ইসলাম ধর্মে কোরান এবং হাদিস থেকে এসব বিধি-বিধান গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয়। আরজ আলী মাতুব্বর এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন 'হিল্লা বিয়ে' নিয়ে। এই বিয়ের প্রথা, অন্যান্য আরও অনেক আইনের মতো, কত নারীর জীবনকে বিষময় ও বিপর্যস্ত করেছে,

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ৭৮
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৩১
*** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৩১

কত নারীকে ভয়াবহ অপমানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছে তার পরিসংখ্যান বের করা অসম্ভব। এটি এখনো চলছে। স্বামী ভুলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার যদি তাঁকে গ্রহণ করতে চায় তবে তার একমাত্র বিধিসম্মত ব্যবস্থা হলো স্ত্রীকে অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে যার সঙ্গে কোনো ভালোবাসা তৈরি হবে না কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর বলেন, 'অথচ পুনঃগ্রহণযোগ্যা নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে 'হিল্লা' প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত ইত্যাদি না-ই হউক, অন্তত তওবা পড়ারও বিধান নাই, আছে নিষ্পাপিনী স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা। একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় কেন?'[*]

তিনি পুরো ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে আরও প্রশ্ন করেন যে, 'এইরূপ মিলন ব্যাভিচারের নামান্তর নয় কি?'[**] অথচ 'ব্যাভিচারের' অপরাধে কত নারী পুরুষকে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ধর্মের বিধান অনুযায়ী নিষ্ঠুর যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ভাগ্য গড়বার জন্য, ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য নানাবিধ আয়োজন ও ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন ধর্মে। ইসলাম ধর্মে শবে বরাত বা হিন্দুধর্মে লক্ষ্মীপূজা এরকম দুটি পদ্ধতি যা দিয়ে বৈষয়িক জীবনে উন্নতি অনুমোদন করেন ঈশ্বর—এরকম বিশ্বাসই প্রবলভাবে কাজ করে। কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর চারপাশের, বিশ্বের নানা দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, সম্পদ বা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না।[***] বরঞ্চ যারা বিপুল সম্পদের মালিক, বৈষয়িকভাবে সফল যাদের বরাত 'ভালো' তাদের বেশিরভাগ এসবের ধারে কাছেও নেই। তাঁদের বরঞ্চ বরাত ভালো হবার পর ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখা যায় ভিন্ন কারণে।

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৩৩
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৩৪
*** *সত্যের সন্ধান*, ১, ৯৯

হিন্দুধর্মে পশুবলি বা ইসলামে কোরবানি প্রথা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁকে খুশি করবার একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে কোরবানির ব্যাপারে উৎসাহ দিনে দিনে বাড়ছে। এইজন্য যে আয়োজন, উল্লাস এবং প্রতিযোগিতা দেখা যায় সেসব আলোচনা করে আরজ আলী বলেছেন এতে পশুর হয় 'আত্মত্যাগ' এবং কোরবানিদাতার হয় 'সামান্য স্বার্থত্যাগ'। মাংস ভোগের মহোৎসব দেখে তিনি প্রশ্ন করেন যে, এই সামান্য স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে যদি দাতার স্বর্গলাভ হইতে পারে, তবে কোরবানির পশুর স্বর্গলাভ হইবে কিনা?[*]

কেন তাকে দাঁড়াতে হয় লোভ আর ভয়ের উপর?

ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্য, নিয়মনীতি সর্বোপরি প্রধান ধর্মগুলোর ধর্মগ্রন্থসমূহকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণের মধ্যে আনা দরকার। আরজ আলী মাতুব্বর বলেন যে—

> 'ধর্মগ্রন্থের বাণীসমূহ লৌকিক বা অলৌকিক যা-ই হোক, তাতে মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বহু মূল্যবান তথ্যও আছে। তাই যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ ও সমান আদরণীয়।'[**]

আরজ আলী নিজে জন্মের পর থেকেই ইসলামের আবহেই বড় হয়েছেন। এই ধর্ম তাঁর অনেক নিকটবর্তী যার একদিকে শাস্ত্রীয় বক্তব্য অন্যদিকে তার বাস্তব প্রয়োগের রূপও তিনি দেখেছেন। কোরান সম্পর্কে তিনি বলেন—'পবিত্র কোরান মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ এবং ইহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। যেসব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক বলিয়া দাবি করা হয়, পবিত্র কোরান তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং অতুলনীয়।'[***]

ধর্ম আর মানুষ কে কাকে তৈরি করে, কে কাকে পালন করে? এর জবাবই ঠিক করে দেয় একজনের মতাদর্শিক অবস্থান। আরজ আলী এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১০৫
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ২৫১
*** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৭২

> 'ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও।'[*]

আরজ আলী বলেন—

> 'সাধারণত আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম।'

ধর্ম প্রবর্তকদের তিনি অভিহিত করেছেন মহাজ্ঞানী হিসেবে যারা 'যুগে যুগে' 'স্রষ্টার' প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং 'মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও' দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে অনেক ধর্ম ও তা নিয়ে বিভেদ। অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘাতও সৃষ্টি হয়েছে এটি থেকে।[**]

কিন্তু 'সাপে নেউলে' সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তুর মধ্যে অমিলের চাইতে মিলই বেশি। আরজ আলী প্রশ্ন করেন, 'লক্ষাধিক পয়গম্বর প্রায় সবাই আরব দেশে জন্মিলেন কেন?' আরব অঞ্চলের বাইরে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলকেই আরও ধর্ম প্রবর্তনের কেন্দ্র হিসেবে পাওয়া যায়। দখল-পূর্ব আমেরিকার ধর্মের খবর এখনো কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। সেমিটিক ধর্মগুলো ধারাবাহিকতা রেখেছে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই—হজরত ইব্রাহিম থেকে শুরু হয়ে ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত। ভারত, চীন, জাপান ইত্যাদি অঞ্চলে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ধারাবাহিকতা। এটা ঠিক এরকম নয় যে, একটি ধর্ম এসেছে এবং তার সূত্র ধরে সমাজ-অর্থনীতি এগিয়েছে। ঘটনাটা বরঞ্চ উল্টো। সমাজ অর্থনীতির ধরনের উপরই ধর্মের রূপ দাঁড়িয়েছে। বহু ধর্ম মরে গেছে। আবার বহু ধর্ম মিশে গেছে অন্য কোনোটির সঙ্গে আবার কোনো কোনোটি ব্যাপক প্রভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হিন্দু ধর্ম, যাকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়, অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে এর ভেতর বহু ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ধর্ম, পাওয়া যাবে সেগুলোর অসংখ্য দেবদেবী বিশ্বাস আচারের খবর।

আরজ আলী ভারতে প্রবর্তিত এই বৈদিক ধর্মের বহু বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে মিল দেখাচ্ছেন আরবে প্রবর্তিত সেমিটিক ধর্মগুলোর সঙ্গে। এক

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৩৬
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ৫১

ধর্মে ‘পৌত্তলিকতা’ ও অন্য ধর্মে ‘পৌত্তলিকতা বিরোধিতা’র মতো মৌলিক তফাৎ থাকলেও এই সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি অভিন্নতার একটি তালিকা তৈরি করেছেন নিম্নরূপে—

১. ঈশ্বর এক—একমেবাদ্বিতীয়ম (লা ইলাহা ইল্লালাহ)।
২. বিশ্ব-জীবের আত্মাসমূহ এক সময়ের সৃষ্টি।
৩. মরণান্তে পরকাল এবং ইহকালের কর্মফল পরকালে ভোগ।
৪. পরলোকের দুইটি বিভাগ—স্বর্গ ও নরক (বেহেশত-দোজখ)।
৫. স্বর্গ সাত ভাগে এবং নরক সাত ভাগে বিভক্ত
৬. স্বর্গ বাগানময় এবং নরক অগ্নিময়।
৭. স্বর্গ উর্ধ্বদিকে অবস্থিত।
৮. পূণ্যবানদের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পাপীদের নরকবাস।
৯. যমদূত (আজ্রাইল) কর্তৃক মানুষের জীবনহরণ।
১০. ঈশ্বরের স্থায়ী আবাস ‘সিংহাসন’।
১১. স্তবস্তুতিতে ইশ্বর সন্তুষ্ট।
১২. মন্ত্র (কেরাত) দ্বারা উপাসনা করা।
১৩. মানুষ জাতির আদিপিতা একজন মানুষ—মনু (আদম)।
১৪. নরবলি হইতে পশুবলির প্রথা প্রচলন।
১৫. বলিদানে পুণ্যলাভ (কোরবানী)।
১৬. ঈশ্বরের নামে উপবাসে পুণ্যলাভ (রোজা)।
১৭. তীর্থভ্রমণে পাপের ক্ষয়—কাশীগয়া (মক্কা-মদিনা)।
১৮. ঈশ্বরের দূত আছে (ফেরেশতা)।
১৯. জানু পাতিয়া উপাসনায় বসা।
২০. সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত (সেজদা)।
২১. করজোড়ে প্রার্থনা (মোনাজাত)।
২২. নিত্যউপাসনার নির্দিষ্ট স্থান—মন্দির (মসজিদ)।
২৩. মালা জপ (তসবিহ পাঠ)।
২৪. নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করা—ত্রিসন্ধ্যা।
২৫. ধর্মগ্রন্থপাঠে পুণ্যলাভ।
২৬. কার্যারম্ভে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ।
২৭. গুরুর নিকট দীক্ষা।
২৮. স্বর্গে গণিকা আছে—গন্ধর্ব, কিন্নরী, অপ্সরা (হুর-গেলমান)।

২৯. উপাসনার পূর্বে অঙ্গ ধৌত করা (অজু)।
৩০. দিকনির্ণয়পূর্বক উপাসনায় বসা বা দাঁড়ানো।
৩১. পাপ-পুণ্য পরিমাপে তৌলযন্ত্র ব্যবহার (মিজান)।
৩২. স্বর্গগামীদের নদী পার হওয়া—বৈতরণী (পোলছিরাত)।[*]

যাই হোক মানব সম্পর্কে আমরা ধর্ম প্রবর্তনের দুটো ধরন দেখি: প্রথমত, এক. নিজেদের জীবনযাপন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদির স্বাভাবিক তাগিদ এবং জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে কিছু বিশ্বাস, চর্চা, নিয়মনীতির সংগঠন হিসেবে ধর্ম দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে পড়ে প্রাচীন আঞ্চলিক বা গোত্রীয় সকল ধর্মই। ‘হিন্দু ধর্ম’ এরকম অনেক ধর্মেরই সম্মিলিত রূপ। সকল বড় ধর্মই প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক বা গোত্রীয় ধর্মের ধারাবাহিকতার উপর সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, বিদ্যমান সমাজ অর্থনীতি শাসন নিপীড়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে সংঘাত হয়েছে শাসকদের ধর্মের সঙ্গে এবং সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন ধর্ম। ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম ধর্ম এই ধারার মধ্যে পড়ে।

প্রচলিত অন্যায় নিপীড়ন বিরোধিতা করে যখন প্রধান ধর্মগুলোর আবির্ভাব ঘটে তখন নিপীড়িত মানুষের আশ্রয় ও বিশ্বাস হিসেবেই এগুলো গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে এসব ধর্ম যখন নিজেই শাসনক্ষমতার বর্ম হিসেবে রূপান্তরিত হতে থাকে তখন নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে এসব ধর্মশক্তির বিচ্ছিন্নতারও সৃষ্টি হতে থাকে। সমাজ মুক্তির একটি শক্তিশালী মতাদর্শ থেকে যখন ধর্মের দূরত্ব বাড়তে থাকে তখন ক্রমে ভয় এবং লোভই হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধর্মের মূল ভিত্তি। বস্তুত প্রধান ধর্মগুলি দাঁড়িয়ে আছে মানুষের স্বর্গ বা বেহেশতের প্রতি লোভ এবং নরক বা দোজখের প্রতি ভয়ের উপর। এখানে নৈতিকতাও এই দুটো দ্বারাই নির্ধারিত। ভয় বা লোভের বাইরে দাঁড়িয়ে যে, মানবিক বোধ, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ তৈরি সম্ভব তা ধর্মের প্রচলিত ডিসকোর্সে দেখা যায় না। এই ভয় বা লোভ দুটোই যেহেতু ‘মৃত্যু পরবর্তী জগতের’ আওতায় সেহেতু ধর্মের ব্যাখ্যানে জীবনের চাইতে মৃত্যু বরাবরই গুরুত্ব পায় অনেক বেশি। মৃত্যু অনিবার্য এবং তার সময় অনিশ্চিত। মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মানুষের অপার

* *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৬২-৬৩

আগ্রহ কিন্তু অনেক ভয়। সেজন্য এটি ঘিরে জন্ম নিয়েছে অনেক ব্যাখ্যা। এ সম্পর্কে আগ্রহ ও ভয়-এর কারণে যার মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্যও আছে। ধর্মের বয়ান মানুষের এই অসহায়ত্ব, সীমাবদ্ধতা এবং ভয়কেই পুঁজি করে। জীবন এই বয়ানে তুলনায় গুরুত্বহীন।

বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন সকল প্রধান ধর্মগ্রন্থেই ঈশ্বরের খুশি ও বেজার হবার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এর উপরই নির্ভর করে মৃত্যুপরবর্তী জীবনে কার অবস্থান অসীম সুখে ভাসবে এবং কার জীবন অসীম দুঃখ ও কষ্টে পতিত হবে সেটি। আরজ আলী প্রশ্ন করেন—

> 'খোদার কি মানুষের মতই মন আছে? আর খোদার মনোবৃত্তিগুলি কি মানুষেরই অনুরূপ? ইহারও উত্তর আসে যে, উহা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ...খোদাতা'লার জগত-শাসন প্রণালী বহুলাংশে একজন সম্রাটের মত কেন এবং তাঁহার এত আমলা-কর্মচারীর বাহুল্য কেন?'[*]

তিনি আরও বলেন—

> 'বেহেস্তের সুখের বর্ণনায় শোনা যায় যে, পূণ্যবানগণ নানারকম সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল আহার করিবেন, নেশাহীন মদিরা পান করিবেন, হুরীদের সহবাস লাভ করিবেন—এক কথায়, প্রত্যেক পূণ্যবান ব্যক্তি মধ্যযুগের এক একজন সম্রাটের ন্যায় জীবনযাপন করিবেন।'[**]

মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষের দেহ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রসঙ্গে মানুষের সেই দেহ পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন আসে। আরজ আলীর সহজ প্রশ্ন, দেহ পুনরুদ্ধার কি সম্ভব? প্রকৃতিতে একটি দেহ আরও অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি প্রাণীর মৃত্যুর পর তার দেহ থেকে বহু জীবের দেহ-প্রাণ গঠিত হয়—

> 'জীবের মৃত্যুর পর তাহার দেহটি রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার ঐ সকল

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ৬৩
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ৭২

> পদার্থের অণু-পরমাণুগুলি নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়াই হয় নতুন জীবের দেহগঠন। আবার মৃত্যুর পর আমার এই দেহের উপাদানে হইবে লক্ষ লক্ষ জীবের দেহগঠন। ...ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণীবিশেষের দেহ অন্যান্য বহু প্রাণীর দেহ হইতে আহৃত পদার্থসমূহের সমষ্টির ফল। অর্থাৎ যে কোনো একটি জীবের দেহ অন্যান্য বহু জীবের দেহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে।'[*]

সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে—

> 'এমতাবস্থায় পরকালে একই সময় যাবতীয় জীবের দেহ বর্তমান থাকা কি সম্ভব? যদি হয়, তবে প্রত্যেক দেহে তাহাদের পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে কীরূপে? যদি না থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ কি আধ্যাত্মিক?'[**]

তাহলে কষ্ট ও সুখের যে পার্থিব বর্ণনা পাওয়া যায় তা কি রূপক? তাহলে পুরো ধর্মের ব্যাখ্যানই কি রূপক বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? তাহলে বেহেশত-দোজখ, স্বর্গ-নরক সবই কি রূপক বিষয়? আসলে তার অস্তিত্ব নাই? ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় নেতারা এই কথাটা জনগণকে খোলাসা করে বলতে গেলে আরজ আলীর সকল প্রশ্নের সুরাহাই করতে হবে।

আরজ আলী প্রশ্ন করেন যে, ঈশ্বরকে যে একই সঙ্গে ন্যায়বান ও দয়ালু বলা হয় তা কি একই সময়ে হওয়া সম্ভব?[***] কেননা যিনি দয়ালু তিনি ক্ষমাশীল কিন্তু ন্যায়বান যিনি তিনি ক্ষমাশীল হতে পারেন না। তাঁকে ন্যায়বিচার করতে গেলে নৈর্ব্যক্তিক হতে হয়। অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল হলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের প্রতি অবিচার হয়। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে গেলে অপরাধীদের প্রতি নির্মম হতে হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের সবচাইতে বড় সংগঠিত অপরাধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে গণহত্যা ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে। এটি করেছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং তাদের সঙ্গে ছিল ইসলামের নাম নিয়ে এখানকার ধর্মীয় নেতাদের উল্লেখযোগ্য অংশ। এই অপরাধীদের

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ৭১-৭২
** *সত্যের সন্ধান*, ১, ৭২
*** সত্যের সন্ধান, ১, ৬৪

প্রতি যে ক্ষমা ঘোষণা করা হয় তাকে মহানুভবতা হিসেবে দেখানো হয় এবং কয়েক দশক পর্যন্ত তাঁদের কোনো বিচার হয়নি। এরকম কথাই বিশেষভাবে শোনা গেছে যে, এসব বিচারের কথা তোলা মানে জাতিকে বিভক্ত করা। কিংবা আমাদের ক্ষমাশীল হওয়া দরকার। তাহলে খুনি ও দুর্বৃত্তদের অপরাধের বিচার করলে কি তা জাতিকে বিভক্ত করে? তাহলে তো কোনো বিচারের ব্যবস্থাই থাকা ঠিক নয়। আর দুর্বৃত্তদের প্রতি ক্ষমাশীল হলে তাদের অপরাধের শিকার মানুষের প্রতি তবে কি ন্যায়বিচার হলো?

ধর্মে ক্ষমা পাবার নানা ব্যাখ্যা আছে। পাপ পুণ্যের নানা মাপ আছে। তাতে বিপুল পুণ্য অর্জনের জন্য এমন বহু রাস্তা আছে যেগুলো টাকা থাকলে সহজেই ক্রয় করা যায়। এবং এগুলো অপরাধীদের জন্য স্বস্তিদায়ক। এসব ব্যাখ্যার অনেকগুলোতে, বলাই বাহুল্য, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানের ক্ষমতাবানদের স্পর্শ আছে। আবার ধর্মের এরকম কিছু ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে যেখানে উচ্চকিত ক্ষমতাবানদের বিপরীতে জনগণের কণ্ঠস্বর থাকে। এই দুক্ষেত্রে এক ধর্ম পরিষ্কার দুটো বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে।

জগত ও মানুষ

আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি সেই পৃথিবীর বয়স কত? কীভাবে এর উৎপত্তি? দিনরাত কীভাবে? কীভাবে মৌসুমের পরিবর্তন? কীভাবে প্রাণের উদ্ভব? কোন প্রাণ দিয়ে প্রাণীজগতের শুরু? এই পৃথিবীর সঙ্গে বাকি জগতের কী সম্পর্ক? এই জগতের শেষ কোথায়? আরজ আলী মাতুব্বর এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য যতধরনের ধর্মগ্রন্থ আশেপাশে পাওয়া যায় দেখেছেন, প্রচলিত ভাষ্য নোট করেছেন আর পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আবিষ্কার, তত্ত্বের খোঁজ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন, অধ্যয়ন করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ধর্মসহ অন্য সবকিছুর মতো প্রবল ছিল একই কারণে: প্রশ্নের উত্তর সন্ধান। বলাই বাহুল্য এসব অধ্যয়ন তাঁকে এসব প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিসঙ্গত একটি কাঠামো দান করেছিল।

সত্যের সন্ধানে গ্রন্থটি প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে বহু প্রশ্ন ও প্রশ্নের ব্যাখ্যার সংকলন। *সৃষ্টি রহস্য* গ্রন্থটি মূলত সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের

ধারণা এবং বিজ্ঞানের তৎকালীন সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে লেখা। *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রস্তাবে আদিমানব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মেই আদিমানব বিষয়ে ধারণা বা বিশ্বাস পাওয়া যায়। সেমিটিক সব ধর্মে আদম-হাওয়া বিষয়টি একই। হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনুই আদি মানব। এই বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কাহিনি যত্নের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

আগুন, অস্ত্র, বাহন, তাঁত, চাকা, নৌকা ও পাল, কাগজ, ধর্ম, বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহারের বিবর্তনের ইতিহাসও তিনি পর্যালোচনা করেছেন। কৃষি ও পশুপালন সম্পর্কে ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি লিখেছেন,

> ‘সেমিটিক জাতির মতে, কৃষি ও পশুপালন শুরু করিয়াছিলেন বাবা আদম বেহেশত হইতে পৃথিবীতে আসিয়াই। হালের বলদ, লাঙ্গল-জোয়াল ও ফসলের বীজ বেহেশত হইতে আমদানি হইয়াছিল কি না তাহা জানি না, তবে তিনি নাকি চাষাবাদ করিয়াই জীবন যাপন করিতেন।... বাবা আদমের লাঙ্গলের আকৃতি কিরূপ ছিল, জোয়াল কীভাবে জুড়িতেন এবং রশারশি কোথায় পাইয়াছিলেন- সেই বিষয়ে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।’[*]

আদমের সময়কাল এবং স্থান নিয়ে হিসাবনিকাশ করে তিনি দেখাচ্ছেন খৃ.পূ. ৪০০৪ সালে হযরত আদমের সৃষ্টি (জন্ম)। কিন্তু পাশাপাশি এটাও দেখাচ্ছেন যে, সেই সময়ের আগেই মিশরে পঞ্জিকা আবিষ্কার হয়েছে, সেই সময়ে মিশরে চাষাবাদ, লোকবসতি দেখা যায়; তারও ৪ হাজার বছর আগে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া যায় সিরিয়ায়। তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে—

> ‘জীববিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছিল লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তবে আধুনিক চেহারার মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে মাত্র প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে।’[**]

মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে আরজ আলী মাতুব্বর বলছেন—

* *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৩০

** *সত্যের সন্ধান, ষষ্ঠ প্রস্তাব*, ১, ১১৯-২০

'পূর্বোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে মনে আসিতে পারে যে, আদম হয়ত এশিয়া মাইনর বা আর্মেনিয়া দেশের কোন ক্লানের বিতাড়িত ব্যক্তি এবং আরব দেশে আগন্তুক প্রথম মানুষ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আদিম মানুষ নয়।'[*]

মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের শরীরতত্ত্বীয় মিল নিয়ে আরজ আলী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে মানুষ সম্পূর্ণ বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ এই ধারণার উপর অনেক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলছেন—

'চা, কফি ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণে ও কতক বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে মানুষ ও পশুর একই লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাতে উহাদের টিস্যু ও রক্তের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। গো-মহিষাদি পশুরা লোমশ প্রাণী, মানুষও তাহাই এবং পশুদের দেহে যেরূপ পরজীবী বাস করে, মানুষের শরীরেও তদ্রুপ উকুনাদি বাস করে। প্রজননকার্যে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। পূর্বরাগ, যৌনমিলন, ভ্রূণোৎপাদন, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন সকলই প্রায় একরূপ।'[**]

নারীর রজঃশীলা ও সন্তান ধারণ বিষয়ে একই রকম সাদৃশ্য দেখেছেন। *সৃষ্টি রহস্য*-তে এটি নিয়েও আলোচনা করেছেন। *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থে তাঁর প্রশ্ন ছিল—

'বিশেষত আদি নারী বিবি হাওয়া নাকি রজঃশীলা হইয়াছিলেন গন্ধম ছেঁড়ার ফলে, কিন্তু অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকূল রজঃশীলা হয় কেন?'[***]

তাহলে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কি মানুষের কোন পার্থক্য নেই? তিনি বলেন—

'মানুষের সহিত অন্যান্য জীবদের তথা পশুদের শত শত রকম সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কাজেই যাবতীয় জীব বিশেষত পশুরা মানুষের আত্মীয়, এ কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি মানুষ

* ঐ, ১২২
** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১০৫
*** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১০৯

মানুষই, পশু নহে। এখন দেখা যাক যে, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাৎ কি? জীবজগতে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি— হাত, মগজ, ভাষা।'[*]

এরপর এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করে শেষে এসে যা বলছেন তা উল্লেখ না করে পারা যায় না। বলছেন—

'...ভাষাভাষী হিসাবে মানুষ একান্তই সামাজিক জীব। উন্নত মস্তিষ্ক, কর্মক্ষম হাত এবং সুসমঞ্জস ভাষা সহায়ক হইল এক রকম জীবের- তাহারই নাম মানুষ। কিন্তু হাত, মগজ ও ভাষা জীবজগতের সর্বত্র দুর্লভ নহে । অনুন্নত জীব জগতের সর্বত্র দুর্লভ- মানুষের হাসি।'[**]

দেবতা ফেরেশতা রাক্ষস শয়তান

ইতিহাস বলে, বিদ্যমান যতগুলো ধর্ম আছে সেগুলোর চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক ধর্ম মানুষ পার হয়ে এসেছেন। যত ধর্ম জীবিত আছে তার থেকে মৃত ধর্মের সংখ্যা অনেক বেশি। এসব ধর্ম নিয়ে যদি আমরা ঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের পক্ষে ঐ ধর্মের কাল ও স্থানকে উদ্ধার করা সম্ভব। আরজ আলী সাধ্যমতো বর্তমান-অতীত, জীবিত-মৃত ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসন্ধান করেছেন তার কাল-স্থান ধরে এবং সেইসঙ্গে অঙ্গীভূত মিথগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর এসব আলোচনা আছে *সৃষ্টি রহস্য*, *সত্যের সন্ধান* ছাড়াও *অনুমান* গ্রন্থে।

তিনি খ্রিস্টপূর্বকালের বিভিন্ন ধর্ম ও তার চেহারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

'সেকালে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসতেন পৃথিবীতে বলতে গেলে ঘনঘনই। আর বিভিন্ন দেশে তাদের সংখ্যাও ছিল অগণ্য। আরবের লাত-মানাত, কেনানে বাহু ইত্যাদি নানারকম ছিলেন দেবতা। আবার বিভিন্ন দেশের কতক দেবতারা ছিলেন একই ধাঁচের। যেমন মিশরে-আসিরিস, আইসিস, হোরাস; ব্যাবিলনে—

* *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১০৬
** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১০৭

আলু, বেল, ঈয়া; ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি। যে যুগে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বোধহয় যে এককোটিও ছিলো না, সে যুগে নাকি হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিলো প্রায় তেত্রিশ কোটি। ভারতীয় দেব-দেবীরা তো ঘাঁটিই করেছিলেন হিমালয় পর্বতের কোনো কোনো অঞ্চলে।... মুনিঋষি ও দেব-দেবীগণ প্রায় একই কালে বর্তমান ছিলেন এবং প্রায় একই কালে ঘটেছে তাঁদের তিরোভাব। এযুগে দেখা যায় না ওঁদের কাউকে। ওঁরা সকলেই এখন কালের কোলে ঘুমিয়ে আছেন।'[*]

বঙ্কিমচন্দ্র তেত্রিশ কোটি দেবতার সংখ্যা নিয়ে রীতিমতো ঠাট্টাই করেছেন। তিনি অনেক গণনা করেও দেবতার সংখ্যা শত অতিক্রম করতে পারেননি।

মাতুব্বর বলছেন—

'পবিত্র বাইবেল পাঠে বোঝা যায় যে, 'জাভে' নামক ঈশ্বরটির ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি মহাদেশ ও চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদির অধিবাসীদের জন্য যেনো কোনো মাথাব্যথা নেই, তিনি যেনো শুধু ইহুদি জাতি তথা বনি-ইস্রায়েলদের সমাজ ও ঘরসংসার নিয়েই ব্যস্ত।...'[**]

আরজ আলী এ বিষয়ে লেখার কয়েক দশক আগে এরকম একটি প্রশ্ন রোকেয়াও তুলেছিলেন। রোকেয়া ধর্মগ্রন্থের অবতরণের স্থান এবং তার পুরুষকেন্দ্রিকতা দুই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

ঈশ্বর সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যে ধরনের ধারণায় অভ্যস্ত ঈশ্বর সে রূপে পৌঁছেছেন বহু হাজার বছরে ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। একক ঈশ্বরের উদ্ভব খণ্ড খণ্ড দেবতাদের উদ্ভবের অনেক পরের ঘটনা। আরজ আলী বিষয়টিকে উপস্থাপন করেন এভাবে—

'আদিম মানবদের ঈশ্বরকল্পনা ছিল না, কল্পনা ছিল দেবতার। যে তাপ ও আলো দান করে, সে একজন দেবতা; যে খাদ্য দান করে, সে একজন দেবতা; যে বৃষ্টি দান করে, সে একজন দেবতা;... পরমেশ্বর বা একেশ্বর কল্পনার পূর্বে যাঁহারা ছিলেন দেবতা, একেশ্বর কল্পনার পরে তাঁহারাই বনিয়াছেন স্বর্গীয় দূত।'[*]

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৬২

** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৬২

দেবতা, নরবলি, জন্মান্তর, ভূত, শপথ, জাদু, ইন্দ্রজাল, শুভাশুভ লগ্ন, ভাগ্য, সতীদাহ, ভবিষ্যৎ গণনা, প্লাবন ও পুনঃসৃষ্টি, প্রলয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত: বৈদিক মত, মিশরীয় মত, ইরানীয় মত, ইহুদি মত, খ্রিস্টীয়, মুসলিম, চৈনিক, বৌদ্ধ, চার্বাকীয় ও তার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক মত এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি রহস্য গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অনুমান গ্রন্থে আরজ আলী রাবণ চরিত্রটি নিয়ে অনেকখানি আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে রাবণ বলতে একটি রাক্ষসের চিত্রকল্প তৈরি হয় যেমন অসুর বললে মনে হয় ভয়াবহ, মানব বিরোধী কোনো অপশক্তি। কিন্তু প্রচলিত মিথগুলি খুঁটিয়ে দেখলে এবং অধিপতি বিশ্বাসকে অতিক্রম করে সেসব পরীক্ষা করলে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় দেখা সম্ভব যে, রাবণ বা অসুর এবং রাম বা দুর্গার চেহারা প্রচলিত নির্মাণের সম্পূর্ণ বিপরীত। আরও অনেক মিথ-এর মতো এসব চরিত্র নির্মাণের পেছনেও মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাস আছে। সমাজের অধিপতি শ্রেণির ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নায়ক বা খলনায়ক নির্মিত হয়েছে। যাকে প্রচলিত বিশ্বাস অভিহিত করছে খলনায়ক হিসেবে, জনগণের দিক থেকে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করলে তাকে হয়তো তাদের প্রতিনিধি হিসেবেই শনাক্ত করা যাবে। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এর সহজ উদাহরণ আছে। ব্রিটিশ বিরোধী ফকির, সন্নাসী কিংবা অনুশীলন ইত্যাদি সবাই ব্রিটিশ ইতিহাসে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিহিত করা হত দুষ্কৃতকারী হিসেবে। সকল পর্বেই এরকম বিপরীত সত্য দেখা যাবে। প্রতিষ্ঠিতকে প্রশ্ন না করে আসল ঘটনার কাছে তাই পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও বক্তব্যগুলো পরীক্ষা করেছেন আরজ আলী সেভাবেই। বিশ্লেষণ করে তিনি রাবণকে পেয়েছেন এক অসাধারণ

* *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৪৮-৪৯

প্রতিভাবান মানুষ হিসেবে, তবে অনার্য হেতু রামের বৈরী। তিনি বলেছেন—

> 'হয়তো আর্য-ঋষি বাল্মীকি আর্যপ্রীতি ও অনার্যবিদ্বেষ বশত শ্রীরামকে প্রদীপ্ত ও রাবণকে হীনপ্রভ করার মানসে একের প্রোজ্জ্বল ও অন্যের মসিময় চিত্র অংকিত করেছেন নিপুণ হস্তে রামায়ণের পাতায়।'[*]

হনুমান চরিত্রটিও তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন হনুমান কোনো একক ব্যক্তি বা প্রাণী নয়, এটি আসলে গোত্রের নাম। ফেরাউন প্রচলিত বয়ানে একটি খুবই খারাপ নাম, ঈশ্বরদ্রোহী-মানুষের শত্রু। আরজ আলী বলেছেন ফেরাউন হচ্ছে মিশররাজদের উপাধি। তিনি তৎকালীন সৃজনশীল কাজ ও বিশাল নির্মাণের নমুনা দেখে অনেক ফেরাউনের বিশাল অবদানের বিষয়টি সামনে এনেছেন। মুসার মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবার পথ অনুসন্ধান করে তিনি বুঝতে চেয়েছেন মুসার সমুদ্র পার হবার মিথ এবং দেখিয়েছেন পথ, সময় বর্ণনায় অসঙ্গতি। 'অধুনা কোনো কোনো গবেষক বলেন যে, হজরত মুসা 'তিমছাহ হ্রদ' পার হইয়াছিলেন।'[**]

তিনি পানি শুকিয়ে যাবার ঘটনা ব্যাখ্যা করে জোয়ার ভাটার সঙ্গে সেই কাহিনীর সম্পর্ক পেয়েছেন।

শয়তানের জবানবন্দী নামে আরজ আলীর একটি দীর্ঘ লেখা আছে, যেখানে তিনি শয়তানকে ঘিরে যে বিশ্বাস সেগুলো নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। অন্য অনেক কিছুর মতো শয়তান সম্পর্কেও ধর্মীয় বয়ানে মেলা স্ববিরোধিতা আছে। সেমিটিক ধর্মগুলোতে শয়তানের কাহিনি অভিন্ন। এই শয়তান বস্তুত আল্লাহর বিপরীত শক্তি; সকল 'খারাপ'-এর কেন্দ্রীয় শক্তি। আসলে চিন্তার জগত যত সমৃদ্ধ হচ্ছে ধর্মের ব্যাখ্যাও নতুন নতুন রূপ পাচ্ছে। কারও কারও কাছে এখন শয়তান একটি রূপক, এটি আসলে নফস-এর বিষয়। ধর্মগ্রন্থের কাহিনি অনুযায়ী শয়তান হলো অভিশপ্ত ফেরেশতা, যে আগে আল্লাহর খুব প্রিয় ফেরেশতা ছিল। অভিশপ্ত হবার কারণ শুধু আল্লাহর একটি আদেশ অমান্য করা, আদমকে সালাম না করা। অবাধ্য, কিন্তু প্রবল শক্তিধর এই শয়তান অমর। আরজ আলী তাই

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৪৩

** *সত্যের সন্ধান*, ১, ১২৪

প্রশ্ন তোলেন—

> 'জন্ম-মৃত্যুর ঠোকাঠুকিতেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া আছে প্রায় তিনশ' কোটি। আর মানুষের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া অমর শয়তানের সংখ্যা কত?'[*]

অর্থাৎ মানুষ মরণশীল এবং শয়তান অমর হবার কারণে মানুষের মাথা পিছু শয়তানের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন প্রতি মানুষপিছু শয়তানের সংখ্যা বহু বহু গুণ বেশি। সেই হিসেবে পাপের পরিমাণ আগের তুলনায় সেই পরিমাণ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার কথা। কিন্তু দেখা যায় বহু অঞ্চলে পুরনো প্রথাগত অপরাধই অনেক কমে গেছে। শয়তানের ভূমিকা বা প্রভাব তার সংখ্যা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেলে মানুষ আরও আগেই ধ্বংস হয়ে যাবার কথা।

এই ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে ধর্মপ্রচারকদের আগমন হার নিয়ে। তাদের আগমনের কারণ শয়তানের প্রভাবকে খর্বকরণ। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের আগমন অনেক কমে যায়। অর্থাৎ যখন শয়তানের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন নবীদের আগমন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল কি কারণে? আরজ আলী বলেন—

> 'বাইবেলের বিবরণমতে হযরত আদম হইতে হযরত ইসার জন্ম পর্যন্ত সময় ৪০০৪ বৎসরে প্রতি বৎসর গড়ে নবী জন্মিয়াছিলেন প্রায় ৩১ জন!... কিন্তু হযরত ইসা নবী জন্মিবার পর নবীদের জন্মহার কমিয়া ৫৭০ বৎসরে জন্মিলেন মাত্র একজন, অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত নাকি একেবারেই বন্ধ।... হয়ত পাপীর সংখ্যা বা পাপের পরিমাণ আগের চেয়ে হ্রাস পাইয়াছে, নতুবা এ যুগের পাপীদের উপর বীতস্পৃহ হইয়া আল্লাহ তাঁহার হেদায়েত বন্ধ করিয়াছেন।'[**]

এর একটা ব্যাখ্যা আরজ আলীর আছে। তিনি বলেছেন—

> 'উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গুরুবাদিতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে কমতে থাকে দেবতাগণের মহিমা। অবশেষে বুদ্ধ (জ্ঞানী)দেব যখন আবির্ভূত হয়ে প্রচার করলেন দেব-দেবীর

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ৮০

** *সত্যের সন্ধান*, ১, ৯৪-৯৫

স্তবস্তুতি ও পূজা-অর্চনার অসারতা-অযৌক্তিকতা, তখন থেকেই দেবতাদের পাত্তা গোটাতে হলো চিরতরে। যদিও ভারতীয় দেবতাদের ঔপনিবেশিক স্বর্গধামটি আর্য ভারত থেকে বেশী দূরে নয়, তথাপি আর কোনো দেবদেবীর ভারতের ভূমিতে পদার্পণের কথা শুনা যায় না, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে। কেননা এ যুগে তাঁদের ভক্ত মুনি-ঋষি মেলে না। অভিন্ন কারণেই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পরে পশ্চিমাঞ্চলেও দেবতাদের আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।'[*]

ধর্ম, বিজ্ঞান এবং কুসংস্কার

কুসংস্কার আরজ আলী মাতুব্বরের মনোযোগের অন্যতম, কিংবা বলা যায় অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। সমাজে এর দাপট-এর বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধে নেমেছিলেন। ধর্ম আর কুসংস্কারকে সমার্থক হিসেবে ঘোষণা না করে, কুসংস্কার সম্পর্কে পাইকারি কিংবা অনির্দিষ্ট কথা না বলে তিনি এটিকে সুনির্দিষ্ট করেছেন, বলেছেন—

> 'কুসংস্কার কি, অল্প কথায় ইহার উত্তর হইল, যুক্তিহীন বিশ্বাস বা অসার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাস; এক কথায় অন্ধবিশ্বাস। যেখানে কোনো বিষয় বা ঘটনা সত্য কি মিথ্যা, তাহা যাচাই করিবার মতো জ্ঞানের অভাব. সেখানেই কুসংস্কারের বাসা।'[**]

অর্থাৎ যখন মানুষ চিন্তার সমস্ত ক্ষমতা নিষ্ক্রিয় করে রাখে এবং নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অন্য কারও কাছে সমর্পণ করে তখন কুসংস্কারের জায়গা তৈরি হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু নয় মতাদর্শিক ক্ষমতাও এই আধিপত্য তৈরি করতে সক্ষম। আরজ আলী বলেন—

> 'বর্তমান কালেও কোনো কোনো মহলে দেখা যায়, সত্য-মিথ্যার বিচার নাই, গুরুবাক্য শিরোধার্য।'[***]

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বললে অনেকেই তাকে ধর্মের সমালোচনা হিসেবে গণ্য করেন। আরজ আলী বিষয়টি পরিষ্কার করেন এইভাবে যে—

* *সত্যের সন্ধান*, ১, ১৬১-৬২
** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৪৭
*** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১৪৭

> 'যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।'[*]

আরজ আলীর দেয়া কুসংস্কারের সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতাদর্শিক কাঠামো, বিশ্বব্যাংকীয় অর্থশাস্ত্র এবং যাকে বিজ্ঞান বলা হয় তারও অনেক কিছুকে কুসংস্কার বলতে হবে। কারণ বর্তমান বিশ্বে যুক্তি, বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিকতা ছাড়া এর অনেক কিছু গ্রহণ ও তার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবার প্রবণতা কিংবা পরিকল্পিত চেষ্টা প্রবল প্রতাপে বিজ্ঞান, আধুনিকতা আর যুক্তিশীলতার নামেই জারী আছে।

বিজ্ঞান ও সভ্যতা নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের মনোযোগ ও আগ্রহ দেখে এরকম কারও মনে হতে পারে যে, তিনি বোধহয় এগুলোকে সরলরৈখিকভাবে বিবেচনা করছেন, বোধহয় কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের বিকাশকেই মানুষের সকল মুক্তির পথ বলে বিবেচনা করছেন। কিন্তু তা যে ঠিক নয় সেটি স্পষ্ট হয় নিচের কয়েকটি বাক্য থেকে—

> 'সভ্যতাবৃদ্ধির সাথে সাথে তাম্র ও লৌহ আবিষ্কারের পর তীর-ধনুকের উন্নতি হইয়াছিল অসাধারণ। কিন্তু উন্নতি হইলে কি হইবে, উহা দিয়া পশু-পাখি হত্যার বদলে আরম্ভ হইয়াছিল নরহত্যা এবং পশু-পাখির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল রামানুজ লক্ষ্মণ, লঙ্কেশ্বর রাবণ, ও নূরনবীর দৌহিত্র ইমাম হোসেনও। আধুনিক যুগে আবার তীর-ধনুকের চেহারা বদল হইয়া উহার তীরটি হইয়াছে গোল এবং ধনুটি হইয়াছে সোজা-সৃষ্টি হইয়াছে বন্দুক, কামান ইত্যাদি মারণাস্ত্রের। শেষমেষ পারমাণবিক বোমা।'[**]

পারমাণবিক শক্তি বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন, কিন্তু এই বিশাল শক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয় না। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি জনগণের কাছে না থাকে তাহলে বিজ্ঞানের এই বিশাল শক্তিই

* সত্যের সন্ধান, ১, ১৩৬
** *সৃষ্টি রহস্য*, ২, ১২৩

ধ্বংসের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য পারমাণবিক শক্তি যেখানে মানুষের বহু সমস্যার সমাধানে সক্ষম সেখানে সেই শক্তি এখন মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্যই একটা হুমকি।

জীবন ও জগত সম্পর্কে আরজ আলী তাঁর ধারণা স্পষ্ট করেছেন এইভাবে—

> 'বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে এক মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যা- তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি প্রাণশক্তি।... অন্যান্য শক্তির ন্যায় 'প্রাণ' শক্তিটিও মহাশক্তির কোটি কোটি বছরের আবর্তন, বিবর্তন ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল।'[*]

অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজ ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—

> 'সমাজদেহের অঙ্গবিশেষের অর্থাৎ শ্রেণিবিশেষের অতিমাত্রায় উত্থান ও পতন ডেকে আনে সমাজদেহের পঙ্গুতা ও অকর্মণ্যতা।... 'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম।' এই শর্ত পূরণ ছাড়া বিজ্ঞান ও ধর্মের ফলাফল তাঁর কাছে মনে হয়েছে অভিন্ন, অর্থহীন; 'রকেট-রোবট ব্যবহার' অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন 'বিকাশ' এবং ধর্মের আধিপত্য কিংবা 'স্বর্গ নরকের স্বপ্ন দর্শন', তাঁর বিবেচনায়, মানুষকে একই জায়গায় নিক্ষেপ করে। তিনি তাই বলেছেন, উপরের শর্ত পূরণ ছাড়া 'শুধুমাত্র রকেট-রোবট ব্যবহার ও স্বর্গ নরকের স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, তা ভেল্কি ছাড়া আর কিছু নয়।'[**]

এক ধর্ম বহু ধর্ম: ধর্ম না সমাজ?

আরজ আলী বলেন—

> 'আগুন আবিষ্কার থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার পর্যন্ত অন্য কোন আবিষ্কারেই আঞ্চলিকতা নেই, কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্র

* জীবন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ১, ২৭৪

** জীবন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ১, ২৭৪

> হচ্ছে আঞ্চলিকতায় ভরপুর।'[*]

একদিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, তার সমাজ ও সংস্কৃতির আদলে ধর্ম গড়ে উঠে, অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে সমাজ-রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি হয়ে উঠে ধর্ম। ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা আসলে তাই সমাজ রাষ্ট্র নিয়েই আলোচনা। কেননা সমাজ রাষ্ট্র বাদ দিয়ে ধর্মের অস্তিত্ব নেই। আমরা ইতিহাসে দেখি, মানুষের সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। গোত্র জীবন থেকে মানুষ যখন রাষ্ট্র জীবনে প্রবেশ করেছে তখন ধর্মও গোত্রীয় পরিচয় থেকে রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রিক-সামরিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়েছে তাদের ধর্মের প্রভাবও পড়েছে তত বেশি। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মের ঈশ্বরের জ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্যই আগের ঈশ্বরের চাইতে পরের ঈশ্বরের জ্ঞান অনেক পরিণত দেখা যায়। বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু গোত্র যেভাবে বিলুপ্ত হয়েছে তেমনি বিলুপ্ত হয়েছে অনেক ধর্ম, অনেক ঈশ্বর, অনেক দেবতা ও অনেক নবী। এই কালে যে আর কোনো ধর্মের উদ্ভব হয় না, কেউ চেষ্টা করলেও তা স্বীকৃতি পায় না সেটাও মানুষের ক্রমবিবর্তিত সমাজেরই 'ইচ্ছা'।

এক ধর্ম কখনোই আসলে এক ধর্ম নয়। প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই বহু ধর্মের বাস। এটাও নির্ধারিত হয় সমাজেরই ইচ্ছা দিয়ে, তার তাগিদে। সমাজে মানুষের মধ্যেকার বৈষম্য, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান, নিপীড়ক ও নিপীড়িত—এর সবেরই বহিপ্রকাশ দেখা যায় 'একই' ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি, চর্চা ও ব্যাখ্যার মধ্যে। 'একই' আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর কিংবা 'একই' নবী, দেবতা মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে গৃহীত হয় ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে। কখনো হয়ে যায় তা সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী নারকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ আর রসুলের নামে, আবার নিপীড়িত অসংখ্য নারী পুরুষ বুক চিরে আর্তনাদ করেছে, জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সেই একই আল্লাহ আর রসুলের নামেই। পোপের যিশু বিশ্বব্যাপী যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দেশে দেশে স্বৈরশাসন, নিপীড়ন ও বৈষম্যকে মহিমান্বিত করে তখন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ে যিশুকে

* সমাজ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ১, ২৮০

সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে স্থাপন করে মুক্তির ধর্মতত্ত্ব। এই বৈপরীত্য, এই লড়াই ধর্মের লড়াই নয়; এটা সমাজের ভেতরে শ্রেণিসমূহের, বিভিন্ন বর্গসমূহের (লিঙ্গীয়, জাতিগত, বর্ণগত) সমাজের ভেতরকার ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর লড়াই। ধর্ম এসব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা।

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নের যে শক্তি তা নিজে নিজে তৈরি হয়নি, সে শক্তি এসেছিল পা ভাঁজ করে শোয়ার অবস্থা নিয়েও মহাবিশ্বকে, মানুষ ও জগতকে দেখার ক্ষমতা থেকে, সামাজিক কর্তৃত্ব এবং মতাদর্শিক আধিপত্যকে অস্বীকার করবার অব্যাহত লড়াই থেকে। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়েই সামনে লাঠি হাতে দাঁড়ানো দেখেছিলেন ধর্মকেই। তিনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন মনে হলেও আদতে সেগুলো সমাজ ক্ষমতা কর্তৃত্ব অধিপতি সংস্কৃতি নিয়েই প্রশ্ন। কেননা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সমাজে ধর্মের অধিপতি অস্তিত্ব আসলে ঐ সময়ের ঐ সমাজের বিধি ব্যবস্থা অনুশাসন আর প্রবল মতাদর্শিক অবস্থানেরই একটি সংগঠিত রূপ।[*]

২০০৫

---

* এই প্রবন্ধে আরজ আলী মাতুব্বরের বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলো তাঁর রচনাসমগ্রের কোন কোন খণ্ডে আছে তাও নির্দেশ করা হয়েছে। *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র* তিনখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে ঢাকার পাঠক সমাবেশ। ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ সালে, ২য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ সালে, ৩য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭ সালে। প্রথম দুটো খণ্ডেই প্রধান লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে। দুখণ্ডেরই অনেকগুলো পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, সর্বশেষ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে ২০০০ সালে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বয়স বাড়িয়ে দিল, আমাদের মন মনোযোগে রাষ্ট্র রাজনীতি সমাজ এলো প্রবলভাবে। মুক্তিযুদ্ধের পরপর আমি তখন স্কুলের ছাত্র, কিন্তু খুঁজছি নতুন নতুন সব প্রশ্নের জবাব। ১৯৭১ আমাদের মধ্যে স্বপ্ন তৈরি করেছে, দায়িত্ববোধ এনেছে, এই দেশকে কীভাবে মানুষের দেশ-এ পরিণত করা যাবে? মুক্তিযুদ্ধের কারণে তখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী লড়াই-এর খবর আমাদের কাছে, আগ্রহ উদ্দীপনা তৈরি করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কিউবার মোকাবিলা, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বহুদেশে মুক্তির লড়াই। সেসময়ে সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর প্রশ্ন নিয়ে, সমাজ-রাষ্ট্র নিয়ে যারা ভিন্নভাবে কথা বলতেন কাজ করতেন, যাদের বক্তৃতা ও লেখনীর প্রতি আমাদের আগ্রহ তৈরি হলো, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে যিনি বিপ্লবী রাজনীতির তাত্ত্বিক হিসেবে তখন পরিচিত, বদরুদ্দীন উমর। সেই সময় বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে যেসব প্রশ্ন মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছিলো তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতাম নানাভাবে, এঁদের লেখা ও বক্তৃতা থেকে যেন কিছু পথ খুঁজে পেতাম। এভাবেই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা ও বক্তৃতার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর বক্তৃতা সবসময় খুবই আকর্ষণীয়। কৈশোর কিংবা কলেজে অধ্যয়নকালে অনেক কঠিন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর লেখা ও বক্তৃতা খুবই সহায়ক হয়েছিল।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সত্তর দশকের মাঝামাঝি সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* 'ওপর কাঠামোর ভেতরই' নামে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে নিয়মিত কলাম লিখতেন। তিনি আরেকটি কলাম লিখতেন 'গাছপাথর' নামে, *দৈনিক সংবাদে*। তাঁর বই পড়ার আগে তাঁর কলামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সত্তর দশকের শেষদিকে বাঙলাদেশ লেখকশিবির সূত্রে তার সঙ্গে শারীরিকভাবে যোগাযোগ হয়। লেখকশিবির তখন নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছিল। তাতে এঁরা সবাই ছিলেন। সেই সময় থেকে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা শুরু।

শিক্ষক হিসেবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বরাবরই খুবই জনপ্রিয়। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তিনি নতুন চিন্তা, আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। ক্লাসের বাইরেও তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অসংখ্য মানুষ এমন সব বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে কঠিন, জটিল ও প্রথাবিরুদ্ধ; সেগুলোকে তিনি সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি, জ্ঞান-বুদ্ধিবৃত্তিক জগতও একটি বড় লড়াইয়ের জায়গা। সেখানকার লড়াই চোখে দেখা যায় না, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মানুষ-অমানুষে শারীরিক সংঘাত কিংবা মাঠে-ময়দানে লড়াই তার থেকে ভিন্ন কিন্তু আবার পরস্পর সম্পর্কিত। জ্ঞান-বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের লড়াই চোখে দেখা না গেলেও এর একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকে। এই লড়াই জোরদার না হলে মানুষের মুক্তির সামগ্রিক লড়াই যথাযথ ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। এই লড়াই এমনকি বিদ্যায়তনের শ্রেণিকক্ষেও হয়। আমাদের বিদ্যায়তনের সিলেবাস, আমাদের পাঠ্যক্রম কিংবা অবিরাম উৎপাদিত জ্ঞান অথবা অধিপতি যে চিন্তার ধরন সেগুলোকে মোকাবিলা করে, চ্যালেঞ্জ করে কিংবা প্রশ্ন করে নতুন জ্ঞান তৈরি করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে নতুন ধারা তৈরি করাও কঠিন লড়াই। ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্যসহ সব ক্ষেত্রে এ লড়াই চলে। এর মধ্য দিয়েই নতুন চৈতন্য নিয়ে মানুষ দাঁড়ায়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অবিরাম এই লড়াইয়ে আছেন। সাহিত্যের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজর দিয়েছেন। মানুষ ইতিহাসকে যেভাবে জানে সেখানে প্রশ্ন করেছেন, ইতিহাসের মধ্যে যারা

পরিচিত ব্যক্তিত্ব তাদের নতুনভাবে সন্ধান করেছেন। সমাজের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক তার মধ্যকার গ্রন্থি বা বিভিন্ন মাত্রা সেগুলোকে খুলে দেখেছেন, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী সামনে এনেছেন। সাহিত্য ও সমাজ রাজনীতি সাহিত্যের কারিগর ব্যক্তিত্বদের পর্যালোচনা করেছেন। রাষ্ট্র ও রাজনীতির ভূমিকায় মানুষের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের সঙ্গে চিন্তার যোগাযোগ সহজ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন দক্ষতার সঙ্গে, যার মাধ্যমে তিনি মানুষের সব দিকে নতুনভাবে আলো ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে যে রাষ্ট্র রাজনীতি ও শ্রেণি অবস্থানের গভীর যোগ সেটাই বারবার দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর দীর্ঘ দশবছর ধরে লেখা *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি (১৯০৫-৪৭)* গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যা লিখেছিলাম তার একটি অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক,

> 'আমাদের এই অঞ্চলে ভক্তির আতিশয্য একটু বেশি, ফলে কোনো ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধা অর্জনের মতো কিছু করেন তাহলে তাঁকে দেবতার আসনে বসানোর প্রবণতা থাকে, কারও কাজে যদি সমালোচনা থাকে তাকে সাথে সাথে শয়তানের জায়গায় নামানো হয়। বিশেষণের রক্ষাব্যূহ তৈরি করে ব্যক্তিকে সবরকম পর্যালোচনার উর্ধ্বে রাখার চর্চার কারণে ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় ইচ্ছাপূরণের গল্প। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই গল্পফাঁদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার বিষয়ে বরাবর সচেতন থেকেছেন।...সাদা ও কালো বিভাজন নয়. শুধু প্রশস্তি বা নিন্দা নয়, নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিভিন্নজনের কথা ও কাজ, ভূমিকার স্ববিরোধিতা, ভ্রান্তি, সুবিধাবাদিতা, সাহসিকতা ইত্যাদি তাই তথ্য যুক্তি বিশ্লেষণ আকারে হাজির হয়েছে (তাঁর লেখায়)।'

লেখালেখি ও শিক্ষকতার পাশাপাশি সম্পাদনায় রয়েছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সুদীর্ঘ ইতিহাস। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি *নতুন দিগন্ত* সম্পাদনা করছেন। এর আগেও তিনি ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এসব প্রকাশনার মাধ্যমে নতুন লেখক সৃষ্টি করা বা বিভিন্ন লেখকের লেখা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সংগঠন ও সাংগঠনিক তৎপরতার সঙ্গেও

নিজেকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র', 'সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘ'—এগুলোর মধ্য দিয়েও চিন্তার জগত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে যারা সমাজ রূপান্তরের জন্য কাজ করেন তাদের কাছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বড় ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আছে। তার কারণে তিনি বাংলাদেশে 'অক্টোবর বিপ্লবের শতবার্ষিকী' আয়োজনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছিলেন।

আমরা জানি যে, যে কোনো লেখকের লেখায় তাঁর রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান ওঠে আসে। বাংলাদেশে একদিকে যেমন জুলুমবাজ ও চোরাই কোটিপতিদের শক্তি বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি শ্রেণি-লিঙ্গ-জাতিগত নিপীড়ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় পরিবেশ বিধ্বংসী, জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন লড়াই হচ্ছে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক, কৃষক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের লড়াই করতে হচ্ছে, খুন, ধর্ষণ সর্বজনের সম্পদ লুটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার্থে লড়াই করতে হচ্ছে, গণতন্ত্রের জন্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। সমাজের মধ্যে চলমান এসব লড়াইয়ের সঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সবসময় একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। এর কারণে তাঁকে মামলা ও হয়রানির শিকারও হতে হয়েছে।

বাংলা-ইংরেজি মিলে শতাধিক বই লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন তবে প্রধানত গবেষণামূলক কাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি। তাঁর শিক্ষকতা, লেখালেখি, সম্পাদনা ও সাংগঠনিক কাজে যে কেন্দ্রীয় তাগিদ বা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বিগত ৫০ বছরে তার ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়েনি। তাঁর সকল তৎপরতার কেন্দ্রীয় তাগিদ পুঁজিবাদী সমাজের অমানবিক, নিষ্ঠুর, বৈষম্যমূলক, সহিংস যে চরিত্র সেগুলোকে উন্মোচিত করে মানবিক মুক্তির পথ সন্ধান করা। সামন্তবাদের পর পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়ন-আধিপত্য মানুষের ওপর চেপে বসে আছে, এসব থেকে মুক্তির জন্য মানুষ বিভিন্ন সময় পথ অনুসন্ধান করেছে। এ কাজে মানুষের চেষ্টায় কখনও বিরাম ছিল না। এই চেষ্টার প্রকাশ ঘটেছে কবিতায়, গল্পে, নাটকে, সাহিত্যে, দর্শনে,

প্রতিদিনের খণ্ড লড়াইএ এমনকি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবনদানে। সমাজকে পাল্টে দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। সেই হিসেবে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, কিউবা বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব এগুলো প্রতিটি আমাদের সামনে বড় ধরনের দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা। এগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আমাদের আরও বিকশিত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বিশ্ব জুড়ে মানুষের চিন্তা ও সংগঠিত লড়াই থেকে নিজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, অন্যদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সকল কাজের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মধ্যে সমাজকে বদলে দেওয়া বা সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের লক্ষ্য স্থির করেছেন, সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় যে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ দরকার, সেই কাজগুলো করাকেই তিনি জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করেছেন। সারকথা বলা যায়, বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, পরিশ্রম এবং অঙ্গীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি।

একই সঙ্গে আনন্দের ও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই ৮৫ বছর বয়সেও তাঁর লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে সামান্য ক্লান্তি স্বীকার করেননি। এখনও তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর সেই সক্ষমতারও কোনো ঘাটতি আমরা দেখছি না। প্রতি সপ্তাহে একাধিক পত্রিকায় তাঁর কলাম আমরা দেখে থাকি। তাঁর সম্পাদিত *নতুন দিগন্ত* পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর দীর্ঘ ও ধারাবাহিক লেখা দেখতে পাচ্ছি। এখনও তিনি গবেষণামূলক কাজ করছেন। মতাদর্শিক অঙ্গীকার খুব শক্তিশালী হলেই কেবল এই বয়সেও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এতটা স্বচ্ছ এবং সক্রিয় থাকা যায়। আমরা আশা করি, আরও বহু বছর তিনি সুস্থ ও সক্রিয় থাকবেন এবং বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী মানুষের চলমান লড়াইয়ে তাঁর কাজগুলো অনুপ্রেরণা দেবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ নির্দেশ করবে।

২২ জুন ২০২১

মওলানা ভাসানীর ‘খামোশ’

এই বছর এমন সময়ে ‘মওলানা ভাসানী’র (১৮৮০-১৯৭৬) মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে যখন দেশ এক জটিল অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের ভেতর লুটেরাগোষ্ঠীর দাপট, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদী থাবা, রাজনীতিতে প্রতারণা প্রহসন সবকিছুর মুখে মানুষ বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। ‘মওলানা ভাসানী’ বলে যাকে আমরা চিনি সে ব্যক্তির প্রকৃত নাম তা নয়। তাঁর আসল নামে এই দুই শব্দের কোনোটিই ছিল না। মওলানা ও ভাসানী এই দুটো শব্দই পরবর্তীসময়ে তাঁর অর্জিত পদবি বা বিশেষণ। ‘মওলানা’ তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও চর্চার পরিচয়, আর ‘ভাসানী’ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের স্মারক। তাঁর জীবন ও তৎপরতা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলো যাতে পদবী আর বিশেষণের আড়ালে তাঁর আসল নামই হারিয়ে গেছে। আসলে তাঁর নাম ছিল আবদুল হামিদ খান। ডাক নাম ছিল চ্যাগা, শৈশবে এই নামই ছিল তাঁর পরিচয়।

প্রাচুর্য বিত্ত বৈভব আভিজাত্য যেগুলো রাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সাধারণত কাজে লাগে সেগুলোর কোনোটাই তাঁর ছিল না। জীবনে তিনি যাত্রাদল থেকে শুরু করে দেওবন্দ মাদ্রাসা সব অভিজ্ঞতাই ধারণ করেছিলেন। এসবের মধ্যে তাঁর সাধারণ যে প্রবণতা তাঁকে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট করে তুলেছিল তা হলো তাঁর গণসম্পৃক্ততা। এই গণসম্পৃক্ততা তাঁকে নিজের ও চারপাশের সমষ্টির জীবনকে এক করে দেখার ক্ষমতা দান করেছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদকে দেখেছিলেন উপর থেকে নয়, চারপাশের পিষ্ট মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। দারিদ্র্য অসহায়ত্ব মানবেতর জীবন যে নিয়তি নয়; নির্দিষ্ট কিছু কারণ ব্যবস্থা ও

ক্ষমতা এগুলোকে সৃজন করে, টিকিয়ে রাখে এই উপলব্ধি তাঁকে আর সব মওলানা পীর থেকে ভিন্ন করে ফেলে। এই জগতে তিনি হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ, আর জনতার মধ্যে তিনি পরিণত হন মজলুম জননেতায়।

মওলানা পীর মাশায়েখরা আমাদের সমাজে এমনিতেই খুব ক্ষমতাবান। শাসক ও শোষকেরা এদের সবসময়ই পৃষ্ঠপোষকতা দেয় নিজেদের ভিত্তি শক্ত রাখবার জন্য। আর অন্যদিকে বহু মানুষ নিজেদের অসহনীয় জীবনকে সহনীয় করবার জন্য এই ধর্মীয় নেতা বা পেশাজীবী হুজুরের কাছেই হাজির হন। দোয়া, ভরসা, ঝাড়ফুক তাবিজ দিয়ে অসহায় মানুষ শরীরের অসুখ সারাতে চান, সন্তানের নিরাপত্তা চান, বিপদে আপদে আল্লাহর আশ্রয় চান, জমিদার জোতদারসহ বিভিন্ন কায়দার জালেম-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য কোনো অলৌকিক সহায়তার প্রার্থনা করেন।

যেখানে চিকিৎসার পয়সা নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই; যেখানে নিজেদের আলাদা শক্তি আছে সেই বোধ স্পষ্ট নয়; যেখানে নদী ভাঙন, জমিদার মহাজন কিংবা জুলুমবাজ ক্ষমতাবানদের অত্যাচার শোষণে বর্তমান রক্তাক্ত ভবিষ্যৎ ভীতিকর সেখানে এই পথ ছাড়া মানুষের সামনে আর কী পথ আছে? অধিকাংশ পীর মওলানা পয়সা নেন, খাওয়া দাওয়া করেন, এসব বিষয়ে দাওয়াই দেন এবং মানুষকে ধৈর্য্য ধরতে বলেন, সবুর করতে বলেন, কপাল আর বরাত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলেন। কিন্তু নিজেরা নানাভাবে আটকে থাকেন তাদের সাথেই, যারা সংখ্যালঘু কিন্তু জালেম ক্ষমতাবান। জালেমদের উপর ধর্মীয় নেতাদের নির্ভরতা, আবার ধর্মীয় সার্টিফিকেটের ব্যাপারে জালেমদের নির্ভরতা এক দুষ্টচক্র তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে তারা রক্ষা করে পরস্পর পরস্পরকে। কিন্তু মানুষের সামনে তৈরি হয় এক অচলায়তন। সেজন্য অধিকাংশ পীর মওলানা মানুষকে ইহকালের দুর্বিষহ জীবনের কারণ নির্দেশ করতে অপারগ এবং অনিচ্ছুক থাকেন। নানা ঝড়ঝাপটা আর আগ্রাসনে ক্ষতবিক্ষত মানুষদের কাছে তাঁদের একমাত্র বক্তব্য থাকে ধর্মীয় আচারপালনে, পরকালের অসীম সুখ পাবার জন্য ইহকালের বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতে। এইধরনের ধর্মীয় নেতাদের বয়ানে তাই ক্ষমতার তোয়াজ, নারীবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষ থাকে।

মওলানা ভাসানীও পীর ছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর মুরিদ ছিলেন। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদ না থাকাতে তাঁর কাছে কারও আসতে বাধা ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের নারী পুরুষ এবং বলাই বাহুল্য গরীব মানুষ যাঁরা জমিদার মহাজন আর মালিক শ্রেণির শোষণ পীড়নে বিপর্যস্ত ক্লিষ্ট তাঁর কাছে এসে হাজির হতেন। অন্যান্য ধর্মজীবীর মতো এইসব মানুষের দুঃখ দুর্দশা মওলানার আয় উপার্জনের উৎস ছিল না। মওলানা দোয়া পানিপড়া ঝাড়-ফুঁক সবই দিতেন, কিন্তু অসুখ বেশি হলে পরামর্শ দিতেন ডাক্তার দেখাতে, প্রয়োজনে ওষুধ কেনার জন্য টাকাও দিতেন।

আরও যে জায়গায় এসে তিনি অন্যদের থেকে শুধু আলাদা নয়, প্রায় বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন নিজেকে সেটিই এক মওলানাকে যুক্ত করেছিল এক ভাসানীর সঙ্গে। মানুষ তাঁর কাছে ভরসা চাইতেন আর বলতেন কিংবা জীবন্ত স্বাক্ষর হিসেবে হাজির হতেন অবর্ণনীয় অন্যায় এবং অবিচারের। এই জীবন নিয়তির বিধান, আল্লাহ এভাবেই বেশিরভাগ মানুষের জীবন নরক করে নির্ধারণ করেছেন, আর সব ক্ষমতা সম্পদ দান করেছেন লম্পট জালেমদের হাতে, এই বিশ্বাসচর্চা থেকে তিনি সরে এসেছিলেন অনেক আগেই। বরঞ্চ তাঁর অবস্থান ছিল এই যে, এই নারকীয় অবস্থা নিয়তি নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয় আর সর্বোপরি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে এই অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই ভিন্ন অবস্থানের কারণেই তিনি জীবনের তরুণ কাল থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অবস্থান নিয়েছিলেন। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত' এটা তাঁর জীবনের আরেক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম তাই অন্য প্রতিষ্ঠিত শাসকদের পেয়ারা পীর মওলানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশেষণে উপস্থিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর জীবন, উচ্চারণ এবং সংগ্রামে। যা ইসলাম ধর্মের মালিকানায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র, সামরিক শাসক, জোতদার মহাজন সামন্তপ্রভু, তাদের পেয়ারা পীর মওলানাদের ক্ষিপ্ত করেছিল। তিনি অভিহিত হয়েছিলেন 'ভারতের দালাল', 'লুঙ্গিসর্বস্ব মওলানা' এমনকি 'মুরতাদ' হিসেবে। শাসক শোষকদের এই ক্ষিপ্ততা আসলে ছিল একটা শ্রেণিগত রোষ। সবদিক থেকেই, পোশাক জীবনযাপন বয়ান আওয়াজ সবদিক থেকেই,

ভাসানী ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অভিজাত ইসলামের বিপরীতে তাঁর কাছে অন্য ইসলামের ভাষা তৈরি হয়। ধর্ম যেখানে শাসক জালেমদের একচেটিয়া মালিকানাধীন নিরাপদ অবলম্বন সেখানে মওলানা ভাসানী সেই নিরাপদ দুর্গকেই হুমকির মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অন্যায় অবিচার তো বিমূর্ত নয়, দুঃখ দুর্দশাও অজানা গ্রহ থেকে নেমে আসা ব্যাপার নয়। দায়িত্ব আর সংবেদনশীলতা দিয়ে মানুষের এসব অভিজ্ঞতা দেখলে উন্মোচিত হয় এক বিরাট রহস্য। আবিষ্কার করা যায় মানুষের মানবেতর জীবনের কারণ, শনাক্ত করা যায় এর পেছনের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ম বিধি। পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা যায় সেসব শ্রেণি গোষ্ঠী যারা এসব ব্যবস্থার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে, এসব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে, ধর্মও যা থেকে বাদ যায় না। এর থেকে সার্বিক মুক্তি লাভের লড়াই তাই অনির্দিষ্ট হতে পারে না, লক্ষ্যহীন হতে পারে না। এরজন্য দরকার এমন একটা সমাজ এর চিন্তা করা স্বপ্ন দেখা ও দেখানো, যার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে মানুষ এই নারকীয় অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। সৌদি আরব নয়, ভাসানী তাই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন সমাজতন্ত্র। যে সমাজ মানুষকে হাসি দিতে পারে মানবিক জীবন দিতে পারে সেরকম সমাজই তিনি লক্ষ্য হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

সুতরাং অন্যায় অবিচার আর দুঃখ দুর্দশা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য দোয়া দরূদ নয়, দরকার সমষ্টিগত লড়াই-এর রাস্তা তৈরি, এই উপলব্ধি মওলানাকে একই সঙ্গে সক্ষম করেছিল সংগ্রামের প্রতীক ভাসানী হয়ে উঠতে। যে ভাসানী সবরকম জালেমদের প্রবল দাপট আর আগ্রাসনের সামনে লক্ষ মানুষের স্বর নিজের কণ্ঠে ধারণ করে পাল্টা ক্ষমতার প্রবল শক্তিতে রুখে দাঁড়াতেন, এক কণ্ঠে জনতার ভেতর থেকে উঠে আসা অসীম শক্তিকে মূর্ত রূপ দিতেন। ক্লান্ত বিবর্ণ ক্লিষ্ট মানুষ শুধু নয়, প্রকৃতিকেও প্রাণবন্ত তরতাজা করে তুলতো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের হুশিয়ারিঃ ‘খামোশ’!

এই উচ্চারণ নিয়ে তিনি ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বপ্নভঙ্গের কালে মানুষের হতাশা ও প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, ভারতের শাসক শ্রেণির পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফারাক্কার অভিশাপের বিরুদ্ধে সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বামপন্থী নেতাদের ভ্রান্তি ও হঠকারিতায় ভাসানীর ক্ষমতা নানা পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তিনিও হতাশায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা দুটোই তাই আমাদের লড়াই-এর শিক্ষা। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে বাংলাদেশের মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের শাসক শ্রেণির নতুন নতুন আগ্রাসনে বিপর্যস্ত, লুটেরা শাসক শ্রেণির দখল লুণ্ঠনে দিশেহারা, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতির সম্প্রসারণে বিভ্রান্ত, তখন নিপীড়িতের ধর্মের মুক্তির ভাষা নিয়ে মওলানা ভাসানী দেশি বিদেশি দানবের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের প্রবল আওয়াজ হয়ে বারবার হাজির হনঃ ‘খামোশ’!

নভেম্বর, ২০১৩

কমরেড আবদুশ শহীদ

শহীদ ভাই বা কমরেড আবদুশ শহীদ (১৯১৭-১৯৯৬) এর সাথে আমার পরিচয় ৭০ দশকের শেষ দিকে। খুবই সহজ সরল বিনয়ী মানুষ, কাঁধের সাধারণ ঝোলায় নিজের লেখা বই, এভাবেই দেখেছি তাঁকে। তাঁর কারাস্মৃতি এর কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পর্কে আগেই শুনেছি, আমার বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল এই বই নিয়ে, সেসময়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত। পরে আরও অনেকবার দেখা হয়েছে, তাঁর বেশভূষা কথ াবার্তায় কোনো পরিবর্তন দেখিনি।

আবদুশ শহীদের জন্ম রুশ বিপ্লবের বছরে। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা, আত্মীয়তাসূত্রে শর্ষিনার পীর সাহেবের পারিবারিক ও মতাদর্শিক প্রভাবের মধ্যে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু হয়ে এরপর স্কুল, কলেজ। প্রথম শ্রেণীতে আইএ পাশ করেন চাখার কলেজ থেকে, বিএ পাশ করেন সেখান থেকেই। এমএ প্রথম পর্ব শেষ করলেও পার্টির নির্দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাদ দিয়ে সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং আত্মগোপনে চলে যান। ১৯৪৩ সাল থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রণদীভে লাইন অনুযায়ী পার্টি যেভাবে কর্মতৎপরতা সাজায় তাতে বড় আক্রমণের মধ্যে পড়ে অপ্রস্তুত পার্টি। সে সময়ই, ১৯৪৮ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৭ পর্যন্ত কারাগারে আটক হয়ে থাকা অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করেন জেলের ভেতর হত্যাকাণ্ডের নারকীয় অধ্যায়। রাজবন্দীদের ওপর অতর্কিতে পুলিশ গুলি চালায়, রক্তাক্ত হয় কারাগার। জেলের ভেতর পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে ৭ জন রাজবন্দী শহিদ হন,

গুরুতর আহত হন ২৯ জন, গুরুতর আহতদের মধ্যে শহীদ ভাই ছিলেন অন্যতম। তাঁর কারাস্মৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন সেই শহিদদের স্মরণ করে, লিখেছেন: 'খাপড়া ওয়ার্ডে শহিদ বিজন সেন, হানিফ শেখ, দেলওয়ার, আনোয়ার, সুখেন ভট্টাচার্য, সুধীন ধর ও কম্পরাম সিং-এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে'। এই গুলিবর্ষণের পেছনে ছিল জেলবন্দীদের অধিকার নিয়ে বন্দী পার্টি সংগঠকদের অনশনসহ আপসহীন আন্দোলন। অন্য বন্দীরাও তাই সহমর্মী হিসেবেই তাঁদের দেখেছেন। আবদুশ শহীদ কারাস্মৃতিতে লিখেছেন—

> 'পাশ ফিরতেই দেখি আমার শিয়রে এক কাপ গরম দুধ হাতে আমারই পাশের গ্রামের বিখ্যাত 'ডাকাত' আরশেদ বসে আছে। তার দিকে চাইতেই সে বললো, 'মিয়ার পো, খাপড়ার রক্ত ধুইতে আমাদের আনা হয়। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আপনাকে দেখলাম। সেই সময় থেকে এই দুধের কাপ নিয়ে বসে আছি, ভাবলাম সার্থক আপনাদের জীবন, এমনি করে আপনারা আমাদের জন্যই জীবন দিতে বসেছিলেন এখানে।' বলতে বলতে আরশেদ কেঁদে দিল।'

মুসলিম লীগের এক পাণ্ডা এই আরশেদদের জমি জোর করে দখল করতে চাইলে জমিতেই শুইয়ে ফেলেছিলেন, সেই মামলাতেই আরশেদ জেলে।

এই গ্রন্থে কবিয়াল রমেশ শীল, সরদার ফজলুল করিমসহ অনেক বিপ্লবীর কাহিনি, বইপড়া, গান-কবিতা-খাওয়াসহ নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। কারাগারের বর্ণনা থেকে এটুকু বোঝা যায় এতো বছর পরে, এতো লড়াই এমনকি মুক্তিযুদ্ধের পরও, জেলের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদির আরও অবনতি হয়েছে। রাজবন্দী বলে এখন কাউকে স্বীকারই করা হয় না।

এসব কঠিন পথে যারা জীবনের অর্থ খুঁজে পান তাঁদের পেছনের শক্তি অনেক সময়ই অজানা থাকে। এই শক্তির উৎস জানতে বিপ্লবীদের জীবনসঙ্গীদের ভূমিকা গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করা উচিৎ। আবদুশ শহিদেরও প্রধান অনুপ্রেরণা ও প্রভাবক ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী রাজিয়া শহীদ।

শহীদ ভাইয়ের পক্ষে এই গ্রন্থ রচনাসহ বিভিন্ন লেখালেখি এবং সক্রিয় জীবনযাপন সম্ভব হয়েছিল তাঁর কারণেই। তাঁদের মেয়ে সামিম আরা তানিয়া লিখেছেন—

> '..এমনকি আবদুশ শহীদের *কারাস্মৃতি* গ্রন্থের লেখক আবদুশ শহীদ হয়ে ওঠার পেছনেও তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রতিনিয়ত তাগিদের ফলেই বাবা শেষ পর্যন্ত কারাগারের স্মৃতিকথা লিখতে পেরেছিলেন। একথা কারাস্মৃতি বইটি প্রকাশের পর বাবার মুখেই শুনেছি। কারাস্মৃতি যেদিন বই আকারে আবির্ভূত হয় সেদিন বেশ অনেকগুলো বই নিজে হাতে নিয়ে এসে মা'র সামনে ফেলে বাবা বলেছিলেন, 'এই নাও তোমার *কারাস্মৃতি*, এইবার শান্তি তো'। বাবার আত্মকথা লেখার পেছনেও একই কথা প্রযোজ্য। মা'র উৎসাহ না পেলে আমার বোহেমিয়ান বাবার পক্ষে এ স্মৃতিকথাগুলো লেখা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।'

জীবনের প্রথম থেকেই যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হলেন, দায়বদ্ধতার সাথে মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে সক্রিয় থাকলেন জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে, তিনি এরপর কোথায় গেলেন, কী করলেন? পাকিস্তান আমলে যখন পার্টি নিষিদ্ধ ছিল, যখন নিপীড়ন ছিল সর্বব্যাপী, তখন শহীদ ভাই সক্রিয় ছিলেন পার্টিতে, কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আর তিনি কোনো পার্টির সাথে যুক্ত হলেন না। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

৬০ দশক ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সবচাইতে সমৃদ্ধ সময়। সামরিক শাসনের কঠোর বলয়ের মধ্যে পার্টি শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক কর্মী সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শুরু হয় সংকট, রুশপন্থী-চীনপন্থী বিতর্কে ভাঙন আসে গণসংগঠনে, পার্টি প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত পরে বহুধাবিভক্ত হয়। কয়েকটি ধারা বিপ্লবী রাজনীতির জন্য সকল গণসংগঠন ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় কাজ বলে বিবেচনা করলেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাই বিপ্লবী ধারা খুবই দুর্বল অবস্থানে ছিলো। স্বাধীনতার পরও তা আর আগের শক্তি ফিরে পায়নি। এরপর কয়েক দশকে অনেক 'ক্লান্ত ও প্রাক্তন' বিপ্লবী নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে

শাসকদের সাথে হাত মেলালেন। একটি অংশ কোনো পার্টির ওপরই আর আস্থা রাখতে পারলেন না, এদের মধ্যে কেউ কেউ পার্টিতে যুক্ত না থেকেও নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিপ্লবী রাজনীতিতে নিজের ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করলেন, আবদুশ শহীদ তাঁদের মধ্যে একজন।

শহীদ ভাই লেখালেখিতে বরাবরই সক্রিয় ছিলেন, কবিতা, গদ্য সবই লিখেছেন। কবিতা ও গানসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনুবাদ করেছেন, গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সাংবাদিকতাও করেছেন। পার্টির নির্দেশে প্রথম থেকেই শিক্ষকতাতে যুক্ত হয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। নিজ উদ্যোগে বেশ কয়েকটি স্কুল ও পাঠাগার গড়েছেন।

বাংলাদেশে মুক্তির সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেই সংগ্রাম বারবার মার খেয়েছে, কাঙ্ক্ষিত শক্তি অর্জন থেকে এখনও তা অনেক পেছনে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লড়াই এর ইতিহাস থেকেই আমরা এখনও শক্তি পাই, স্বপ্ন দেখার সাহস করি। আর এসব লড়াই তাই বারবার আমাদের মনে করতে হবে, বিস্মৃতির বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। আর এসব লড়াইকে বুঝতে শুধু বড় বড় নেতাদের কথা জানলেই হবে না, জানতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের কথা। যে জীবন তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনে প্রেরণা কী ছিল, কী শক্তিতে তাঁরা সমাজের ক্ষমতা, বিত্ত আর নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে কালের ডাকে মানুষের মুক্তির লড়াইকেই জীবনের সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা জানার মধ্যে আনতে আমাদের সবসময়ই মনোযোগী থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, জেল জুলুম, নিরাপত্তাহীনতা কোনো কিছুই তাদের কাছে কোনো বাধা হতে পারে না। কী প্রবল অন্তর্শক্তি নিয়ে মানুষ এই ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করতে পারে?

অনেক সময় বর্তমান ব্যর্থতা, বহু নেতার একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতায় অতীতের বড় বড় আত্মত্যাগ আমরা ভুলে যাই। অতীতের ব্যক্তি ও সমষ্টির অসংখ্য লড়াই যখন আমাদের মনোযোগ থেকে দূরে সরে যায়, যখন আমরা তা ভুলে যেতে থাকি তখন বিপদ ঘটে বহুরকম। আমরা

বর্তমানের লড়াইকে অতীতের সাফল্যের ওপর শক্তভাবে দাঁড় করাতে পারি না, আমরা অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে পারি না, আরও খারাপ হয় যখন আমরা অতীত ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করি।

প্রায় তিনদশক সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ছিলেন কমরেড আবদুশ শহীদ, এই সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি পরে একাধিক বই লিখেছেন, *কারাস্মৃতি* ছাড়াও *আত্মকথা* (তিন খণ্ড) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলো আমাদের সুযোগ করে দিচ্ছে সেই সময় ও বিপ্লবে নিবেদিত মানুষদের সম্পর্কে জানার। এই জানা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবনকে সমষ্টির স্বার্থের সাথে যুক্ত করে কমরেড আবদুশ শহীদ এক অর্থপূর্ণ জীবন তৈরি করেছেন, আর সে সম্পর্কে লিখে আরেক বড় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

১ মে ২০২০

আখলাকুর রহমানঃ পণ্ডিত শিক্ষক

অধ্যাপক আখলাকুর রহমান (১৯২৫—১৯৯২) ছিলেন অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, লেখক, গবেষক ও রাজনীতিবিদ। সবগুলো পরিচয়ই তাঁকে দেয়া যায়। সুফী সাধকও বলা যায় তাঁকে। এবং অবশ্যই স্বাধীনভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সক্রিয় থাকা মেরুদণ্ডসম্পন্ন একজন মানুষ। আখলাকুর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৮০ সালে। সেই সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি সে সময়ে বিভাগে মাস্টার্সের ছাত্র। অবশ্য এর আগেও আমি তাঁর নাম জানতাম। তিনি ১৯৭৪ সালে *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিকাশ* এই গবেষণা গ্রন্থটি লিখে খুবই আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিলেন। সে সময়ে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও বেশ বিতর্ক ছিল। বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি যারা ধনতন্ত্র মনে করতেন না, তারা আখলাকুর রহমানকে অনেক নিন্দা করেছিলেন সে সময়ে। ১৯৭৫ সালে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে যে সিপাহী বিপ্লব হয়, তখন তিনি জাসদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এ কারণে তিনি পরে জেলও খেটেছিলেন।

জেল থেকে বের হবার তিনি প্রথমে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেননি, বিভিন্ন গবেষণা ও লেখালেখি করছিলেন। তবে পাকিস্তান আমলে তাঁর শিক্ষা ও গবেষণার সূত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য (এবং কথিত 'পাগলামী') নিয়ে একাডেমিক মহলে বেশ আলোচনা ছিল। দুই পাকিস্তানের অর্থনীতি বা পূর্ব পশ্চিম বৈষম্য বিষয়ে ৬০ দশকের মাঝামাঝি তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন যা 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা

অর্জন তাঁকে সামনের সারির অর্থনীতিবিদদের কাতারে এনেছিল। বিভিন্ন গবেষণাপত্রে লেখা ও জার্নালে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। ১৯৭০ দশকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ শিরোনামে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়েও তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো এখন বাজারে নেই।

১৯৮০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পর তিনি শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন এবং শিক্ষক হিসেবে অল্প দিনের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন। পাশাপাশি জ্ঞান চর্চা ও লেখালেখিতেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কিছু দিনের মধ্যে তিনি বিভাগের সভাপতি হন এবং আমার ছাত্রত্বও শেষ হয়। তিনি সভাপতি থাকা অবস্থাতেই আমি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি ১৯৮২ সালে। তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, গবেষণা, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চিন্তার আদান প্রদান এবং কোনো কোনো সময়ে তর্ক বিতর্ক এর মধ্য দিয়ে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

১৯৭৬ সালে তিনি যখন জেলে ছিলেন সে সময়ে মার্কসের *পুঁজি* অনুসরণে তিনি বেশ কয়েকটি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। পরে বিভাগে শিক্ষক হিসেবে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' কোর্স পড়ানোর সময় ওই অধ্যায়গুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। সহকর্মী হিসেবে তিনি আমাকেও সেগুলো দেখান। আমি সেগুলো দেখে তা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করি। সে সময়ে *সংস্কৃতি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো, সম্পাদক ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। সে পত্রিকার আমি ছিলাম নির্বাহী সম্পাদক। আমাদের অনুরোধে তিনি লেখাগুলো *সংস্কৃতি*তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সেগুলো *মার্কসীয় অর্থনীতি* নামে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন আগে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

জ্ঞান চর্চার দিক থেকে অর্থশাস্ত্রের যেসব ধারা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থশাস্ত্র বর্তমান বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এটাকেই এখন মূলধারার অর্থশাস্ত্র বলা হয়। আখলাকুর রহমানের একই সঙ্গে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল এবং মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র দুটোতেই দখল ছিল। এ দুটো

ধারায় সমান দখল আছে এমন ব্যক্তি শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বেই বিরল। দুই ধারাতেই তাঁর দক্ষতা থাকার কারণে লেখা, বক্তব্য, সমালোচনা, পর্যালোচনা প্রভৃতিতে কর্তৃত্ব ও পরিপক্কতার ছাপ থাকত। নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের চর্চা যারা করেন বা যারা মার্ক্সীয় অর্থশাস্ত্র চর্চা করেন দুই ধারার অনেকের দুর্বলতাও তাঁর কাছে তাই সহজেই ধরা পড়তো, অনেকেই তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের শিকার হতেন। সবসময় তাঁর আক্রমণের ভাষা শোভন থাকতো না। সেজন্য কোন আলোচনা সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি অনেক সময় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্যও অস্বস্তিকর ছিলো। শিক্ষক হিসেবে তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন, বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। যারা তাঁর ক্লাস করেছেন তাঁরা তা জানেন।

একটা পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে এ সমিতিকে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন তিনি। অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্ব দান করতে গিয়ে অনেক অর্থনীতিবিদের সঙ্গে তার মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। সর্বত্রই তিনি যেমন ভয়ের, তেমনি একইসঙ্গে শ্রদ্ধার পাত্রও ছিলেন।

জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কম হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে তিনি দলীয় রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। এরশাদের শাসনামলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হয়েছিল। সেখানে একটি প্যানেলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং নির্বাচনে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন। সর্বোচ্চ ভোট পেলেও তৎকালীন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের পক্ষে তাঁকে উপাচার্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি যে রকম স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন তাতে নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষক দল বা কারও আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এই কারণে নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার পরও তিনি যেন উপাচার্য হতে না পারেন সে জন্য কোন কোন সহকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেতা ও সরকার সবদিক থেকেই চক্রান্ত শুরু হয়। এটা আমরাও প্রত্যক্ষ করি। শেষপর্যন্ত তাঁকে উপাচার্য পদে নিয়োগ না দিয়ে কম ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তাঁর স্নেহধন্য সহকর্মীদের ভূমিকায় তখন খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন।

স্ববিরোধী মনে হলেও তাঁর চরিত্রের আরেকটি দিক ছিল রহস্যময়তা। সুফি ধারার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন পীর, মাজারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ধর্মীয় এ ধরনের চর্চার সঙ্গে যারা যুক্ত অনেকে তাঁর বাড়িতে আসতেন। তিনিও অনেক মাজারে যেতেন। এ বিষয়গুলো তিনি আমাদের কাছে কখনো খুব একটা খোলাসা করেননি। কিন্তু এ বিষয়টা তিনি যে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন সেটা বোঝা যেত।

৮০ দশকে উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রের ওপর বেশ কিছু প্রবন্ধ সংকলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশের জন্য জমা দেন। ইংরেজি ভাষায় লেখা সেসব প্রবন্ধ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা প্রকাশের কথা থাকলেও বহুদিন পড়ে থাকার পরও সেগুলো প্রকাশে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা তা উদ্ধার করি এবং কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ায় তা একসাথে করতে বিলম্ব হয়। বহু বিলম্ব হলেও আমি তাঁর অপ্রকাশিত সেই প্রবন্ধগুলোর সংকলন প্রকাশের কাজ শেষ করতে সমর্থ হই। ২০১৪ সালে উন্নয়ন অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিতর্কগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ধরনের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করে সংহতি প্রকাশন। বইয়ের নাম: *Development and Growth Economics.* এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার অনেক লেখা প্রবন্ধ রয়েছে। বেশকিছু গবেষণাপত্র এখনও অপ্রকাশিত আছে। বাংলাদেশ কীভাবে বৈদেশিক ঋণ থেকে বের হতে পারে তা নিয়ে তিনি গবেষণা গ্রন্থ লিখেছিলেন। এটি ৮০-এর দশকে প্রকাশ হয়েছিল। বাংলা ও ইংরেজি মিলে তার যে লেখাগুলো রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো সংগ্রহ করে তাঁর একটি রচনাবলী প্রকাশ করা সবার জন্যই দরকার।

৮০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে তিনি আরও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন নিয়ে। সস্নেহ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'প্রফেসর (আমি তখন সহকারী অধ্যাপক) সাহেব, এখন তো সমাজতন্ত্রের পতন হইলো, এখন আর কী চাইবা?' আমি উত্তরে বলেছিলাম—'চাইবো মানুষের

সমাজ। শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণগত বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ চাইবো, এর জন্য মানুষের ইচ্ছা ও লড়াই তো কেউ চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারবে না।' তিনি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন—'ঠিকই তো, নাম যাই হোক এরকম এক সমাজের স্বপ্ন ও লড়াই-এর পতন হবার নয়।'

মার্ক্সীয় রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র নিয়ে তার যে মনোযোগ তা বিপ্লবী রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের প্রতি ভেতর থেকে এক ধরনের তাগিদ থেকেই তৈরি হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর আগ্রহ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে আরও কাজ করা দরকার সেটা সবসময়েই বলতেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রফেসর আখলাকুর রহমান বেশ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার আগ্রহ তিনি দেখাননি, দেশেই চিকিৎসা করেছেন। শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে অর্থশাস্ত্র ও সমাজ জ্ঞানচর্চার একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আমরা অকালে হারাই।

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

উমরের সফল জীবন

বাংলাদেশের শিক্ষা, গবেষণা ও বিপ্লবী রাজনীতির অন্যতম দিকপাল বদরুদ্দীন উমর তাঁর জীবনের সফল ৯০ বছর পূর্ণ করেছেন গত ২০ ডিসেম্বর। ১৯৩১ সালের এই দিনে তিনি বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের পিতা আবুল হাশিম ছিলেন এই অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তিনি অখণ্ড বাংলার পক্ষে কাজ করেছেন, মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মধ্যে বর্ধমানের বাড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা হয়, আগুন লাগানো হয়, এর কোনো প্রতিকারের পথ দেখতে পাননি আবুল হাশিম। পরিস্থিতির চাপে, অনিশ্চয়তায় ১৯৫০ সালে তাঁরা ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হন। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে হাশিম সাহেবের সপরিবারে নিজ ভূমি ত্যাগ তাঁর সমৃদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের জন্য ভালো হয়নি। বদরুদ্দীন উমরও বলেছেন, তাঁর পিতার এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। নিশ্চয়ই, হাশিম সাহেব প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সে দেশে থেকে গেলে ইতিহাস ভিন্ন হতো, হয়তো তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারতেন। বদরুদ্দীন উমরের জন্যও হয়তো সেইক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর পরিসরে রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা পালন সম্ভব হতো। তবে সে ক্ষেত্রে আমরা উমরকে কোথায় পেতাম?

আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপের সময় আবুল হাশিম বড় ছেলের নামের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ‘বালনার দরবেশ বদরুদ্দীন বদরে আলম ছিলেন তাদের আদিপুরুষ, “মুহম্মদ” হলেন নবি আর উমর ছিলেন শ্রেষ্ঠ খলিফা। তাই ছেলের নাম রাখেন বদরুদ্দীন মুহম্মদ

উমর।' ধর্মবিশ্বাস না হলেও পিতা আবুল হাশিমের নীতিনিষ্ঠ এবং গণমুখী ভূমিকা উমরকে প্রভাবিত করে থাকবে। বর্ধমানে তিনি যে বৃহৎ পরিবার ও সামাজিক-রাজনৈতিক আবহে বড় হয়েছেন, তা ছোটবেলা থেকেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ধারার চিন্তা ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে তাকে সাহায্য করেছিল। উমরের পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দেখেছেন অনেক কাছ থেকে, তার বৃহৎ পরিবারের অনেক সদস্যই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মধ্য দিয়ে উমর পিতার রাষ্ট্রদর্শন থেকে অনেক দূরে নিজের মতাদর্শিক অবস্থান তৈরি করেছিলেন; কিন্তু পরিবারের, বিশেষত পিতার সততা, জনমুখিতা, ন্যায়নিষ্ঠা তিনিও বহন করেছেন।

প্রথমে উমর এবং পরে আবুল হাশিম ও পরিবারের বাকি সদস্যরা ঢাকায় আসার দুই বছরের মাথায় সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালে সেই ভাষা আন্দোলনে উমর ও তাঁর পিতা দুজনই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে এই আন্দোলন নিয়ে উমর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, কঠিন শ্রম দিয়ে গবেষণাকাজ সম্পন্ন করেন। তাতে তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবহার, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ঐক্য ও সংঘাত, রাষ্ট্রের ভূমিকা যে রকম সফলভাবে উপস্থিত করেন তা তাঁকে এদেশে সমাজ, ইতিহাস, আন্দোলন গবেষণায় পথিকৃৎ হিসেবে উপস্থিত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে উমর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজে দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন্স কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং দেশে ফিরে পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়

এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে উমর দর্শন বিভাগ ছেড়ে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ দাঁড় করানোর দায়িত্বও তাকেই দেওয়া হয়।

পাকিস্তানে তখন জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন চলছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিদ্বেষের পৃষ্ঠপোষকতা চলছিল, পূর্ব পাকিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছিল নব্য উপনিবেশের মতো। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি কিংবা শাসকদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিবেচিত হতো, তারা চাইতেন সবসময় সেখানে সরকারের গুণগান হতে হবে। কিন্তু ক্রমেই সারা দেশে শিক্ষা আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্বৈরতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তৎপরতা বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মতান্ধতা, বৈষম্য, নিপীড়নের বিরুদ্ধে উমরের অবস্থান ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। তিনি লেখালিখি, সাময়িকী প্রকাশ, আইয়ুব-মোনেমের স্বৈরশাসনের নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ বিবৃতিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেন, বিভিন্ন উদ্যোগে অংশ নেন। সরকার প্রতিবাদী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দমনের জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিতে থাকে। আইয়ুব-মোনেমের পান্ডা বাহিনী এনএসএফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবু মাহমুদের ওপর শারীরিক হামলাও হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বদরুদ্দীন উমরকে বরখাস্ত করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর নানামুখী হুমকি ও চাপ বাড়ছিল, তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে নানাভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছিল, নিরাপত্তাহীনতাও তৈরি হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সক্রিয়তা অটুটরেখে উমরের পক্ষে আর শিক্ষকতা বহাল রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তা ছাড়া ততদিনে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গেও তার যোগাযোগ বেড়েছে। একপর্যায়ে ১৯৬৮ সালে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে সরাসরি বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হন।

নিশ্চিত একটি পেশা থেকে এ রকম অনিশ্চয়তায় নিজেকে ছুড়ে দেওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়, বিশেষত যেখানে উদ্বাস্তু পরিবারের সে রকম

আর্থিক কোনো অবলম্বন নেই। এ বিষয়ে তার পিতার উদ্বেগের খবর আমরা পাই সরদার ফজলুল করিমের কাছ থেকে। তার সঙ্গে আবুল হাশিমের শেষ দেখা হয় এক আলোচনা সভায়। সরদার ফজলুল করিম জানাচ্ছেন, 'সভা থেকে যাওয়ার সময় (আবুল হাশিম) আমায় ডেকে বললেন: উমরটাকে দেখেন না, আপনারা বলে-কয়ে আবার মাস্টারি করতে রাজি করতে পারেন কি না। সংসার করেছে, এখন তো তার দায়িত্ব পড়েছে।... আমি বলেছিলাম: উমরের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সে এমন তেজি যে, তার সিদ্ধান্ত অপর কেউ করে দিতে পারবে না।'

সরদার এই আলোচনার বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন, তবে 'ছেলে সম্পর্কে তার চিন্তার চেয়ে গর্ব ছিল বেশি। একবার নিজেই কোনো মজলিশে বলেছিলেন: আমায় অনেকে জিজ্ঞাসা করে, হাশিম সাহেব, আপনি আমাদের কী দিয়ে গেলেন? আমি বলি—কেন, বদরুদ্দীন উমরকে দিয়ে গেলাম। এ কথায় তাঁর ছেলে সম্পর্কে আনন্দ ও গর্বের ভাবটি প্রকাশ পেত।' আসলেই এই গর্ব অনেকের। ভারতের কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'হাশিম সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বদরুদ্দীন উমরকে নিয়ে আজ দুই বাংলা গর্ব করে।' (আহমদ শরীফ, সরদার ফজলুল করিম ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা নিয়েছি আবুল হাশিমকে নিয়ে তাঁদের লেখা থেকে। সূত্র: *আবুল হাশিম তাঁর জীবন ও সময়*, সম্পাদক: সৈয়দ মনসুর আহমদ। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০।)

দুই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাঁদের আমি আমার শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করি, যাঁদের প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, বদরুদ্দীন উমর তাঁদের অন্যতম। গত কয়েক দশকে যাঁদের সঙ্গে আমি এই জগৎ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছি, তা বাস্তবায়নে কাজ করেছি, বদরুদ্দীন উমর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে তিনি আমার সহযোদ্ধা। দীর্ঘ ২২ বছর আমরা সাংগঠনিকভাবে একসঙ্গে কাজ করেছি। আমার ওপর উমর ভাইয়ের চিন্তা ও কাজের প্রভাববলয় অবশ্য তৈরি হয়েছিল আরও আগে। তাই তাঁকে নিয়ে লিখতে গেলে নিজের কিছু কথাও না এনে উপায় থাকে না।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যে অসংখ্য কিশোর-তরুণের মধ্যে নতুন একটি সমাজ-দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও সক্রিয়তা তৈরি করেছিল, আমি তাদের একজন। স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মতো আমার মধ্যেও যে পথ অনুসন্ধান চলতে থাকে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই বদরুদ্দীন উমরের চিন্তা ও সক্রিয়তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের বেশ কয়েক বছর আগেই আমি তাঁর লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত ও আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি আমি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই। তখন আমার বাসা খিলগাঁও। সাইকেলে প্রতিদিন কলেজে যেতাম। সেই অস্থির সময় কলেজে ক্লাস হতো কমই। সাইকেল থাকায় আমি সে সময় আরও অনেক জায়গায় সময় কাটাতে পারতাম বেশি। বলতে দ্বিধা নেই, সেটাই বেশি আনন্দদায়ক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি, তথ্য ও প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার ছিল আমার নিয়মিত গন্তব্য। এ রকম একদিন সম্ভবত বর্তমান নাটমণ্ডলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন দেখে সেখানে বসলাম। সেদিনই প্রথম উমরের বক্তৃতা শুনি। এর আগে তিনি বাংলা একাডেমির পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন-এ রকম একটি খবর পত্রিকার পাতায় দেখেই মনে হয় তার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এই ঘোরাঘুরির মধ্যেই, ১৯৭৪ সালে, *সংস্কৃতি* পত্রিকার সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ঘটে।

উপরের কোনো একটি গ্রন্থাগারেই বদরুদ্দীন উমরের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা পড়েছি। ষাটের দশকে বদরুদ্দীন উমর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে লেখাগুলো লেখেছিলেন, তা তাঁর ভাষায় 'বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের' পর্ব তুলে ধরেছিল। সে সময় পাকিস্তানি সংস্কৃতির নামে আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি দাঁড় করাতে সরকারের সঙ্গে বেশ কিছু 'পণ্ডিত' নানা তত্ত্ব হাজির করছিলেন। এসব তত্ত্বকে তাত্ত্বিকভাবে মোকাবিলা, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে শিক্ষিত ও আত্মোপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলতে এবং পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করতে উমরের এই কাজগুলোর প্রভাব ছিল নির্ধারক।

যাই হোক, সত্তরের দশকের শুরুতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা বই নাড়াচাড়া করতে করতেই তাঁর ভাষা-আন্দোলনের প্রথম খণ্ড প্রথম আমার হাতে আসে। '*পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*' বইটি আমি প্রথম পাঠ করি সে সময় আমার অন্যতম প্রিয় স্থান, তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে, বেশ কয়েক দিন ধরে। অসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠের পর শুধু ভাষা-আন্দোলন নয়; সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধানে তার গবেষণা ও লেখার পদ্ধতিও আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আহমদ ছফা পরে যখন একদিন বললেন, 'আর কিছু দরকার নাই, উমর যদি জীবনে আর কিছু না-ও করতেন তবুও এই গ্রন্থের জন্যই তিনি বাঙালি সমাজে চিরস্মরণীয় থাকবেন', তা খুবই ঠিক মনে হয়েছে। তবে এরপর সৌভাগ্যক্রমে তিনি আরও অনেক কাজ করেছেন-তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক।

শুধু লেখক, গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে উমরের যে অবদান, তার তুলনাই খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তিনি এর মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখেননি। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক হিসেবে তার যে বিপ্লবী অবস্থান তৈরি হয়, তার পূর্ণতার জন্যই তিনি সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আগেই বলেছি, ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখালেখি করায় আইয়ুব-মোনেম সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি এতটুকু উপলব্ধি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার পক্ষে বেশি দূর কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরেও শিক্ষকতা বা অন্য কোনো পেশা গ্রহণ না-করে, অনিশ্চয়তা ঘাড়ে নিয়ে, একদিকে সমাজ-রাষ্ট্র-ইতিহাস অনুসন্ধান এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে আজীবন একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই যাত্রা বদরুদ্দীন উমরকে এ দেশের ইতিহাসে অনন্য অবস্থানে স্থাপন করেছে। তবে তাঁর এই কঠিন যাত্রা সফল করতে নিঃসন্দেহে যাঁর সার্বিক ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি উমরের স্ত্রী সুরাইয়া হানম।

বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত '*সংস্কৃতি*' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। সেই পত্রিকার নিয়মিত প্রধান লেখক ছিলেন বদরুদ্দীন উমর ও ডাক্তার সইফ-উদ-দাহার। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লেখা সে সময় তাতে প্রকাশিত হচ্ছিল। বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ ও বিপ্লবী আন্দোলনের গভীর নির্মোহ পর্যালোচনা করে সঠিক পথ সন্ধান। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই জরুরি অবস্থা ও সব পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে '*সংস্কৃতি*' বন্ধ হয়ে যায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। বন্ধ হওয়ার আগে এই পত্রিকা পাঠ করে আমার নিজের উপলব্ধি ও প্রশ্ন নিয়ে আমি সম্পাদক বরাবর তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম। অনেক পরে যখন আমরা একসঙ্গে সংগঠন করি, তখন উমর ভাই তাঁর ফাইলে রাখা সেই চিঠিটি আমাকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর সব কাজ বরাবরই খুব গোছানো, তিনি বরাবর সুশৃঙ্খল মানুষ।

উমর ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৮ সালে, তখন তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে নতুন ধারা তৈরিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তত দিনে আমি বাঙলাদেশ লেখকশিবিরে যোগদান করেছি। ক্রমে আমি এই ধারার বিভিন্ন সাংগঠনিক ও মতাদর্শিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হই। লেখকশিবির ছাড়াও কৃষক ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বিভিন্ন ব্যানারে সক্রিয় থাকি, অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করি। অসংখ্য সভা-সমাবেশ এবং প্রকাশনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে ১৯৮১ সালে আবারও '*সংস্কৃতি*' প্রকাশ শুরু হয়। এবারও বদরুদ্দীন উমর সম্পাদক হন, আমি দায়িত্ব নিই নির্বাহী সম্পাদকের। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত '*সংস্কৃতি*'র এই দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত ছিল।

বদরুদ্দীন উমরের সাংগঠনিক কিছু সিদ্ধান্ত ও কাজের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদের কারণে ২০০০ সালের শেষদিকে আমি সংগঠন ত্যাগ করি, পরে আমাকে বহিষ্কার করা হয়। আত্মজীবনীতে তিনি আমার সম্পর্কে বেশ কটূক্তি করেছেন, ভুল তথ্যভিত্তিক কিছু সিদ্ধান্তও টেনেছেন, যা আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এর কারণে তাঁর শক্তি ও রাজনৈতিক মতাদর্শিক ভূমিকা সম্পর্কে আমার মূল্যায়নে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেই পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা সৃষ্টির যে সংস্কৃতি আমাদের বিপ্লবী রাজনীতির অনেক ক্ষতি করেছে, সেই পথ থেকেও সচেতনভাবে দূরে থেকেছি।

তিন

বদরুদ্দীন উমরের লেখার ধার ও ক্রোধের কথা সবাই জানেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার একটি প্রান্তদেশ বাংলাদেশ। এই দেশ শাসন করছে একের পর এক বিভিন্ন নামে ও রূপে লুটেরা, দখলদার চোরাই কোটিপতিরা। জনগণের বিরুদ্ধে তাদের হাতে নতুন নতুন দণ্ড থাকে। লুটেরা দখলদারদের রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আইনি কিংবা বেআইনি নানা পথ ও পদ্ধতি আছে, আছে ক্রসফায়ার, খুন-গুমসহ আতঙ্ক সৃষ্টি ও নিপীড়নের নানা পথ। গণতন্ত্র আর শান্তির নামে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতায় বিশ্ব এখন ক্ষতবিক্ষত। এই পুঁজিবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থার আদর্শিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সহযোগী এ দেশের শাসক-শ্রেণি। উন্নয়নের নামে মানুষের জীবনজীবিকা, নিরাপত্তা, প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশের বিনিময়ে ফুলে-ফেঁপে উঠছে কতিপয় গোষ্ঠী। শ্রেণি-জাতি-লিঙ্গ-ধর্মভিত্তিক বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা শুধু টিকিয়ে রাখা নয়, তার আরও বিস্তারের মধ্য দিয়েই শাসকগোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি। এই বিশ্বে, এই দেশে, কোনো সংবেদনশীল, মননশীল, দায়িত্বশীল মানুষ ক্রোধ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন?

কিন্তু আমাদের সমাজে বুদ্ধিবৃত্তি যেন ক্ষমতা আর বাণিজ্যের মধ্যে বসতি গেড়েছে। সরকার, বাজার, কোম্পানি ও এনজিও জগৎ-এই হলো এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের প্রধান ক্ষেত্র। এ ধরনের লোকের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি তাই ফরমায়েশি বা তোষণমূলক বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। সুবিধাবাদিতা, লেজুড়বাদিতা কিংবা দেউলিয়াত্ব প্রগতি, চিন্তা ও রাজনীতির প্রবল শক্তিকে এখনো আটকে রেখেছে। বদরুদ্দীন উমরের মতো ব্যক্তি এ রকম সমাজে অস্বস্তির কারণ হওয়ারই কথা।

বাংলা ভাষায় মার্কসীয় সাহিত্য উপস্থাপনে উমর অগ্রণী নিঃসন্দেহে। পাশাপাশি তিনি ইংরেজিতেও লিখেছেন। সর্বশেষ তাঁর প্রথমে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি ও দিল্লী এবং পরে বাঙ্গালা গবেষণা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দুই খণ্ডে *The Emergence of Bangladesh* গ্রন্থে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেণিসংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি যা লিখেছেন, তা ইংরেজিভাষী আগ্রহী পাঠক-

গবেষকদের অনেক ভ্রান্তি দূর করবে নিশ্চিতভাবেই। বাংলাদেশে শোষণ-নিপীড়ন-বৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য নিয়ে উমরের ক্ষুরধার লেখা সমাজে অধিপতি চিন্তাকে বিরতিহীনভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। যেখানে ক্ষুদ্র তরল লোকজন সমাজের মাথা হিসেবে বিবেচিত হয়, যে সমাজে খলনায়কেরা নায়কের মর্যাদা পায়, সেখানে উমরের মতো পণ্ডিত ও বিপ্লবী তাত্ত্বিকের চিন্তা ও কাজ নিয়ে নীরবতা বিস্ময়কর নয়।

উমরের তত্ত্বচিন্তা, লেখালেখি তাঁর বিপ্লবী সাংগঠনিক অঙ্গীকারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। তাঁর সব লেখালেখির উদ্দেশ্য সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের চিন্তা ও কাজকে অগ্রসর করা। উমরের লেখা, গবেষণা, প্রকাশনাকে তারপরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, ইতিহাসকে স্বচ্ছভাবে দেখা ও যথাস্থানে উপস্থিত করা। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন রাজনীতি, পূর্ব বাংলায় শ্রেণিসংগ্রাম, যুদ্ধ-পূর্ব ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থগুলো তারই নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যমান বৈষম্য, নিপীড়ন ও আধিপত্যমুখী চিন্তার জগৎকে আঘাত করা। সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিশ্লেষণ। সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদসহ বিভিন্ন জটিল ও অধিপতি চিন্তার সমস্যা উন্মোচন করা তিনি একটি দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

তৃতীয়ত, মার্কসীয় তত্ত্বকে যতটা সম্ভব সহজভাবে পরিচিত করা। *মার্কসীয় দর্শন*, *মুক্তি কোন পথে*-সহ বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় উমর বরাবর দক্ষভাবে এ কাজ করেছেন।

চতুর্থত, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যে ব্যবস্থায় আমরা বাস করি, তার সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা ও উপলব্ধি সৃষ্টির তাগিদে এ বিষয়ে বিশ্লেষণ উমরের লেখা ও আলোচনার অন্যতম ক্ষেত্র।

পঞ্চমত, উমর নিয়মিতভাবে চলতি বিষয় পর্যালোচনা করে লিখেছেন, বিতর্ক করেছেন।

ষষ্ঠত, সর্বোপরি, নিজ দেশের বিপ্লবের জন্য তত্ত্ব নির্মাণ তার বিশেষ মনোযোগের ক্ষেত্র। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *সংস্কৃতি* পত্রিকা থেকে গত কয় দশকে এ বিষয়ে তার বহু বিশ্লেষণী লেখা এ দেশের রাজনৈতিক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

চার

সততা, নিষ্ঠা, আপসহীনতা, দৃঢ়তা—এই সব কটি শব্দই উমরের পরিচয়ে নির্দ্বিধায় যোগ করা যায়। আবারও বলি, উমরের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ এবং মানুষের মুক্তির রাজনীতির মধ্যে কোনো প্রাচীর নেই; একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ষাটের দশকের শেষ থেকে সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত হওয়ার পর গত কয়েক দশকে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তিনি সাংগঠনিকভাবে কাজ করেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এদেশে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠন বিস্তারে ব্যর্থতা তো আছেই, নইলে বাংলাদেশের চেহারা তো ভিন্ন হতো। ব্যর্থতা না থাকলে ১৬ কোটি মানুষ নিজেদের মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করত, মানুষ ও প্রকৃতি মিলে এক অসাধারণ জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। এটা যে আমরা এখনো পারিনি সেই ব্যর্থতা সামষ্টিক, আমাদের সবারই তাতে দায় আছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা চিরস্থায়ী নয়। কারণ, এই সময়ের সব কাজ, ভুল ও সঠিক, ভবিষ্যতের আরও শক্তিশালী যাত্রার ভিত নির্মাণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা যোগ করছে।

ব্যক্তি উমর এককভাবে যেখানে সফল, সেটা হলো তিনি হাল ছেড়ে দেননি। বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের যে লড়াই, তা উমরের ভাষায়: '৭১-এর অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রামের জের।' পরাজয়, আত্মসমর্পণ আর দাসত্বের শৃঙ্খল প্রত্যাখ্যান করার শক্তিই এই সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার পূর্বশর্ত। জীবনের এই পর্যায়ে এসে উমর গভীর তৃপ্তি আর প্রবল অহংকার নিয়ে বলতে পারেন, তিনি আজীবন বিরামহীনভাবে এই শক্তি নিয়েই কাজ করেছেন। তিনি তাঁর যথাসাধ্য ভূমিকা পালনে কিছুমাত্র দ্বিধা বা ক্লান্তি প্রদর্শন করেননি। বদরুদ্দীন উমর তাই সময়ের শিক্ষক ও মুক্তিকামী মানুষের পরীক্ষিত সহযোদ্ধা।

২৫ *ডিসেম্বর* ২০২১

দীপংকর চক্রবর্তী এবং অনীক

দীপংকর চক্রবর্তীর (১৯৪১-২০১৩) সাথে আমার প্রথম দেখা ঢাকায় একুশে বই মেলায়, সম্ভবত ১৯৮৩ বা ৮৪ সালে। আমি তখন বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত '*সংস্কৃতি*' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা সে সময় প্রতিবছর 'সংস্কৃতি প্রকাশনী' থেকে একুশে বইমেলায় স্টল দেই। সেই স্টলের সামনেই উমর ভাই আমাকে দীপংকরদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনে আছে সেখানে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম।

এরপর আরও বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। কলকাতার বাইরে থাকতেন বলে কলকাতায় গেলেও তাঁর সাথে দেখা করা কঠিন ছিলো, উদ্যোগ নিয়েছি তবুও। অন্তত টেলিফোনে কথা হয়েছেই। কলকাতায় তিনি বাস শুরু করবার পর যখনই কলকাতা গেছি তাঁর সাথে দেখা করা ছিলো ফরজ। শ্বাশ্বতী অনিন্দ্যের বাসাতেও দেখা হয়েছে একাধিকবার। ঢাকায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো একুশের বইমেলায়। ঢাকায় গীতিআরা ওমর তারেকের বাসাতেই সর্বশেষ দেখা হয়, কয়েক বছর আগে। কলকাতায় সর্বশেষ দেখা হয়েছে গত বছর মার্চ মাসে। এবার আমার মনে হয়েছিলো আর যদি দেখা না হয়, দেখা করতেই হবে। সময় বের করা কঠিন ছিলো বলে বেশ রাতে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই অনীক অফিসে আড্ডা ডেকেছিলেন। সেই আড্ডাতেই শেষ দেখা। তিনি যথারীতি লেখার তাগিদ দিয়েছিলেন, *অনীক* নিয়ে সামনের অনেক পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে, শুভাশিস, সুমিতা আর রতনদাসহ তাঁর সহযোদ্ধারা এই পরিকল্পনার পথেই হাঁটবেন, *অনীক* কখনো থামবে না।

দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পাদিত *অনীক* পত্রিকার কথা জানি। ঢাকায় এই পত্রিকার কিছু কপি হয়তো হাতে হাতে আসতো, সব সংখ্যা না দেখলেও কিছু কিছু সংখ্যা দেখেছি, আগ্রহ বোধ করেছি। স্কুল পার হতে হতে, আগ্রহের জায়গা বদলে আমি যখন নানাদেশের সমাজ বিপ্লব নিয়ে বই পত্রপত্রিকা খুঁজি, বুঝতে চেষ্টা করি, তখনই *অনীক* এর দেখা পাই। পরিচয় এবং একরকম স্থায়ী সম্পর্ক। সেই পত্রিকার সম্পাদক দীপংকরদার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে ততদিনে আমি বিপ্লবী রাজনীতির একটি ধারার সাথে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত। মনে আছে, প্রথম পরিচয়ের দিন *অনীক* পত্রিকা যাতে বাংলাদেশে নিয়মিত আসে তার ব্যবস্থা করবার নানাদিক নিয়েও আমরা কথা বলেছিলাম।

এই পরিস্থিতি আমরা সবসময়ই দেখি যে, বাংলাদেশের বাজার ভারতের আইনী বেআইনী পণ্যে ভর্তি। রাস্তায় ভারতের গাড়ি, ঘরে ঘরে ভারতের সব টিভি চ্যানেল। কিন্তু কিছু বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা ছাড়া প্রয়োজনীয় বই পত্রপত্রিকা এখানে আনার ব্যাপারে বহু জটিলতা। এমনকি চিঠিপত্র আদান-প্রদানও খুবই সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কয়েক বছর আগে সৌমিত্র তাই যখন একবার সীমান্তে যোগাযোগ কেন্দ্র করবার কথা বলেছিলেন তা তখন আমার খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিলো।

বাংলাদেশের মতো ভারত রাষ্ট্রও তার দেশের মানুষকে নানাভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্রায় সামরিক শাসনে চলছে। কিন্তু ভারতের মুক্তিকামী নারীপুরুষ ঠিকই নানাস্থানে নানাভাবে লড়াই করছেন, রক্তক্ষয়ী লড়াই-এরও জন্ম হচ্ছে। ভারতের এতো এতো টিভি চ্যানেল, কিন্তু এসব লড়াই, মানুষের ভিন্ন চিন্তার খবর সেগুলোতে পাওয়া যায় না। যেসব পত্রিকা এসব চিন্তা ও খবরের ওপর গুরুত্ব দেয় সেগুলো আবার এদেশে পাওয়া কঠিন। বাংলাভাষায় *অনীক* সেই জনগণের জীবন ও লড়াই-এর ভাষ্য উপস্থিত করে আমাদের সামনে। সেজন্য এই পত্রিকা এই দেশের মানুষের লড়াই-এর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের তিনদিকে কাঁটাতার দিয়ে দুই দেশের শাসকদের মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন দিগন্ত খুলে পুরো দেশে ভারতের বৃহৎ পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধির আয়োজন চলছে। পাশাপাশি দুই দেশের শাসকেরাই দুইদেশের

জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে সবসময়ই সক্রিয়। দুই দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির মতো চিন্তার যোগাযোগ যাতে যতটা সম্ভব কম থাকে নানাভাবে সেই চেষ্টা আছে বরাবর। বাংলাদেশে ভারতের যতটা, ভারতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রাম ও চিন্তাভাবনার খবর পৌছায় আরও কম।

ভারতের প্রধান প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশকে 'মৌলবাদ আক্রান্ত একটি দেশ' হিসেবে উপস্থিত করতে যত আগ্রহী, এদেশের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও শোষণ আধিপত্য থেকে মুক্তির লড়াই-এর খবর দিতে ততটাই অনাগ্রহী। এসব নিয়ে দীপংকরদার সাথে আমাদের অনেক কথা হয়েছে, আমরা এই অচলায়তন ভাঙার জন্য করণীয় নিয়েও অনেক কথা বলেছি। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ভারতের *অনীক* পত্রিকার পাঠকদের বাংলাদেশের চিন্তা ও লড়াই এর খবর পৌঁছে দিতে চাইতেন। সেজন্য লেখার ব্যাপারে বরাবর চাপ দিতেন।

গত কয়েক দশকে বিপ্লবী রাজনীতি বাংলাদেশের মতো ভারতেও নানামাত্রায় হোঁচট খেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এক প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তৈরি করেছে চিন্তা ও সংগঠনের কাজে। নানা কারণে অনেকেই ছিটকে পড়েছেন, পার্টি বসে গেছে, ভেঙে গেছে, আবার অনেক স্পষ্ট অস্পষ্ট নতুন চিন্তাও শুরু হয়েছে। এই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে, কোনো পার্টিতে যুক্ত না থেকেও, বিপ্লবী অঙ্গীকার নিয়ে শুধু এই পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখা যে কতো বড় কাজ তা ভবিষ্যৎ আরও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করবে।

নিয়মিতভাবে এরকম একটি পত্রিকা প্রকাশ যে কত কঠিন তা আমরা বুঝি। কিন্তু তা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝলেও তাকে বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি আমরা কমই। আরও সেজন্যই এতোবছর ধরে নিয়মিত *অনীক* এর মতো একটি পত্রিকা প্রকাশ আমাদের কাছে সবসময়ই একটি বিস্ময় ছিলো। আর তার জন্য দীপংকরদার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা দিনে দিনে শুধুই বেড়েছে।

দীপংকরদার বয়স বেড়েছে, শরীর আপত্তি করেছে, কিন্তু মানুষের মুক্তির সংগ্রামের প্রতি তাঁর প্রবল দায়িত্ববোধ তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো থামাতে

পারেনি। তিনি আমাদের মধ্যে এখন আর শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু তাঁর এই প্রবল জীবন আমাদের জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

২০১৪

সত্য মৈত্রঃ জীবনের যোদ্ধা

শেষ দেখা মৃত্যুর দুদিন আগে, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে। এই হাসপাতালের একটি কক্ষই ছিলো তাঁর দীর্ঘদিনের ঘরবাড়ি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কাজী কামরুজ্জামান সামাজিক দায় থেকে নানা কর্মসূচি রেখেছেন এখানে। এসব কর্মসূচির অন্যতম হলো, যারা সমাজের জন্য কাজ করতে গিয়ে নানা সংকটে পড়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন তাঁদের জন্য সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। সেভাবেই সত্য মৈত্র এই হাসপাতালে দীর্ঘদিন অতিথি হিসেবে থেকেছেন।

সত্য মৈত্র (১৯২৩-২০১৯) আজীবন মানুষের জন্য কাজ করেছেন, মাঠে কাজ করবার ক্ষমতা যখন হারিয়েছেন তখনও তাঁর চিন্তায় মানুষই ছিলো, সমাজ রূপান্তরের বিপ্লবী রাজনীতির দুর্বলতা ও করণীয় নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিলো আমৃত্যু। সর্বশেষ আমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা যখন তাঁকে দেখতে যাই তখন তিনি কিছুদিন আগেরও দেখা সেই সত্যদা নেই যিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়, কথায় তারুণ্য, নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় উদগ্রীব। না, এবার তিনি বিছানায় পড়ে আছেন, শরীর শুকিয়ে শীর্ণদশা, তাকালেন কিন্তু বারবার ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। চিনতে পারলেন ঠিকই, যতোবার জেগে উঠলেন ততবারই হাত ধরে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। সত্যদার সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছিলেন শিক্ষার্থী শোয়েব, তার সাহায্যে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলাম। একটা বাক্য অবশেষে উদ্ধার করতে পারলাম, 'দেশের রাজনীতি এতো পশ্চাদমুখি কেনো? বলবা না? লিখবা না?'

কমরেড সত্যরঞ্জন মৈত্র জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ ভারতে। পাকিস্তান হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন বাংলাদেশে গত ৮ এপ্রিল। তাঁর জীবনকথা

তিনি লেখেননি কোথাও তবে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের জীবনের কথা বলেছেন (আনিস রায়হান: 'সাম্যবাদের ডাক ঘুমে জাগরণে', *সাপ্তাহিক*, ঈদ সংখ্যা, ২০১৬)। তাঁর জন্ম ১৯২৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। রাজশাহীর আত্রাই থানার ভবানীপুর গ্রামে তাঁর বাবার বাড়ি। একান্নবর্তী বড় পরিবার। তাঁর ভাষায়, 'এখনকার হিসেবে সচ্ছল উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল। আর তখনকার হিসেবে ছিল ছোট জোতদার পরিবার। বাবার নাম নিত্য গোপাল মৈত্র। মায়ের নাম সরলা বালা দেবী।' মামাবাড়ির সাথে যোগাযোগ ছিলো বেশি। ছোটবেলার যে ঘটনা তাঁকে প্রতিবাদী ভূমিকায় যাত্রা শুরুতে ভূমিকা পালন করেছিলো সেটি ঘটেছিলো তার জেঠার জমিদার এস্টেটের অফিসে। সেখানে ৫৫-৫৬ বছর বয়স্ক এক মুসলমান প্রজাকে হাত পা বেঁধে মাটিতে ফেলে বেত দিয়ে পেটানো হচ্ছিলো খাজনা না দেবার অপরাধে। এতে তাঁর শৈশবের মনে অনুসন্ধানী দৃষ্টি যোগ হয়, নিজেদের পরিবারের বাইরে গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তাঁর চিন্তা বিকশিত হবার ক্ষেত্রে পাঠের আগ্রহ আরেকটি ভূমিকা পালন করে। গ্রামে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের নামে বড় একটি লাইব্রেরি ছিল। সেখানে রক্ষিত বইয়ের বিরাট সংগ্রহ দিয়েই জগতের সাথে তাঁর পরিচয়। শহর থেকে ডিগ্রি নিয়ে গ্রামে ফেরা এক যুবকের মাধ্যমেই তাঁর আরও জগত চেনা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন। ঐ যুবক প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী। সেসময় কবি মুকুন্দ দাস যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা তৈরিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যাত্রা ও গানের কারণে চারণকবি মুকুন্দ দাস কয়েক দফা জেল খেটেছেন নির্যাতিত হয়েছেন। মুকুন্দ দাসের গান ও যাত্রায় সত্য মৈত্র অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন তিনি। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী—

> 'ফরিদপুর জেলায় তখন চারটি মহকুমা ছিল। তার মধ্যে গোপালগঞ্জে আমরা একটু দুর্বল ছিলাম। বাকি তিন মহকুমায় কৃষকদের মধ্যে পার্টির বেশ শক্তি ছিল। এরপরেই ছিল ছাত্র সংগঠনের কাজ। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ তার তুলনায় কম ছিল।

> ব্রিটিশ আমলে আমরা ছিলাম তৃতীয় প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগের পরেই আমরা। আমাদের তখন অনেক কাজ ছিল। তখন ময়মনসিংহ জেলায় সারা ভারতের কৃষক সমিতির সম্মেলন হয়। তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে তিন লাখ কৃষকের সমাবেশ হয়। আমাদের তখন যে বিরাট গণভিত্তি ছিল, এর মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ মেলে।'

১৯৪০ সালে সত্য মৈত্র রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন, সে বছরই ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার অপরাধে প্রথম তাঁকে জেলে যেতে হয়। এই জেলে আরও অনেক নেতা কর্মী জড়ো হয়েছিলেন। তার ফলে জেলে গিয়ে তাঁর শিক্ষা আরও প্রসারিত হলো। অনিশ্চিত সংগ্রামী জীবন চিরস্থায়ী হল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি বলছেন—

> 'পাকশি থেকে ভাটিয়াপাড়া হয়ে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বিরাট এলাকা নিয়ে রেলওয়ের পাকশি ডিভিশন। রেলশ্রমিকদের ঘাঁটি ছিল এ অঞ্চল। পার্টির প্রাদেশিক শাখা সিদ্ধান্ত দিল, জেলা কমিটি থেকে একজনকে বাছাই করে রেলশ্রমিকদের মধ্যে পাঠাতে হবে। নির্বাচন হবে ৪৬ সালে। এর আগেই যা করার করতে হবে। জ্যোতি বসুর পক্ষে ভোট টানতে হবে।'

সত্য মৈত্র রেলশ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবার দায়িত্ব পেলেন।

এর কয়েক বছরের মধ্যে পরপর অনেকগুলো ঘটনা ঘটলো। ভয়ংকর সাম্প্রদায়িকতার বিষে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাও ডুবলো, ভারত ভাগ হলো। তার আগে আগে তেভাগা আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হলেও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব হটিয়ে কোথাও কংগ্রেস কোথাও মুসলিম লীগ জায়গা নিয়ে নিলো। এর কারণ কী? সত্য মৈত্র বলেন—

> 'পার্টি কংগ্রেস-মুসলিম লীগকে চাপে রাখার রাজনীতি করছিল। কিন্তু কংগ্রেসকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে, এই লাইনের বিকাশ ঘটেনি। আমরা ক্ষমতা দখলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের

নেতৃত্বের ওপরই নির্ভর করেছি। এক অর্থে পার্টি তাদেরকে উচ্ছেদের লাইন নিতে পারেনি। যদিও আমরা বলেছি যে, এরা ব্রিটিশের দোসর, এরা আপস করে ক্ষমতায় যেতে চায়, এদের বর্জন করুন। আবার বাস্তবে কংগ্রেস-লীগ এক হও বলে প্রচার চালিয়েছি।'

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বাংলা ভাগ হয়ে যাবার পর সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান হলো না বরং তা স্থায়ী হল। দুদিক থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজভূমি ত্যাগ করলেন তো বটেই, দুদিকেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ গভীরতর হলো। সে সময় অন্য অনেকের মতো সত্য মৈত্র-র পরিবারের অধিকাংশ সদস্যও ভারতে চলে যান। পার্টি কমরেডদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিচয়ের মানুষ, তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে ১২ হাজার পার্টি সদস্য ছিলেন, তাদের মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি ভারতে চলে গেলেন।' সত্য মৈত্র ১৯৪৮ থেকেই জেলখানায়, ছাড়া পেলেন ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খান নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসন শুরু হবার পর তিনি আবার জেলে যান ১৯৬০ সালে। এই দফায় তাঁকে জেলে থাকতে হয় ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। এতো জোর-জুলুম আর অনিশ্চয়তার মধ্যেও, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তিনি এদেশ ত্যাগ করেননি। আমাকেও বলেছেন—'এখানে অবস্থা বেশি খারাপ সেজন্যেই মনে হয়েছে আমার এখানেই কাজ করা দরকার বেশি।'

১৯৬৫ সালে আবারও গ্রেফতার হন, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত জেল খাটেন তিনি। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তার কারণেই জেল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সর্বশেষ মুক্তি পান শান্তি সেন ও সত্য মৈত্র। এই পর্বে সত্য মৈত্র যখন জেলে তখনই মস্কো-পিকিং মতাদর্শিক মহাবিতর্ক ধরে পার্টি ভাঙন শুরু হয়। এই ভাঙন, পিকিংপন্থীদের উপর্যুপরি আরও ভাঙন, চারু মজুমদারের লাইনের প্রভাব, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনভিত্তি নিয়ে মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার ব্যর্থতা সবকিছুর কোনো না কোনো মাত্রায় তিনি অংশীদার ছিলেন। অনেক কিছুতে একমত হননি কিন্তু হাল ছাড়েননি।

চারু মজুমদারের লাইন সম্পর্কে উপরোক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—

'ক্ষমতা দখলকে যে তিনি লক্ষ্যের মধ্যে নিয়ে আসেন এটা ভালো দিক ছিল। কিন্তু দ্রুত বিজয়ের আকাঙ্ক্ষার দরুণ বিপ্ল-বের অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়। অন্ধ্র পার্টি, কেরালা পার্টি তখন অনেক কিছু বলেছিল। তিনি সেগুলো আমলে নেননি। তাদেরকে অপ্রস্তুত রেখেই তিনি পার্টি গঠনে নেমে যান। এই প্রস্তুতিহীনতার কারণেই পার্টির মধ্যে নিবিড় ঐক্য তৈরি হয়নি। যা অর্জন করার সুযোগ ছিল তা পার্টি করতে পারেনি।'

তিনি এ প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেন—

'আমাদের পার্টি বেশিরভাগ সময় অনুকরণ করেছে। পার্টি তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে, নিজস্ব ধারণা নিয়ে আলাদাভাবে বক্তব্য রাখার কাজ যতটা না করেছে, তার চেয়ে চীনা পার্টি কী বলল, রুশ পার্টি কী বলল, তা দ্বারা আমরা বেশি প্রভাবিত হয়েছি।'

১৯৬৯ সালে জেল থেকে বের হবার পর থেকে সত্য মৈত্র দীর্ঘকাল আত্মগোপনে থেকেই সংগঠনের কাজ করেছেন। এর মধ্যে পার্টি আরও বিভক্তির শিকার হয়েছে। শেষকালে তিনি যুক্ত ছিলেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বারবার ভাঙন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হলো—

'আমরা বিরাট অসহিষ্ণুতা দেখেছি। পার্টিতে কেউ একটা মতামত দিলেন, যাদের মতের সঙ্গে মিলল না, তারা বৈরী হয়ে গেল। তার বিরুদ্ধে ঘোঁট তৈরি হতে লাগল, তাকে পার্টি থেকে বের করে দেয়া হলো। আর তার পক্ষের শক্তি বেশি হলে পার্টি ভাগ হয়ে গেল। এটা ছিল দুই লাইনের সংগ্রামের পদ্ধতি বিকশিত করতে না পারার ফল। এই যে দ্বিমত মানেই বৈরিতা, এই রেষারেষিটা এসেছে পেটি বুর্জোয়া সংস্কার থেকে। কোনো পার্টি এখান থেকে আজও বের হতে পারেনি।'

এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে স্বভাবতই আরও অনেকের মতো সত্য মৈত্রের মনেও হয়তো একরকম অশান্তি ছিলো। তারপরও তিনি একাধিকবার

আমাকে বলেছেন—

> 'আমার জীবন নিয়ে কোনো গ্লানি বা অপরাধবোধ নেই। কারণ ব্যর্থতা থাকলেও এতটুকু বলতে পারি আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, কখনও নিজের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হইনি।'

পুরো জীবন তিনি বিপ্লবী সংগ্রামেই ব্যয় করেছেন। স্ত্রী পুত্র কলকাতায় থাকলেও তিনি রাজনৈতিক দায়বোধ থেকে এখানেই রয়ে গেছেন। বাবা এবং মায়ের দিক থেকে পাওয়া ঘরবাড়ি জমি সম্পত্তি পার্টিকে দিয়ে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। নিজের থাকার জন্য কোনো আলাদা জায়গাও রাখেননি, খাওয়া পরার কোনো ব্যবস্থাও রাখেননি। পার্টি কমরেডদেরকেই স্বজন ভেবেছেন, তাঁদের সাথেই থেকেছেন। নিজের দেহও নিজের কাছে রাখেননি, দিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজে, মৃত্যুর পর তা চলে গেছে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষা গবেষণার কাজে।

এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতা যতোটা উদযাপন করা হয় ততোটা তার পর্যালোচনা করা হয় না। কতোমানুষ তাঁদের সর্বোচ্চ শক্তি ও মেধা দিয়ে একেকটি ধাপ তৈরি করেছেন। সাফল্য তো বটেই তাঁদের ভুলও একেকটি শিক্ষা। পর্যালোচনা করলে এর মধ্যে বহুশক্তির জায়গাও সনাক্ত করা যাবে, পাওয়া যাবে অনেক খণ্ড খণ্ড বিজয়ের সংবাদ যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যার কারণে এখনও এই দেশের মানুষ লড়াই করে, মুক্তির স্বপ্ন দেখে। সত্যদার মতো মানুষেরাই সেই শক্তি তৈরি করেছেন।

মে ২০১৯

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: নতুন জগতের অসামান্য কারিগর

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে আমি কথা বলতে গেলে গত বছরগুলোতে গড়ে ওঠা জাতীয় কমিটির আন্দোলন আর তা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়গুলোই নানাভাবে আসতে থাকবে। কারণ এই আন্দোলনের সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আর এই আন্দোলনের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, গবেষণা, লেখালেখি, বিতর্ক; লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, বুলেটিন; এই আন্দোলনের নানা পর্বে মিছিল, লংমার্চ, ঘেরাও, শ্লোগান; সারাদেশের নানা প্রান্ত সফর, পুলিশ-সন্ত্রাসী-মন্ত্রী-ভাড়াটে গবেষক মোকাবিলা; ব্যক্তি গ্রুপ সংগঠন রাজনৈতিক দল নিয়ে অসংখ্য সভা এইসব নিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার প্রতিদিনের সম্পর্ক। আমাদের উদ্বেগ, ক্রোধ, বেদনা, আনন্দ, আশার অনেক কিছুই অভিন্ন; বাংলাদেশ আর এইদেশের মানুষের জীবনমরণের বিষয় ঘিরে।

দুই

শহীদুল্লাহ ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম আলাপ ১৯৯৮ এর শেষে বা ১৯৯৯-এর প্রথমে কোন এক দিন। ৮০ দশক থেকেই তাঁর নাম শুনেছি। নাম শুনেছি বাম আন্দোলনের একজন বিরাট সুহৃদ ব্যক্তি হিসেবে। বাম রাজনীতির প্রায় সকল ধারা, এমনকি দলের বাইরেও বহু সংগঠন, লিটল ম্যাগাজিনসহ নানা তরুণ উদ্যোগ সবার কাছেই তিনি এক বিশাল ভরসা, এরকমভাবেই তাঁর সম্পর্কে জেনেছি। আবার কারও কারও কাছে তাঁর এরকম সমালোচনা শুনেছি যে, তিনি চাঁদা দেয়ার সুযোগে রাজনীতি বা

কর্মসূচি 'ডিক্টেট' করতে চেষ্টা করেন। পরিচিত হওয়া এবং একসাথে কাজ করবার অভিজ্ঞতার আগ পর্যন্ত আমার কাছে তাঁর ভাবমূর্তি এমন ছিল যে, তিনি বিশাল ধনী একজন ব্যক্তি, আয়েশী জীবন যাপন করেন, এবং বাম রাজনীতির শুভানুধ্যায়ী হিসেবে অনেককে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। প্রথম আলাপের আগেই তাঁকে দু-একবার দেখেছি, তাঁর সহজ সরল পোশাক চলাফেরা কথাবার্তা সবকিছু সেই এলিট ভাবমূর্তি ভেঙে দিয়েছিল।

আমি তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম তেল গ্যাস কমিটি বিষয়ে আলোচনা করতে, নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে। এই কমিটি গঠিত হয়েছে তার কিছুদিন আগে, ১১ দলসহ কয়েকটি বামদল আহুত কনভেনশনে। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শহীদুল্লাহ ভাই আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেইসময় আমি 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট' ও 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত। তেল-গ্যাস নিয়ে মার্কিনীসহ কয়েকটি কোম্পানির সাথে প্রথম দফা চুক্তি হয়েছে ১৯৯৩-৪ সালে। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, নীতি অব্যাহত থেকেছে, দ্বিতীয় দফা চুক্তি হয়েছে ১৯৯৭-৮ সালে। চুক্তিগুলো ছিল গোপন, জনগণ কিছুই জানতে পারেননি। একে একে ১২টি সমৃদ্ধ গ্যাসব্লক কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে গেছে। এদেরই একটি মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল এর অদক্ষতা, অবহেলা ও খরচ কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টার পরিণতিতে মাগুরছড়া বিস্ফোরণ ঘটে।

এই দুর্ঘটনার পরই প্রথম মানুষের নজর পড়ে এসব ঘটনাবলীর উপর। তেল গ্যাস চুক্তি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, এর ধরন, এর ফলাফল নিয়ে বিভিন্নমুখি অনুসন্ধান পর্যালোচনা লেখালেখি শুরু হয় তখনই। এই সময় আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটির পক্ষ থেকেও উৎপাদন বন্টন চুক্তি নিয়ে কাজ করতে থাকি। মনে আছে বেশ কয়েকটি ছোটবড় আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। জোট থেকে চুক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সহজবোধ্যভাবে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমরা একটি পোস্টার তৈরি করে প্রকাশ করেছি। সেটাই সম্ভবত এই বিষয়ের উপর প্রথম পোস্টার।

গণতান্ত্রিক কমিটির নামে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সাংবাদিক সম্মেলন প্রকাশনাও করেছি তখন।

৮০ দশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তেল কোম্পানিগুলোর দাপট ও আধিপত্য, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় তার ভয়াবহ পরিণতি—অর্থনৈতিক দুর্গতি, গণহত্যা, দখল, সেনাশাসন, নিয়ে কাজ করেছিলাম। সেই সুবাদে বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে আমিও বুঝতে পারছিলাম আমরা এক দীর্ঘ এবং নির্ধারক লড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। উন্নয়ন তত্ত্ব, দর্শন এবং রাজনীতি সবদিক থেকে এই লড়াই চালাতে হবে। কেননা শত বছরের ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, খনিজসম্পদ দখলকে কেন্দ্র করেই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা সবচাইতে আগ্রাসী আর সেই আগ্রাসনে দেশের ভেতর জনগণের শত্রুমিত্রদের মেরুকরণও স্পষ্ট হয়। সেজন্য বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড উদ্যোগের পরিবর্তে ধারাবাহিক ও ঐক্যবদ্ধ কাজের তাগিদই বেশি বেশি করে অনুভব করছিলাম। এই বিষয়টি নিয়ে জোট ও কমিটির মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হল যদি তেল গ্যাস কমিটি দাবিগুলি আরও সুনির্দিষ্ট করতে সম্মত হয়, যদি ঐক্যবদ্ধ কাজের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকে তাহলে আমরা সেখানেই কাজ করবো।

তিন

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর সাথে তাঁর অফিসেই প্রথম আমার মুখোমুখি বসা। তাঁর পেশাগত প্রতিষ্ঠানের নাম 'শহীদুল্লাহ এন্ড নিউ এসোসিয়েটস'। 'শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানও তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে এরকম দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না যে, নিজের প্রতিষ্ঠিত নিজ নামের প্রতিষ্ঠান কেউ ত্যাগ করে অন্য আরেক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। পরে জেনেছি, সহকর্মীদের কাজের ধরন ও নৈতিক অবস্থানে বিরক্ত হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমার সাথে ছিলেন জোট নেতা ফয়জুল হাকিম লালা, শহীদুল্লাহ ভাইয়ের সাথে ছিলেন কমিটির তৎকালীন সদস্য সচিব

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রয়াত ডক্টর গোলাম মহিউদ্দীন। তখন কমিটির নাম ছিল 'জাতীয় স্বার্থে তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি'। নাম সংশোধন ও কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। শহীদুল্লাহ ভাই কমিটিকে ঐক্যবদ্ধ কাজের মঞ্চ হিসেবে বিস্তৃত করবার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখালেন। আমাকেই দায়িত্ব দিলেন জাতীয় কমিটির কর্মসূচি পুনরায় লিখে পরবর্তী সভায় উপস্থিত করতে। জাতীয় কমিটির মধ্যে কাজ, এর নানা বিষয়ে এর ভাষ্য নিয়ে আমার লেখালেখির সেই শুরু যা এখনও চলছে।

সে সময় বাংলাদেশের গ্যাস ভারতে রপ্তানির তৎপরতা তুঙ্গে। সিলেটের বিবিয়ানা তখন মার্কিন কোম্পানি ইউনোকাল এর হাতে। ইউনোকাল বাংলাদেশে এসেছে আরেকটি মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল এর সাথে ব্যবসা বিনিময় করে। এর আগে অক্সিডেন্টাল সিলেটের শ্রীমঙ্গলের পাশে মাগুরছড়া গ্যাসফিল্ডে বড় আকারের দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। গ্যাসক্ষেত্রে নষ্ট হয়েছে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। এছাড়া প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশের উপর আঘাতও হয়েছে ব্যাপক। এগুলোর জন্য নিয়ম অনুযায়ী কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ইউনোকাল-এর কাছে ব্যবসা বিক্রি করে অক্সিডেন্টাল বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। পেট্রোবাংলা বা জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এটা হবার কথা নয়, কিন্তু তারা জানিয়েছে যে, তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। 'কিছুই না জানা' তো আরও বড় অপরাধ। জ্বালানী সচিব তখন তৌফিক ইলাহী চৌধুরী। জ্বালানী মন্ত্রণালয়কে বহুজাতিক কোম্পানির আস্তানা বানানোর ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ভূমিকা যে অন্যতম তা পরে আরও স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের প্রধান তৎপরতা তখন দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে জনমত তৈরি করা। 'গ্যাস রপ্তানি হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে' এরকম প্রচারণায় তখন আরও যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মন্ত্রী, আমলা, কনসালট্যান্ট, কতিপয় সংবাদপত্র। লিখে, সেমিনারে, সমাবেশে তথ্য যুক্তি দিয়ে এসব প্রচারণার মোকাবিলা ছিল তখন জরুরি কাজ। জাতীয় কমিটি দ্রুত এসব তৎপরতার আস্থাভাজন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জাতীয়

কমিটির ভেতরে ও বাইরে অনেক বাম সংগঠন, বিশেষজ্ঞও সক্রিয় ছিলেন। এরমধ্যে শহীদুল্লাহ ভাইসহ মাগুরছড়া গেছি, ব্লোআউটে ক্ষতির বিস্তৃতি বোঝার চেষ্টা করেছি, ক্ষতিপূরণের দাবি আরও জোরদার করবার পথ নিয়ে আলোচনা করেছি। শহীদুল্লাহ ভাই পরে আরও বহুবার ঐ এলাকায় গেছেন।

চার

সভা সমাবেশ লেখালেখি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, ২০০০ পর্যন্ত বড় কোনো কর্মসূচি না এলেও, পাল্টা প্রচারে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্যাস রপ্তানি বিরোধী তৎপরতার গুরুত্বও বাড়ছিল। সরকার সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলেও সরকারের ভেতর থেকে সমর্থন নিয়েই ইউনোকাল বিবিয়ানা থেকে দিল্লী পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন করবার প্রস্তুতি অনেকদূর করে এনেছিল। তাদের ওয়েবসাইটে তা দেখানোও হচ্ছিল। ২০০০ সালে বিল ক্লিনটনের সফরকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার '৫০ বছরের মজুদ না রেখে আমরা গ্যাস রপ্তানি করবো না' এই বক্তব্যে রপ্তানি প্রচারকদের উৎসাহে কিছু ভাটা পড়ে। এর কিছুদিন পরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যে নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান গ্যাস রপ্তানির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। বলেন, 'পাট, চা চামড়া রপ্তানি করতে পারলে গ্যাস রপ্তানিতে অসুবিধা কী?' বোঝা যায়, সরকার গ্যাস রপ্তানির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে।

অতএব জাতীয় প্রতিরোধের জন্য বড় কর্মসূচির তাগিদও তৈরি হল। ঢাকার ওসমানী উদ্যানে জাতীয় কমিটির প্রথম কনভেনশন হল। ঘোষণা তৈরি ও পাঠের দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। ১০ সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অবিলম্বে গ্যাস রপ্তানির চক্রান্ত বন্ধ এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি চুক্তি বাতিল না করলে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষিত হল। ঢাকা থেকে সিলেটের বিবিয়ানা।

সেই যে শুরু হল, তারপর লংমার্চ রোডমার্চ নামে অনেকগুলো কর্মসূচি হয়েছে। ঢাকা-বিবিয়ানা (২০০২), ঢাকা-চট্টগ্রাম বন্দর (২০০২), ঢাকা-

মংলা (২০০৩), ঢাকা-টেংরাটিলা (২০০৫), ঢাকা-ফুলবাড়ী (২০০৬), ঢাকা-বড়পুকুরিয়া-ফুলবাড়ী (২০১০), ঢাকা-চট্টগ্রাম (২০১১), ঢাকা-সুনেত্র (২০১১)[*]। সভা সমাবেশ পদযাত্রা মিছিল অসংখ্য। এরমধ্যে সময় গেলো ১০ বছর। মনে হয়নি কখনো যে শহীদুল্লাহ ভাইয়ের বয়স বেড়েছে। প্রথম পরিচয়ের সময় যেরকম দেখেছিলাম সেই রকমই আছেন, কখনো কখনো তাঁর শারীরিক সক্ষমতা আরও বেশি মনে হয়। এসব কর্মসূচিতে পায়ে হাঁটার বড় অংশ থাকে, খাওয়া বিশ্রাম ঘুম এগুলোরও অনিয়ম অনিশ্চয়তা থাকে। শহীদুল্লাহ ভাইকে এসবে কখনোই ক্লান্ত দেখিনি, বরং বয়সে কম আরও অনেকের জন্য তাঁর উদ্যম লজ্জার কারণ হয়েছে।

স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মোকাবিলা এবং ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকা জনপ্রতিরোধে ২০০২ এর মধ্যে গ্যাস রপ্তানির অপচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্যাস রপ্তানির চক্রান্ত দুর্বল হলেও ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ জ্বালানী সম্পদ বিষয়ে আমাদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম 'উৎপাদন বন্টন চুক্তি বাতিল', তা হয়নি। এই চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ফাঁদ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। উন্নয়ন নীতিই এমন যে আরও নতুন নতুন শৃঙ্খল তৈরির পাঁয়তারা সর্বক্ষণ হচ্ছে। আন্দোলনও তাই একটি দুটি দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হওয়া কঠিন। আমরা বুঝি এই চুক্তি বাতিল এবং দেশ ও জনগণের জন্য জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার রাষ্ট্রের একটা গুণগত পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। সেজন্য বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিকাশ অপরিহার্য।

গত ১২ বছর ধরেই শহীদুল্লাহ ভাই প্রায় বক্তৃতাতে স্পষ্ট করে বলেন, 'এসব সরকার ধনিক শ্রেণির সরকার। তারা তাদের শ্রেণিগত স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদ আর লুটেরাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে।' এই আন্দোলনে তাই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পিছুটান বা অস্বচ্ছতার কিছু কখনো তৈরি হয়নি। এই আন্দোলন বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও লুটেরা শাসক বিরোধী রাজনীতি বিকাশের পথ তৈরির ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তির রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেছে। জাতীয় কমিটিতে বিভিন্ন দল

* এরপর, ঢাকা-সুন্দরবন (২০১৩, ২০১৬)

আছে, যেগুলোর প্রতি শহীদুল্লাহ ভাই বরাবর শ্রদ্ধাশীল, তাদের উপরই ভরসা করেন, যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডে কোন অসঙ্গতি, ভুলনীতি বা সুবিধাবাদিতার লক্ষণ দেখলে, শ্রেণিচেতনার প্রশ্নে আপস দেখলে তার ক্ষুরধার সমালোচনা করতে একটু বিলম্ব করেন না।

জাতীয় সম্পদ রক্ষার এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গত ১২ বছরে বামদলগুলোর ঐক্য ক্রমেই সংহত রূপ নিয়েছে। শুধু সকলের শ্রদ্ধাভাজন বলে নয়, পুরো আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব তিনি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবার কারণে যে গতিশীলতা তৈরি হয় সেটাই তাঁকে কেন্দ্র করে এই ঐক্যকে সম্ভব ও সংহত করেছে। এতদিন ধরে জাতীয় কমিটির মধ্যে বাম প্রগতিশীল দলগুলোর যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ও কাজ সেটা এই মঞ্চের অন্যতম সাফল্য, অন্যান্য সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। আর এর প্রধান কৃতিত্ব শহীদুল্লাহ ভাইকেই দিতে হবে।

পাঁচ

জাতীয় কমিটির সঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞ সরাসরিই যুক্ত। শহীদুল্লাহ ভাই নিজে প্রকৌশল শাস্ত্রে শুধু পণ্ডিত নন, তিনি যে শাখায় অসাধারণ কৃতিত্ব নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই শাখার বহু প্রজন্মের মধ্যে তিনি সর্বজনের গুরু হিসেবে স্বীকৃত। পুর প্রকৌশলী হিসেবে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা এখন কিংবদন্তীর পর্যায়ে। শাস্ত্রবিদ্যা থাকলেই কোন ব্যক্তির জ্ঞান বা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যায় না; শাস্ত্রে বিদ্যা ঐ ব্যক্তি কী কাজে ব্যবহার করতে চায়, ঐ বিদ্যা তার মানসিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কিনা, জ্ঞান তার কাছে নিছক পুঁজি নাকি জগত ও মানুষকে উপলব্ধি কিংবা তাদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যম ইত্যাদি সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির মতাদর্শিক অবস্থানের উপর। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে শহীদুল্লাহ ভাই-এর প্রখর রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সমৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ অন্যতম অবলম্বন হয়ে থেকেছে। শহীদুল্লাহ ভাই-এর ধরনটিই হল এমন যে কোনকিছুই বিনা পরীক্ষা নিরীক্ষায় গ্রহণ করা যাবে না, জনপ্রিয় হলেই তার পেছনে ছোটা যাবে না, অবশ্যই প্রতিটি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তথ্য, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে তা গ্রহণ করতে

হবে। আমাদের আন্দোলন তাই কখনোই হাওয়ার উপর অস্বচ্ছতা বা মুহূর্তের উত্তেজনা দিয়ে পরিচালিত হয়নি।

২০০২-৩ সময়কালে চট্টগ্রাম বন্দর জালিয়াত মার্কিন কোম্পানির হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত নিয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। এই মনোযোগ দেবার চাপ আসে প্রধানত বন্দর শ্রমিকদের থেকেই। তারাই দেশের এক বড় বিপদ কয়েক বছর ধরে এককভাবে মোকাবিলা করছিলেন। এই সময় আমাদের কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ বিষয়ও যোগ করবার তাগিদ এলো। তাই সবমিলিয়ে কমিটির নাম সম্প্রসারণ করতে হল—'তেল গ্যাস ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। বন্দর নিয়ে লেখালেখি সভা সমাবেশ যখন যথেষ্ট মনে হল না তখন ঢাকা-চট্টগ্রাম বন্দর লংমার্চের কর্মসূচি চূড়ান্ত হল। শহীদুল্লাহ ভাই সার্বক্ষণিকভাবে একদিকে আইনী লড়াই অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলন বিষয়ে খোঁজখবর রাখছিলেন।

গ্যাস রপ্তানি প্রকল্পে ব্যর্থ হবার পর সরকার-বিশ্ব ব্যাংক-টাটা-ঠিকাদার গবেষকদের নতুন প্রস্তাবনা হাজির হয় টাটা প্রকল্প হিসেবে। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে টাটার প্রকল্পগুলিকে মোকাবিলা করেই আমাদের অনেক কর্মসূচি নিতে হয়। এগুলো নিয়ে টেকনিক্যাল একাডেমিক বিতর্ক এবং সেই সঙ্গে জনমত গঠনের জন্য একের পর এক কর্মসূচি দিতে হয়। টাটার প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রধান ছিল স্টীল মিল, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট এবং কয়লা খনি। স্টীল মিল ও বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য তাদের দাবি ছিল ২০ বছরের জন্য একটানা নিদিষ্ট দামে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি। যে দামে বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে আমরা গ্যাস কিনি তার থেকে অনেক কম দামে গ্যাস দাবি করছিল তারা। গ্যাস দিয়ে উৎপাদিত স্টীল ও বিদ্যুৎ রপ্তানি পরিকল্পনা ছিল তাদের। বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল এরকম যে, গ্যাস রপ্তানি বন্ধ হল, কিন্তু গ্যাসভিত্তিক পণ্য রপ্তানির জন্য ভর্তুকিতে গ্যাস সবরাহের আয়োজন শুরু হল। এক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। টাটার কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞরা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর অফিসে এসেছেন। উল্টো যুক্তির মুখে পরাজিত হয়ে বিদায় হয়েছেন।

২০০৫ সালে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটলো টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে। এবারে কানাডার কোম্পানি নাইকো। মাগুরছড়ার মতোই যথারীতি সরকার পক্ষ বলতে থাকলো ক্ষতি তেমন কিছু হয় নাই। সরকারি তদন্ত কমিটি যেখানে গ্যাস নষ্টের পরিমাণ জানালো ৩ বিলিয়ন ঘনফুট, বেসরকারিভাবে গঠিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি গণতদন্ত কমিশন দেখলো যে কমপক্ষে ২৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নষ্ট হয়েছে। আমাদের সোচ্চার হতে হল এই ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে। নাইকোর সাথে পুরো চুক্তিটাই সরাসরি দুর্নীতির ফল। এটি নিয়ে অনেক সেমিনার প্রকাশনা ছাড়াও আমরা টেংরাটিলামুখি রোডমার্চও করলাম।

ছয়

পল্লী বিদ্যুৎ নিয়ে সারাদেশে কমবেশি বিক্ষোভ চলছিল। এইবিষয় নিয়েই ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে কানসাটে একের পর এক জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ জনগণের উপর পুলিশ এবং স্থানীয় এমপি-র মাস্তান বাহিনীর আক্রমণ চলে বিরতিহীনভাবে। পরপর কয়েকটি সংঘাতে, গ্রাম পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর বর্বর হামলা ও গুলিতে কিশোরসহ ২০ জনেরও অধিক মানুষ শহিদ হন। প্রতিবাদ ছাড়াও ঢাকায় আমরা একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করি। এই তদন্ত কাজের জন্য শহীদুল্লাহ ভাই-এর নেতৃত্বে আমরা রওনা হই তাঁর মাইক্রোবাসে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সভা বিকেলে, তার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে। করটিয়ার পর টাঙ্গাইলের কাছে এসে মাইক্রোবাস নষ্ট হল। পথ থেকে কোন বাসেই উঠা গেলো না। টাঙ্গাইল পর্যন্ত গিয়ে তবে বাস পাওয়া যেতে পারে। শহীদুল্লাহ ভাইসহ আমরা মহাসড়ক ধরে হেঁটেই রওনা দিলাম। হাঁটার কোন জায়গা নেই, বাস যে কোন সময় ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। বাস ট্রাক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে করতেই যাচ্ছি আমরা। শহীদুল্লাহ ভাই বললেন, 'সড়ক ডিজাইনের এই হল গণবিরোধী চেহারা। মানুষ যে রাস্তা দিয়ে হাঁটবে তার কোন বিবেচনাই নাই।'

হেঁটে টাঙ্গাইল বাইপাস মোড়। বাস পাওয়া গেল না। টেম্পোতে এলেঙ্গা। সেখানে এক দুর্বল ভীড়াক্রান্ত বাসে ঠেলেঠুলে কোনরকম উঠলাম। সেই

ভীড় ধাক্কাতেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মানিব্যাগ উধাও হল। পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যায়। কানসাটে গেলাম, গোলাম রব্বানীসহ অনেকের সাথে কথা বললাম। পরদিন শহিদদের বাড়িতে বাড়িতে। স্বজন হারানো মানুষদের সামনে দাঁড়ানো কঠিন। নিহত প্রায় সকলেই শ্রমজীবী পরিবারের কিশোর তরুণ। কারও মা, কারও স্ত্রী, কারও সন্তান পেছনে, সর্বস্বহারা অবস্থায়। শুধু বেদনা নয় এক ভয়ংকর অনিশ্চতার মধ্যে সবাই। বেদনা, ক্ষোভ আমাদের মধ্যেও। শহীদুল্লাহ ভাই আরও বেশি বিষন্ন। কারণ জানলাম, তাঁর পকেট থেকে যে মানিব্যাগ খোয়া গেছে তাতে তিনি ১৫ হাজার টাকা রেখেছিলেন এই শোকাহত অনিশ্চিত না খাওয়া পরিবারগুলোর হাতে দেবার জন্য।

সাত

উন্মুক্ত খনি কেন কোন ধরনের খনি সম্পর্কেই আমার কোন পূর্ব প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কিংবা উত্তরাঞ্চলের কয়লা নিয়ে ধারণা ছিল আবছা। প্রকৌশল বিদ্যার সূত্রে শহীদুল্লাহ ভাই এর কারিগরি দিক জানতেন, তারপরও উন্মুক্ত খনির বিপদ সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল না। ২০০৫ সালের জুলাই আগস্ট মাসে আমাদের সাথে দেখা করলেন ফুলবাড়ীর একটি প্রতিনিধিদল। তাঁদের বক্তব্য বললেন, কাগজপত্র দিলেন। তাঁরা ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি নামে একটি বিদেশি কোম্পানির উন্মুক্ত কয়লা খনির প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই খনি হলে এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হবেন, আবাদী জমি বিনাশ হবে। পরিশ্রম করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে স্থানীয় জাতীয় গণফ্রন্ট ও তাদের কৃষক সংগঠন। সর্বদলীয় ভিত্তিতে 'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছে। তারা নিয়মিত সভাসমিতি করছে। ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির মধ্যে ডান বাম সব রাজনৈতিক দল আছে কিন্তু তারা ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোট বা বিরোধী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগ করেছেন কেউ সাড়া দেয়নি। সবশেষে তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন।

সাধারণভাবে আমরা জানতে অভ্যস্ত যে, উন্নয়নের জন্য কয়লা উত্তোলন দরকার, খনি দরকার। স্থানীয় জনগণ যে এর বিরোধিতা করছেন তার যুক্তি

কতটা সে সম্পর্কে আমরা সাথে সাথে নিশ্চিত হতে পারিনি। উন্নয়নের জন্য কিছু ক্ষতি তো স্বীকার করতেই হবে। তাহলে এই আন্দোলনে যতই এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ থাকুক তাতে সমর্থন দেয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে?

শহীদুল্লাহ ভাই যথারীতি সকল তথ্য যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে নিজে অবস্থান নিতে রাজী নন। আমাদের সভায় সিদ্ধান্ত হল যে, এ বিষয়ে আমরা নিজেরা অনুসন্ধান করে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করবো। শহীদুল্লাহ ভাই প্রথমে নানা জায়গায় যোগাযোগ করলেন, হল না। তাঁর সঙ্গে আমিও ভূতাত্ত্বিক জরিপসহ সরকারি বিভিন্ন দফতরে গেলাম, অনেকের সাথে আলোচনা করলাম। কিন্তু সরকারের কোন দফতরেই ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে কোন কাগজপত্র নেই, সরকারের কোন সমীক্ষা বা মূল্যায়ন এমনকি কোন সারসংক্ষেপও নেই। কর্মকর্তাদের কোন পরিষ্কার ধারণাও নেই। কীভাবে তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবো? হাল তো ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ সরকারি দফতরে কাগজপত্র থাকে না, জনগণ কিছুই জানেন না, কিন্তু ঠিকই জনগণের জীবন সম্পদ নিয়ে ভয়াবহ চুক্তি হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, অবস্থানও নিতে হবে।

শেষ উপায় হচ্ছে, এশিয়া এনার্জির কাগজপত্রই ভালভাবে পরীক্ষা করা। আমার উপর মূল দায়িত্ব পড়লো। এশিয়া এনার্জির সব দলিলপত্র পরীক্ষা করেই আমি নিশ্চিত হলাম ফুলবাড়ীর জনগণ খুবই সঠিক অবস্থান নিয়েছেন। বিপদ শুধু তাদেরই নয়, বিপদ সারা বাংলাদেশেরই। যে শর্তে এই প্রকল্প হতে যাচ্ছে এবং যে পদ্ধতিতে কয়লা তোলার প্রস্তাব দিয়েছে একটা বিদেশি কোম্পানি, তাতে আবাদী জমি মাটি পানি মানুষ সবই ধ্বংস হবে; কয়লা বা তার দামও বাংলাদেশ পাবে না। এশিয়া এনার্জির দলিলপত্র এবং আমিনুল ইসলাম বাবলুসহ স্থানীয় সংগঠকদের সংগৃহীত অঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ২০০৫ সালের অক্টোবরে লিখলাম 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: কার লাভ কার ক্ষতি?' শহীদুল্লাহ ভাই দেখার পর ঢাকায় বিশেষজ্ঞদের সামনে এটা উপস্থাপন করে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান আরও সুনিশ্চিত হল—ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প অবশ্যই বাতিল করতে হবে। আর জালিয়াত ভূঁইফোড় কোম্পানি এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার করতে হবে।

আমাদের অবস্থান নিশ্চিত হবার পর জাতীয় কমিটির তৃতীয় দফা নাম পরিবর্তিত হল—'খনিজ সম্পদ' যুক্ত হল, নাম দাঁড়ালো—'তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। এই নামই এখন পর্যন্ত বহাল আছে। শহীদুল্লাহ ভাই, আমি এবং ডক্টর শামসুল আলম ফুলবাড়ীতে গেলাম ২০০5 সালের ডিসেম্বরে। এরপর আমরা কতবার ফুলবাড়ী গেছি তার সংখ্যা গণনা কঠিন হবে। লড়াই চলেছে চলছে বহুভাবে। দুর্বৃত্ত বিশ্বজোটের তৎপরতা মোকাবিলায় বহুদিকে কাজ করতে হয়েছে, হচ্ছে। একদিকে পুলিশ বিডিআর সেনাবাহিনী হামলা মামলা হুমকি, অন্য দিকে অবিরাম তথ্য-যুক্তি-তাত্ত্বিক লড়াই। মোটাতাজা ভাড়াখাটা 'বিশেষজ্ঞ' দেশি বিদেশি প্রচার মাধ্যমকে মোকাবিলা করতে হয়েছে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।

আট

তথ্য, যুক্তি এবং সজাগ জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট। ঐদিন এশিয়া এনার্জি ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। এই কর্মসূচি দেবার কারণ একদিকে এই প্রকল্প সম্পর্কে সরকার স্পষ্ট করে কিছু না বললেও এশিয়া এনার্জি নানাধরনের তৎপরতা বাড়িয়ে যাচ্ছিলো। জনগণের বিরোধিতার মুখে দালাল তৈরির জন্য তারা দুর্নীতি ঘুষ তৎপরতা শুরু করে। মানুষের কথা ছিল এই জালিয়াত কোম্পানির কাজ আর বাড়তে দেয়া যাবে না, দিলে সর্বনাশ হবে। ২৬ আগস্ট চারিদিকে পুলিশ র‍্যাব ঘেরাও দিয়ে মানুষের ঢল ঠেকানোর চেষ্টা করলেও প্রায় ৮০ হাজার বাঙালি আদিবাসী জড়ো হন সেদিন। পথে পথে আরও ছিলেন ২০/২৫ হাজার মানুষ। শহীদুল্লাহ ভাই ও আমি সবসময় একসাথেই ছিলাম। মানুষের মধ্যে সেদিন ছিল প্রাণের প্রকাশ, যেন ঐক্য ও প্রতিরোধ সৃষ্টির উৎসব। সেই অনুভূতির প্রকাশ শহীদুল্লাহ ভাই-এর মুখেও দেখেছি। কিন্তু শত্রুপক্ষ জনগণের প্রাণের প্রকাশ দেখতে রাজি নয়, শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ করলেও তারা গুলি চালালো। গুলিতে ৩ জন তরুণ নিহত, ২০ জন গুলিবিদ্ধ, ২ শতাধিক জখম হবার পরমুহূর্ত থেকে ৩০ আগস্ট ফুলবাড়ীসহ ৬ থানার মানুষের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অসাধারণ পর্ব তৈরি

করে। পুরো দেশ পাশে এসে দাঁড়ায়। ৩০ আগস্ট সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। চারদলীয় জোট সরকার সারাদেশে উন্মুক্ত পদ্ধতি নিষিদ্ধ এবং এশিয়া এনার্জিকে বহিস্কারের দাবি মেনে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

এর কয়েক মাসের মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার এক পর্যায়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। সেনাসমর্থিত সরকার বসে। শুরু হয় একদিকে নতুন উদ্যমে কোম্পানীর তৎপরতা, আর অন্যদিকে তাদের মোকাবিলায় আমাদের বিভিন্নমুখি কর্মসূচি। জরুরি অবস্থা জারির পরপরই এশিয়া এনার্জি তার ওয়েবসাইটে উল্লাসের সঙ্গে এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, 'এখন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। এখন শীগগিরই ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।' সামরিক বাহিনী ফুলবাড়ী গিয়ে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এস.এম. নূরুজ্জামানকে প্রকাশ্যে বাজারে বর্বরভাবে মারধর করে আটক করে। কয়েকজন প্রাক্তন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে অনেকগুলো ভূইফোঁড় সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ' উন্নয়নের নামে এই প্রকল্পের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। নতুন ও পুরনো দালাল গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠে। বুঝতে পারি আমরা যুদ্ধের আরেক পর্বে প্রবেশ করেছি।

জরুরি অবস্থায় যখন অন্য সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ তখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে দালাল গোষ্ঠী উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের নামে উন্মুক্ত খনি আর ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একের পর এক ব্যয়বহুল আলোচনা সভা শুরু করে, দামি কাগজে ব্যয়বহুল প্রচারণা চালাতে থাকে। এসব তৎপরতার নেতৃত্বে ছিল এমনসব লোক যারা একসময় উত্তরবঙ্গে গ্যাস সরবরাহ না করে বাংলাদেশের গ্যাস দ্রুত ভারতে রপ্তানির পক্ষে ওকালতি করেছিল। জরুরি অবস্থা তাদের বড় সুযোগ।

নানা প্রতিবন্ধকতা এবং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমরাও পাল্টা কর্মসূচি শুরু করলাম। পরপর কয়েক মাস শহীদুল্লাহ ভাইসহ চললো আমাদের সফর। কখনো কখনো শহীদুল্লাহ ভাই-এর মাইক্রোবাসে দিনের পর দিন। উত্তরবঙ্গের যেখানে যেখানে তারা ভুল তথ্য আর প্রচারণা চালাচ্ছে সেখানে সেখানেই আমরা গেলাম। একটানা সফর একটানা কথা, ঝুঁকি

কোনকিছুর চাপই শহীদুল্লাহ ভাইকে দমাতে পারেনি। পরিষ্কার দেখলাম সঠিক তথ্য ও যুক্তিগুলো জনগণের সামনে একবার উপস্থিত করলে অর্থলোভ বা ভয় কোনকিছুই তাদেরকে পরাজিত বা বিভ্রান্ত করতে পারে না।

কতভাবে ভুল তথ্য ও যুক্তি হাজির করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করতে আমাদের নানাদিক অনুসন্ধান করতে হয়েছে, অসংখ্য সভায় বসতে হয়েছে। এগুলো এখনও চলছে। শহীদুল্লাহ ভাই ভূগর্ভস্থ পদ্ধতি ও উন্মুক্ত পদ্ধতির নানাদিক নিয়ে কাঠামোগত সমস্যাসহ টেকনিক্যাল বিষয়াদি পরিষ্কার করে গত কয়েক বছরে অনেকগুলো লেখা লিখেছেন, মোকাবিলা করেছেন ভাড়াটে প্রচারণা। প্রত্যক্ষভাবে বোঝার জন্য নিজ উদ্যোগে ভারতের কয়েকটি খনি পরিদর্শন করেছেন। ঢাকা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন আমাদের ধারণাকে আরও স্বচ্ছ করেছে। এগুলো খন্ডন করার ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের কোন ক্ষমতা ছিল না। শহীদুল্লাহ ভাই বলেন, 'আমাদের ন্যায্য নৈতিক অবস্থানই আমাদের প্রধান শক্তি।'

নয়

প্রকৌশল শাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত গুরু হলেও প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শুধুমাত্র সেখানেই নিজেকে সীমিত রাখেননি, বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম ইতিহাস রাজনীতিশাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। মানুষ ও সমাজকে উপলব্ধি এবং সবরকমের আধিপত্য শোষণ ও নিপীড়ন থেকে এই সমাজকে মুক্ত করবার আগ্রহের কারণে নিজের জ্ঞানের পরিধি আরও গভীর করতে তিনি এখনও সদা যত্নশীল। পাঠ, অভিজ্ঞতা ও মনোযোগের এই ব্যাপ্তি তাঁকে সক্ষম করে তোলে যে কোন বিষয়কে একটি সামগ্রিকতার ভেতর উপলব্ধি করতে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহু কর্তাব্যক্তির ভুল বা প্রতারণা উন্মোচন করতে। এর সঙ্গে মানুষ ও সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা তাকে তাঁর জ্ঞান চর্চাকে ব্যক্তির চাইতে বৃহত্তর প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত করতে সাহায্য করে। সে কারণেই শহীদুল্লাহ ভাই-এর শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্তৃত্ব বরাবর বাংলাদেশের মানুষেরই কাজে লাগছে।

অসংখ্যবার আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফরে গেছি। বাস, মাইক্রোবাস, ট্রেন, লঞ্চ। যেতে আসতে জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেমন আলোচনা হয়, তেমনি আলোচনা হয় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, নদীর ভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক, জলবায়ু, আবাসন সমস্যা, রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস। তাঁর পাঠের কোন সীমা নেই। কুরআন হাদিস খুব ভালো জানেন, আরবি ভাষাতেও তাঁর দখল আছে। সুতরাং এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা খুবই আকর্ষণীয়। শহীদুল্লাহ ভাই খুবই মনোযোগী পাঠক। তাঁর অধ্যয়নের পদ্ধতি খুবই নিবিড়। সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বিতর্ক বা তথ্যাবলীও তাঁর মনোযোগের বাইরে নয়।

শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতে করতে, বিস্ময় এবং মুগ্ধতার সঙ্গে তাঁর কঠিন মনোবল, সংযম, শৃঙ্খলা ও সক্ষমতাও দেখি। যে কোন স্থানে যে কোন পরিবেশে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, যেকোন খাওয়া তাঁর পক্ষে হজম করা সম্ভব, যে কোন যানবাহনে তিনি চলাফেরা করতে পারেন, পুকুর বা দীঘি বা নদীতে সাঁতরে নিতে পারেন। বিপ্লবী নেতা হবার পূর্বশর্ত হিসেবে আমরা শুনি শ্রেণিচ্যুতির কথা। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক বাম নেতার মধ্যে যা দেখিনি, তা পেয়েছি শহীদুল্লাহ ভাইয়ের মধ্যে।

শহীদুল্লাহ ভাই আপাতদৃষ্টিতে খুবই সোজাসাপটা, কঠিন, প্রকৌশলবিদ্যার মতোই ছক-মাপ-কাঠামোবদ্ধ। কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, তাঁর জীবনের প্রধান পরিচালিকা শক্তি মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। গভীর সংবেদনশীলতাই তাঁকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর একগুঁয়ে রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতায় নিয়োজিত রাখে।

নিজের জীবন নিয়ে কিংবা যে কোন বিষয়ে নিজের মতদ্বিমত বিরক্তি ক্রোধ প্রকাশে তিনি সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য। নিজের জীবনের অনেক বিষয়, বিভিন্ন ঘটনাবলী, কিংবা সহযোদ্ধার বক্তব্য সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশে তার নিঃসংকোচ ধরন অনেক সময় অস্বস্তিকর পরিবেশও তৈরি করে। আমি কখনো কখনো বলেছিও তা। তিনি বলেন, 'আমার করার কিছুই নাই, আমি সবকিছুই স্বচ্ছ রাখতে চাই।'

দশ

তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বিশাল ও বৈচিত্রময়। রেকর্ড নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব, প্রকৌশলী হিসেবে দেশ বিদেশে সফর ও বিরল সাফল্য, গোপন বিপ্লবী পার্টির ইশতেহার ছাপিয়ে পৌঁছে দেবার সময় গ্রেফতার ও জেলারসহ পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের প্রতিনিধিদের মোকাবিলা করে জেলখানায় মাথা উঁচু করে কঠিন সময় পার করা, মুক্তিযুদ্ধে দুই ভাইকে হারানো, পেশাগত ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ঐক্য সংঘাত, বিপ্লবী রাজনীতির ওঠানামা ও নানা দুর্বলতা সংকট সত্ত্বেও নিজ অবস্থান থেকে সার্বক্ষণিক সহযোগীর ভূমিকা পালন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, জানতে চান, জনশত্রু কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করতে চান এই বলে যে, জাতীয় কমিটির অর্থের উৎস কী? শত্রুপক্ষ জাতীয় কমিটির কার্যক্রমে অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনায় ক্রুর হাসি হাসে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কমিটির বিভিন্ন কাজে যারা জড়িত তারা সকলেই অংশগ্রহণ করেন নিজ অর্থব্যয় করে, শ্রম দেন সময় দেন নিজের বুঝ বা রাজনৈতিক তাগিদ থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষী পেশাজীবী কেউ কেউ নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে চাঁদা দেন। বড় বড় কর্মসূচিতে খরচের বৃহৎ অংশ আসে অংশগ্রহণকারীদের থেকেই।

এই ২০১০-১ সালেই আমরা তিনটি রোডমার্চ ও লংমার্চ করেছি, এগুলোতে যতসংখ্যক মানুষ বিশেষত তরুণ ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল তাদের আমরা নিতে পারিনি থাকা খাওয়ার সীমিত ব্যবস্থার কারণে। যারা গেছেন তারা সকলেই চাঁদা দিয়েই অংশগ্রহণ করেছেন। এই টাকাই ব্যয়ভারের বড় অংশ। বিভিন্ন অঞ্চলে খাওয়া থাকার ব্যয়নির্বাহ করেছে অঞ্চলের সংগঠন। এদেশের যে নাগরিকেরা এদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান শিকার সেই শ্রমজীবী মানুষদের থেকেই অনেক চাঁদা আসে বিভিন্ন কর্মসূচিতে। অনেকগুলো কাজ শরীক রাজনৈতিক দল নিজেরাই অর্থসংগ্রহ করে সম্পন্ন করে। তারপরও ঘাটতি থাকে, আগে আরও বেশি থাকতো, এখন পরিস্থিতির অনেক উন্নতি

হয়েছে। সেই প্রয়োজনীয় কিন্তু ঘাটতি খরচের বড় অংশ বহন করেন প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি নিজেই অনেকসময় অন্যদের উপর ভার কমিয়ে নিজের উপর ভার টেনে নেন। আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করি, জোর দেই দল ব্যক্তি সকলের অংশগ্রহণের উপর, তিনি তাতে নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ একমত। তারপরও বলেন, 'ওদের সবার সাধ্য নাই, অন্যান্য কত খরচ আছে তাদের!'

আমরা পরিষ্কার দেখি, তাঁর আয়ের প্রতিটি টাকা তাঁর পরিশ্রমের। যে পেশায় তিনি আছেন তাতে উঁচু বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দরকার হয়, কিন্তু তা দিয়েই কাজ হয় না, অফিসে বসেও কাজ শেষ হয় না। এগুলো তো লাগেই উপরন্তু দরকার হয় হাটে মাঠে ঘাটে শহরে প্রান্তরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-শীত উপেক্ষা করে কাজ করা। যেখানে পেশাগত এই কাজ সেখানেই ছুটে যেতে হয়, 'ফিল্ডে'। ক্লান্তিকর কয়েক দিনের সফর শেষে একসাথে ফিরে পরদিনই অনেকবারই শুনেছি শহীদুল্লাহ ভাই ঢাকার বাইরে কোথাও রওনা হয়েছেন। শহীদুল্লাহ ভাই-এর এসব সফর অনেক সময় বেআরাম বাসেই সারতে হয়। রাতের কোচ-ধরতে হয় প্রায়ই।

জাতীয় কমিটির কাজ তিনি যখন শুরু করেন তখনই তাঁর বয়স প্রায় ৭০। আর এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জাতীয় কমিটির জন্য সময় ও অর্থ দুটোরই বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়। প্রবল অঙ্গীকারের কারণেই এই বয়সেও সময় ও অর্থ দুটোরই ভার তিনি গ্রহণ করেন, সেই ভার এখনও বহন করে যাচ্ছেন।

শুধু জাতীয় কমিটির বাজেট ঘাটতি মেটানো নয় অন্যান্য সকল তৎপরতা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে কোন উদ্যোগ, মানুষের মুক্তির নানামাত্রার লড়াই, দখল নিপীড়ন বৈষম্য বিরোধী সকল তৎপরতায় তিনি যে অর্থ যোগান দেন সবই তার নিজের রক্ত ঘামের উপার্জন। এর জন্য তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, দেশজুড়ে ছোটছুটি করতে হয়। আবার জাতীয় কমিটির কাজেও অনেক সময় দিতে হয়। নিজের মেধা, সময়, দিবারাত্রি শ্রম এবং কষ্টার্জিত অর্থ সবকিছুই দেশ ও জনগণের জন্য একইভাবে নিবেদনের এরকম আর কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই।

এগারো

আমাদের দেশে শ্রমদান বয়সের উচ্চসীমা ৬৫ বছর। ধরা হয় এই বয়সের পর সবাই বিশ্রামে থাকবে। সন্তান সন্ততি নিয়ে অবসর যাপনেই সময় কাটবে। কিন্তু এই দেশে এই বয়সের পরও যারা বেঁচে থাকেন, সক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশকেই জীবিকা অর্জনের জন্য কঠিন শ্রমকাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। পুত্রকন্যা তাঁদের ভার গ্রহণ করে না, তাদের সম্পদ সঞ্চয়ও থাকে না। শহীদুল্লাহ ভাইএর অবস্থা সে রকম নয়। তিনি বসে থাকলেও তাঁর খাওয়া পরা এমনকি আয়েশের সঙ্গে দেশবিদেশে অবসর কাটানোর উপায় আছে। যোগ্য সন্তানেরা দেশে বিদেশে আছে। নিজের চলার মতো অবস্থা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি তা করেননি।

সময় ও শ্রমের এতসব চাপের পরও ঢাকা মহানগরী কিংবা দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যদি অনুরোধ আসে তাহলে অন্য কোন কাজের বাধ্যবাধকতা না থাকলে শহীদুল্লাহ ভাই তাতে সাড়া দেবেনই। সেটা জলাবদ্ধতা নিরসন হোক, খেতমজুর সমাবেশ হোক, কোন সংগ্রামী মানুষের স্মরণসভা হোক, কোন অন্যায় বিরোধী প্রতিবাদ সভা হোক তাতে শহীদুল্লাহ ভাই উপস্থিত থাকতে সদা প্রস্তুত। তাঁর যুক্তি ওদের উৎসাহ দেয়া দরকার। ওরা পরিশ্রম করছে, এই কাজ হতে হবে।

শরীরের অক্ষমতা কিংবা অসুস্থতাকে কোন কাজের পথে বাধা হতে দিতে রাজী নন তিনি। এজন্য, আমার মনে হয়, তিনি অনেকসময়ই নিজের শারীরিক সমস্যাকেও চাপা দিয়ে কাজে অংশ নেন। অসুস্থতার কথা জানান না, নিজের শরীরের উপর মানসিক বলপ্রয়োগ করে ঠিকই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সেই কাজ দূর কোথাও যাওয়ার ব্যাপার হোক কিংবা রোদ বা বৃষ্টিতে মিছিল, যাই হোক না কেন। মিছিল করতে গিয়ে বৃষ্টি এলে সবাই সরে গেলেও তিনি সরে যেতে রাজী নন। কারণ মিছিল ঠিকমতো শেষ করতে হবে।

শহীদুল্লাহ ভাই-এর জীবন কখনোই আয়েশী জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন ছিল না। কষ্টসহিষ্ণু এই অবিচ্ছিন্নতা তিনি সচেতনভাবে বজায় রেখেছেন।

এটাই তাঁর জীবন, এটাই তাঁর আনন্দ। তিনি যখন মানুষের কথা বলেন, দেশের কথা বলেন তখন মা সম্পর্কে কথা টেনে আনেন বারবার। মানুষকে কট্টর কঠিন সত্য বোঝাতে কবিতা গল্প বলেন। অনুভব করা যায়, দেশ ও মানুষের সাথে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। প্রকৌশলশাস্ত্রের কাষ্ঠবিদ্যার মানুষ কথা বলতে গিয়ে কঠিন থাকতে চাইলেও হৃদয়ের টান মাঝেমধ্যেই আবেগ আকারে প্রকাশিত হয়।

মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসাই নিষ্ঠুর জগতের চালক লুটেরা নির্যাতক সুবিধাভোগীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা আনতে পারে। এই ভালবাসাই তৈরি করে শহীদুল্লাহর মতো একগুঁয়ে অবিশ্রামী নির্ভয় অক্লান্ত নির্মোহ সংগ্রামী বিস্ময়। এই দেশ এইখানে থাকবে না, আত্মমর্যাদা ও মালিকানার এই লড়াই আরও বহু লড়াই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দেশকে মানুষের সমাজে নিয়ে যাবে। বৈষম্য নিপীড়নমুক্ত সাম্যের এক স্বাভাবিক জগতে মানুষ নিজেকে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে। জীবন ও সম্পদের উপর এই দেশের মানুষ তার পূর্ণ কর্তৃত্ব পাবে। শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেই সমাজ নির্মাণের চিন্তা ও লড়াই-এর অসামান্য নেতা-সংগঠক-কারিগর হিসেবে চিরস্মরণীয় থাকবেন।

জানুয়ারি ২০১২

শওকত আলী ও তাঁর সৃষ্টিকথা

কথাশিল্পী ও শিক্ষক শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) বা আমাদের শওকত ভাই এর সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই তাঁর লেখালেখির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে পরিচয় ছিল একজন শক্তিশালী লেখকের সৃষ্টির সাথে যোগাযোগের আনন্দ ঘেরা। শওকত ভাই এর লেখা পড়ার সুযোগ হয় প্রথম সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়*। সম্ভবত প্রথম দেখাও হয় সেখানেই।

১৯৭৩ থেকে আমার সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র সাথে সম্পর্ক। *বিচিত্রা* তখন দিনে দিনে রাজনীতি অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য জগতে একটি প্রবল দাপট নিয়ে হাজির হচ্ছিলো। শাহাদৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে এই পত্রিকা ক্রমে বহু তরুণ প্রবীণ লেখকের মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায়, শুধু লেখালেখি নয় আড্ডাতেও। *বিচিত্রায়* এমনিতে গল্প বা উপন্যাস প্রকাশের কোনো নিয়ম ছিলো না। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতাগুলোই তখন ছিলো লেখকদের একমাত্র ভরসা। সেখানে গল্প ছাড়াও মাঝে মধ্যে ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হতো। দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা তখন ছিলো অনেক কম, তার ওপর সাহিত্য পাতা আর কতটা জায়গা দিতে পারতো? তাই সৃজনশীল লেখকদের প্রস্তুতির তুলনায় প্রকাশের সুযোগ ছিলো খুব সীমিত। কলকাতায় *দেশ* ও *আনন্দবাজারে*র পূজা সংখ্যা যেভাবে অনেক নতুন উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়মিত একটি ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশে সে রকম কোনো পত্রিকা ছিল না। এক পর্যায়ে, সম্ভবত সত্তর দশকের মাঝামাঝি, বিচিত্রা বাংলাদেশে প্রথম ঈদ সংখ্যা চালু করে, যেখানে এখানকার লেখকদের গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। একসাথে এক মলাটের মধ্যে সীমিত দামে এতগুলো ভালো গল্প ও উপন্যাস পাওয়া পাঠকদের জন্য তখন ছিলো একটি বড় প্রাপ্তি।

স্বাধীনতা উত্তর নতুন উদ্দীপনা/স্বপ্ন/প্রত্যাশা কালে সৃজনশীলতার জগতেও শক্তিশালী পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকাশনা জগতের ক্ষুদ্র সীমা, এ বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা বা উদ্যোগহীনতার কারণে লেখা প্রকাশের

সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছিলো না, অনেকেই নিরুৎসাহিত হচ্ছিলেন। *বিচিত্রা* ঈদ সংখ্যা প্রকাশনা শুরু হবার পর বছর বছর নতুন নতুন উপন্যাস প্রকাশের সহজ রাস্তা তৈরি হয়। পাঠকদের জন্যও অনেক কম পয়সায় একসাথে নতুন অনেক গল্প ও উপন্যাস পড়ার সুযোগ আসে।

এই ঈদ সংখ্যাগুলোতেই শওকত ভাই-এর একাধিক উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হয়। শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কায়েস আহমেদ, রাজিয়া খান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, রিজিয়া রহমানসহ আরও অনেকের গল্প/উপন্যাস/প্রবন্ধ আমি প্রথম বিচিত্রা ঈদ সংখ্যাতেই পড়ি। আরও বহু পাঠকের জন্যই এই একই পরিস্থিতি ছিল। বই কিনে পড়ার মতো অবস্থা তখন আরও কম ছিল।

১৯৮০ দশকে আরও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। ঈদ সংখ্যার প্রতি পাঠকের আগ্রহ বুঝে একে একে অনেকেই ঈদ সংখ্যা বের করবারও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এখন প্রতি বছর ঈদসহ নানা উপলক্ষ ধরে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। লেখকদের 'অপ্রকাশের ভার' এখন কিছু হয়তো কমেছে।

শওকত ভাই এর বই আকারে যে উপন্যাস প্রথম পড়বার সুযোগ হয় তার নাম *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। এই বই-এর ভাষা, চরিত্র বিন্যাস, ইতিহাসের কালকে আয়ত্ত করা, বলার ঢং সবকিছুতে মোহিত হয়েছিলাম। অনেককে তখন বলেছি বইটি পড়তে। তখনও শওকত ভাই-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।

পরে জেনেছি, শওকত আলীর জীবন খুব মসৃণ ছিলো না। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় তোলপাড় সৃষ্টির ঘটনা ছিল ভারতভাগ। জন্ম বর্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত দিনাজপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার, তবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। মা ছিলেন শিক্ষক। স্কুলে পড়াকালেই মা মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে ভারতভাগও হয়ে যায়। এই ভাগের আগে পরে দুই পারে মানুষের মহাবিপর্যয়ের তিনি সাক্ষী এবং শিকারও বটে। সে সময় ঐ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে তাঁদের টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় শওকত আলীর পরিবার পাকিস্তানে চলে আসেন।

শিক্ষাগ্রহণ শেষে প্রথম দিকে কিছু সময় সাংবাদিকতা করেছেন পরে শিক্ষকতাতেই স্থিত হয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত। তাঁর

মতো সংবেদনশীল, দায়িত্বশীল, অবিরাম জ্ঞানের জগতে বিচরণে আগ্রহী মানুষের জন্য শিক্ষকতাই সঠিক পেশা।

নিজের শৈশব কৈশোর যে ভূমিতে শেকড়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা ত্যাগ করে অন্য জায়গায় স্থায়ী হওয়া যে খুব কঠিন, আজীবন যন্ত্রণার বিষয়, তা এরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না গেলে উপলব্ধি করা কঠিন। টানাপোড়েন, উন্মুল হবার যাতনার মধ্যেই থাকতে হয় এই মানুষদের। শওকত আলীরও তাই হয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প, গদ্যে এসব বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে।

১৯৮০ দশক ছিলো শওকত ভাই এর সবচাইতে সক্রিয় সময়। কিংবা বলা যায় এর আগের কয়েক দশক নিজের চিন্তা জগতে, ভাবনায়, বুননে যা কিছু সঞ্চিত হয়েছিল তার সৃজনশীল প্রকাশ সবচাইতে বেশি ঘটেছিল ৮০ দশকে। এই দশকেই তাঁর আরও যেসব উপন্যাস পড়ি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫), *কুলায় কালস্রোত* (১৯৮৬), *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৮৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯), *উত্তরের খেপ* (১৯৯১)।

আর এই ৮০ দশকেই শওকত ভাই-এর সঙ্গে দেখা, কথা ও নিয়মিত কাজের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই দশকে কয়েক দফায় আমি বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। এই সংগঠনকে লেখক শিল্পীদের একটি স্বাধীন সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টায় ক্রমে এতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী প্রধান লেখকেরা। তার ফলে আমার সুযোগ হয় এই কিংবদন্তী ব্যক্তিবর্গের চিন্তা ও কাজের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের। তাঁদের সাথে বহু সভা, আলোচনা, সফর আর আড্ডা আমার উজ্জ্বল স্মৃতির অংশ। শওকত ভাই কথা কম বলতেন কিন্তু যখন বলতেন তখন তাঁর মধ্যে পেতাম এক গভীর ইতিহাস অনুসন্ধানী সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ চিন্তাশীল মানুষের ছবি।

৯০ দশকে আমাদের যোগাযোগ আরও সংহত হয়। বিশেষত ইলিয়াস ভাইকে কেন্দ্র করে আমাদের অনেক উদ্যোগে, আলোচনায় শওকত ভাই ছিলেন উৎসাহী অংশীদার। এই দশকেই ১৯৯৭ সালের শুরুতে ইলিয়াস ভাই-এর মৃত্যু আমাদের সবার জন্য ছিলো অনেক বড় আঘাত। এরপর

শওকত ভাই আরও সামনে এসেছিলেন, অনেক কাজে হাল ধরেছিলেন। ইলিয়াস ভাই-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা *তৃণমূল*। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর এই পত্রিকার 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা' সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়। এই সংখ্যায় শওকত ভাই 'ইলিয়াসের মিথ' নিয়ে যে লেখাটা লিখেছিলেন তা সাহিত্য ও জগত নিয়ে তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তাভাবনা বুঝতে অনেক সহায়ক হবে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা সর্ম্পকে শওকত ভাই এর এই বিশ্লেষণে, আরও অন্যান্য আলোচনাতেও, ইলিয়াসের শক্তিমত্তার বিভিন্ন দিক বিশেষত গল্প/উপন্যাসে মিথ ব্যবহারের দক্ষতা নিয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে।

২০১৮ সালে মৃত্যুর আগের এক দশকে শওকত ভাই শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। নিঃসঙ্গতাও তাঁকে কাবু করেছিলো অনেকখানি। তারপরও তিনি লিখছিলেন, বলছিলেন দায়িত্ব নিয়ে। সর্বশেষ তাঁর উপন্যাস পড়েছি *নাঢ়াই* (২০০৩) এবং *মাদারডাঙ্গার কথা* (২০১১)। জনপদ ও মানুষ নিয়ে এগুলো তাঁর খুবই শক্তিশালী সৃষ্টি।

মানুষের জীবন, মনোজগত, তার বিশ্বাস অবিশ্বাস ধরার জন্য শুধু বর্তমান যথেষ্ট নয়, অতীতকেও জানতে হয়; শুধু প্রকাশ্য বিশ্বাস অবিশ্বাস নয়, মনের ভেতরের অপ্রকাশিত জগতের দোলাচলও বুঝতে হয়। বাংলাদেশের গ্রাম এখন আর আগের গ্রাম নেই, গ্রামের মানুষের অনেকেই এখন শহরে, রাজধানী ঢাকায় এমনকি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখন কাজের খোঁজে, আয়ের খোঁজে কঠিন জীবনযাপন করছে নানা ভিনদেশে। কিন্তু মানুষ যেখানেই যাক না কেন, শেকড় তাঁকে ছাড়ে না। শেকড়ের কাছে যদি ফিরতে নাও পারে মানুষ তবুও তার মনোজগতে শেকড়ের নানা ডালপালা চিরসতেজ থাকে। এখানেই বাস করে মিথ। শৈশবে কৈশোরে যার মধ্যে দিয়ে মানুষ বড় হয়। তাই তাকে সচেতনে কিংবা অবচেতনে প্রভাবিত করে। শওকত ভাই মানুষকে তার সমগ্রের ভেতর ধরতে চেয়েছিলেন, সেজন্য তার অজানা জগতও সন্ধানের চেষ্টা করেছেন লেখার মধ্য দিয়ে।

শওকত ভাইকে কখনো উচ্চকিত দেখিনি। তিনি দায়িত্ব নিয়ে ভার দিয়ে কথা বলতেন, বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর সৃষ্টিও ছিলো তাই।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯